

কাপুরুষ ও দয়াবতী

আমি কাপুরুষ, তুমি দয়াবতী। আমি কাপুরুষকে তুমি দয়াবতী সেদিন যখন সন্ধ্যায় শ্রাবণের ঝম্‌ঝম্ হঠাৎ-বৃষ্টির পরে এক সঙ্গে ট্রাফিকের আওয়াজ উঠল, আমাকে পুনরায় দয়া করে গেলে।

দয়া, আবার সেই নির্জলা দয়া, প্রমাণ তোমার অর্থপূর্ণ গ্রীবাভঙ্গি এবং আশেপাশের লোকগুলোর পানে ফিরে তাকানো। হাইহিল জুতোর খুটখাট্, আর হাল্কা শিফনের চাঞ্চল্য অনেককে বুঝি তাক লাগিয়ে দিল।

আমি তাকালাম তোমার দিকে। অসহ্য, অসহ্য। হাতে পা'য়ে ব্যাণ্ডেজ, তবু প্রায় উঠে পড়ছিলাম। কিন্তু উঠলাম না। আমার ঘাড়টা আবার নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়লো বালিশের ওপরে। চোখ বুঁজে থাকি।

তুমি কি দাঁড়ালে আবার? পর্দার বাইরে যাওয়ার আগে ফিরে তাকালে, আমাকে আরেকবার দেখবার জন্য? জানি না, কারণ জানার ইচ্ছেটাকে সক্রিয় উদ্যমে ঠেলে দিতে অনিচ্ছা ছিল। চোখ বুঁজবার আগে কিঞ্চিৎ যা দেখেছিলাম তাই যথেষ্ট, এবং তাতেই সন্তুষ্ট। চোখ বুঁজবার আগে দেখেছিলাম, রুজ-লিপস্টিক তুলিকার পরিপূর্ণ প্রসাধনও যা ঢেকে রাখতে পারেনি, তোমার মুখে একটা আশ্চর্য পরিতৃপ্তির প্রলেপ। আমি যে কাপুরুষ, আরেকবার তার প্রমাণ দিলাম, কারণ আমি তারস্বরে প্রতিবাদের চিৎকার না দিয়ে থেমে গিয়েছিলাম। এবং মনে মনে অভ্রান্তভাবে, আমি জানি সে শুধু দয়া দেখিয়ে তোমার চেহারায় যে আভা জমেছিল তাকে নষ্ট করতে চাইনি সেইজন্য।

অনুগ্রহে নির্ভেজাল, দয়ায় পারদর্শিনী তুমি, নইলে পথচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে উল্লাঙ্গুল, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাওয়াই যেখানে রীতি, তুমি সঙ্গে সঙ্গে সোফারকে গাড়ি থামাবার হুকুম দিলে, এবং লোকে ভীড় জমাবার আগেই টুক্ করে নেমে এলে নিচে। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উত্তেজনা এবং উদ্বেগ, সে আমাকে চিনতে পেরেছ বলে নয়, এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার এই কর্তব্যচেতনায়। পুরো চাপা যাওয়ার বদলে গাড়ির ধাক্কাটা শুধু খেয়েছি, তবু জখম কম হয়নি, যদিও তক্ষুণি জানতে পারিনি কারণ বুকের আঘাতে চেতনা হারিয়েছিলাম। আমি দুর্বল এবং কাপুরুষ।

নীল-নীল, থোকা-থোকা, কোনো-রক্তিম অবচেতনের বহু সিঁড়ি পেরিয়ে যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন যেন হঠাৎ যবনিকা পড়া নাটকের আবার উন্মীলন ঘটেছে, বহুকাল আগে পরিত্যক্ত কটা দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব। কিন্তু আমি, যদিও নব শিল্পপতির রঙচঙে মক্ষিরাণী, তোমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম, এবং সে অনেককাল পরের সাক্ষাৎ, তবু তখনই আমি জানতে চাইলাম আমার চামড়ার ব্যাগটি কোথায়, যা দুর্ঘটনার সময় আমার হাত থেকে ছিটকে পড়েছিলো রাস্তার ওপরে। জানতে চাইলাম সেটা চামড়ার তৈরি ছিল বলে নয়, জানতে চাইলাম কারণ তার ভিতরেই ছিল আমার বহু ঘর্মাক্ত দিবস ও বহু বিনিদ্র রজনীর ফল আমার স্কুল ক্যাম্পাসের নীল নক্‌শাখানা ; এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটা দালান, প্রতিটা প্রকোষ্ঠ বারান্দা, চত্বর আমি দিব্যনেত্রে দেখতে পাই—না, ছাত্রছাত্রীদের কলকাকলি মুখরিত সমগ্র

জায়গাটাই রূপালি পর্দার ছবির মতো ভাসতে থাকে আমার কল্পনায়। ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বুঝতে পেরেছেন এবং আমিও তাঁর কাজে সন্তুষ্ট।

কি, কেউ কথা বলছেন না কেন, আমার ব্যাগটা কোথায়? ওটার ভিতরে অনেক জরুরী কাগজপত্র আছে।

ওটার জন্য ভাববেন না, কিছু নষ্ট হয়নি। তুমি আরেকটু কাছে এসে শুধালে গ্রীবাখানি কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে, এখন ভালো আছেন তো?

হুঁ। চোখজোড়া বন্ধ করে আমি বললাম, আমার ব্যাগটা এখানে চাই, আমার হাতের কাছে। এক্ষুণি।

তুমি, আমি টের পেয়েছিলাম, মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলে নিশ্চয়ই ওই রঙচটা ব্যাগটার মধ্যে কি এমন মণিখণ্ড আছে যার কাছে তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও তুচ্ছ। সঙ্গত উষ্মা। সুন্দরী রমণী, সুসজ্জিতা, আবার তরুণী—তার প্রতি অবহেলা অপমানেরই নামান্তর বৈকি ; যদি খুঁতখুঁতে হন সোজাসুজি তার রূপদর্শনে আপত্তি করেন, যদিও অনুচ্চারিত, কিংবা ভাবে ভঙ্গিমায়—কিন্তু তাঁর পানে আড়চোখে কেউ তাকাবে না এটাও অসহনীয়। সুন্দরী রমণী তুমি, তোমার প্রতি এই শীতল ব্যবহারে ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

এটাই তো আপনার ব্যাগ?

হ্যাঁ, এটাই, ধন্যবাদ।

দেখুন সব জিনিশ ঠিক আছে কিনা।

ঠিক থাকবে কি থাকবে না সে বিষয় খতিয়ে দেখবার সময় ছিল না, শুধু এইটুকু অস্পষ্ট উপলব্ধি ছিল টাকা কয়টি চুরি গেলেও, কাগজের নক্শা কেউ ধরবে না, এবং ব্যাগখানি তো জাদুঘরে রাখবার যোগ্য। ব্যাগটি সাগ্রহে পাশে টেনে নিতে তোমাকে দেখলাম আমি, যৎকিঞ্চিৎ। তুমি আগের চাইতে আরো, বলতে পারি, মোহনীয়া হয়েছ, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকৃতির অকৃপণ দান এবং তার ওপরে বিচিত্র সাজসজ্জা, প্রসাধন। গাঢ় লাল রঙে বানানো ঠোঁটজোড়া, ভুঁরুটানা কাজল কালিতে, এবং গোলাপ-রক্তিম গণ্ডদেশে একটি তিল, যা কৃত্রিম সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ; কারণ পুরো তিনটি বছর কাছে কাছে থেকেছি অথচ তোমার মুখের, যত ছোট্ট স্থানেই হোক না, এমন দুর্লভ একটি বিন্দু আমার নজরে পড়বে না, তা অসম্ভব। আর পড়লে, হাফিজের মতো কইতে না পারলেও তোমার গালের একটি তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারাকে বিলিয়ে দিতে পারি, লিখতাম অন্য কিছু, আমার গোপন খাতায়, যা অর্থহীন কিন্তু অভিনব। এমনি আবোল তাবোল তো কতই লিখেছি, তুমি জান না। তোমাকে জানাইনি, জানতে দিইনি। এটাও এক অদ্ভুত খেয়াল ; আমার ভগ্ন পীড়িত জরাজীর্ণ হৃদয়ের আলেখ্য কালির আখরে অঙ্কিত দেখতে পেলে তোমার কি ভাবান্তর হত জানি না ; হয়তো আমার প্রতি বেড়ে যেত তোমার সহানুভূতি, নয়তো পল্লবিত হত গভীর কোনো ঘৃণা। এটাই ভুল হয়েছে আমার, আমার ডায়েরিটা তোমাকে কোনদিন পড়তে দিইন। কিন্তু এও তো কম তাজ্জব নয় যে, যে-তুমি আমার বই পত্র, বাক্স পেটারার নাড়িনক্ষত্র জানতে সেই-তুমি আমার অনুপস্থিতির সুযোগে দীর্ঘ সময় আঁতিপাতি করে খুঁজেও সেই খাতাটা আবিষ্কার করতে পারনি। তুমি ভেবেছিলে সেই খাতায় আমি কবিতা লিখি, কিন্তু সে অনমুান ঠিক ছিল না ; কারণ কবিতা লিখলে, তুমি আমার কবিতা পড়বে, তাতে আমার গর্বিত আর আনন্দিতই হওয়ার কথা, যদিও দাম বাড়াবার জন্য প্রথমে দিতে

অস্বীকার করতাম। কিন্তু কবিতা আমি লিখিনি, লেখা সম্ভবও ছিল না। কেননা কবিতা লেখার জন্য যে শৃঙ্খলা ও সুমিতিবোধের প্রয়োজন তা আমার অনায়ত্ত ; অবিরাম অবিচ্ছিন্ন অফুরন্ত প্রচণ্ড নির্গলিত প্রবাহই যেখানে সত্য সেখানে সম্পন্ন নদীর ঋজুধারার সন্ধান মেলে না। কবিরা মরে না, মৃত্যুকে জয় করে, কিন্তু আমার অস্তিত্ব শুধু মরবার জন্য। এখানেই আসল তফাৎ। আমার ডায়েরীর মধ্যে আমার সে প্রতি মুহূর্তের রক্তাক্ত কাহিনীই ফোঁড়া বিস্ফারণের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম রাণী এবং সেজন্যই বলছি আমি কাপুরুষ ও তুমি দয়াবতী।

তোমার দয়ার অজস্র দান জড়িয়ে রেখেছে তিনটি বছরের দিনগুলোকে, কীটদষ্ট পুষ্পকলিতে কোরকের মতো, তার প্রত্যেকটি উপলক্ষ আমার কাছে এখনো স্পষ্ট এবং আমরন তা থাকবে তাও সহজেই স্বীকার করতে পারি, কারণ হৃৎপিণ্ডে একবার যা দাগ কাটে তা কখনো মুছে যায় না। তবু সব ভুলেছিলাম। কিন্তু সে তো ডাহা অকৃতজ্ঞতা। এবং সেজন্যই বোধহয় বিশ্ববিচারক এই ব্যবস্থা নিয়েছেন, পুরো তিনটি বছর দেখবার পরে চট্টগ্রাম শহরের রাস্তায় ঋণশোধ করার আকস্মিক পরোয়ানা।

তোমাকে ঠিকমতো চেনা সত্ত্বেও আমার কাছে বসতে বলিনি সেজন্য আমার দোষ নিও না লক্ষ্মী। আমার অপরাধের অঙ্ক বাড় ক, এই আমি চাই।

তোমাকে বসতে বলিনি, কিন্তু তবু জানি তুমি আসবে আবার, অন্য কোনো কারণে না হোক অন্তত আমাকে বিপদ সীমার বাইরে দেখবার জন্য।

বাড়িয়ে বলছি না, মনে হয় এটাই তোমার বৈশিষ্ট্য, উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত দুর্লভ গুণ দয়া, যা সামান্য সুযোগেই নিজেকে প্রকাশ করে।

প্রথম রাতেই তার পরিচয় পেয়েছিলাম। ছায়া-ছায়া শ্রাবণের সন্ধ্যায় তোমাদের প্রকাণ্ড পাকা বাড়িটার বারান্দায় গিয়ে উঠেছিলাম, সেদিনের গোটা চিত্রটাই ডায়েরীতে আঁকা আছে ; বিশেষ করে প্রবাসের প্রথম দিন, সেজন্য ভূমিকাস্বরূপ ঘন করে, গভীর করে লেখা, মশারির প্রান্তে জেগে জেগে অনেক রাত অবধি।

আজ সাতই শ্রাবণ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে আমার জীবনগ্রন্থের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। নতুন জগৎ, নব পদক্ষেপ, রীতিমতো উল্লসিত, উত্তেজিত হওয়ার কথা, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা কেমন ভারাক্রান্ত। আমি বিষণ্ন, শোকার্তের মতো।

অচেনা বেদনা অনন্ত, কিন্তু আমি জানি আজকের এই বিষণ্নতার উৎস কোথায়, সেজন্য আন্দোলিত নই, পীড়িতমাত্র। গ্রাম ছেড়ে এসেছি, শহরে এসেছি উচ্চশিক্ষার জন্য, কিন্তু কোনো ছাত্রাবাসে স্বাধীনভাবে থাকবার মুরুদ নেই তা কেমন করে ভুলবো? ভুলতে পারতাম যদি শৈশব থেকেই অল্প শিক্ষা লাভ করতাম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় জনক (হে পিতা, মরেও তুমি শান্তি পাচ্ছো না!) ছোটবেলায়ই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন যে। (যদি তাঁর অন্তিম উপদেশ তাঁর শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন)।

রোগশয্যায়, (যেখানে ছিল আমার নির্বাপিত জননীর মূর্তি, হারিকেনের লালচে আলো আর কয়েকজন ছাত্রের মুখ), তিনি ভাঙা কম্পিত স্বরে বলেছিলেন, মণিরকে চিঠি লিখেছি, আমার কথা সে রাখবে। তোমরা ওর কথা অমান্য করো না।

আমি বুঝেছিলাম এই কথার ইঙ্গিত এবং যখন একলা ছিলেন তাঁর শিথিল শীর্ণ হাতের

কাছে বসে চোখ মুছেছিলাম ; সহসা প্রদীপ্ত তাঁর চাউনি, তবু শান্তকণ্ঠেই প্রবোধ দিলেন, আমার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল একটি স্কুল করবো, আদর্শ স্কুল, কিন্তু শুধু ঘামই ঝরিয়ে গেলাম, সেই স্বপ্ন সফল করতে পারিনি। তুমি পারবে, আমার স্বপ্নকে সফল করতে এ আমার বিশ্বাস। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যতীত তা অসম্ভব। সেজন্যই বলেছি ; কারুর অনুগ্রহ মাথা পেতে নিতে হয়। স্বাধীনতা এমন জিনিশ, তা'কে কেউ হরণ করতে পারে না—নিপীড়নে কিছু যন্ত্রণা দিতে পারে মাত্র।

তা ছাড়া দেখবি, মেরে কেটে টাকা করেছে বটে, কিন্তু মণির লোকটা খারাপ নয়। ধূলিখেলার বন্ধু, আমি জানি মনটা ওর খুবই ভালো। যদি যাস, তোকে দেখবে নিজের ছেলেরও অধিক। বিশেষত ওর মেয়েটি বড় লক্ষ্মী হয়েছে। আমাকে সেদিন কত আদর যত্নই করলে। বড্ড ভালো, বড্ড ভালো।

তুমি যে বড্ড ভালো, আজকের ব্যবহারে আমারও কাছে তা স্পষ্ট হল বৈকি।

মশারিও আনোনি? হয়েছে, মশারি ছাড়া শুলে মশা তোমাকে এক দম টেনে নিয়ে যাবে বাইরে। অসহায় কাতর দৃষ্টিতে মুখের পানে তাকালে আবার বললে, ঠিক আছে আম্মাকে বলে এক্ষুণি আমি ব্যবস্থা করছি।

এবং হলও তাই। এক ঘণ্টার মধ্যে আংকোরা মশারি, বিছানার চাদর, বালিশ। প্রথম বর্ষের ছাত্রী, কিন্তু এখনই কাজকর্ম বেশ রপ্ত করেছ, তোমার তদারকে আমার যে শয্যা রচিত হল তা বেশ মনোরম এবং সুন্দর। সারা বিকেলের ট্রেনজার্নির ক্লান্তি, আজ বইপত্র কিছু বার করবো না। আস্তে-ধীরে হাল্কা বোধ করছিলাম, কিন্তু সাড়ে দশটার দিকে তোমার বাবা এবং আমার বাবার বন্ধু এলেন, অতীত দিনের অনেক গালগল্প করলেন ; মনটা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাবা বলেছিলেন ঠিকই, এদের কোনো অহঙ্কার নেই, এমন ব্যবহার যেন বহুকালের আত্মীয়তা। একই পরিবার, এতদিন দূরে ছিলাম এইমাত্র।

কিন্তু আমি দুর্বল, আমি কাঁচা এবং হয়তো বা অসুস্থও—নইলে এখনো ব্যথিত, আড়ষ্ট কেন? আমি যে ভুলতে পারি না বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর এই মৃত্যুর অন্যতম কারণ, না সে কথা লিখবো না কারণ একদিন আমার কাছেও তা মনে হতে পারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য—বাবা যে আমাদের খোরপোষ চালাতে গিয়ে মাঝে মাঝে, দিনের পর দিন না খেয়েও কাটিয়েছেন, এই কাহিনী বারবার স্মরণ করতে চাই না। কারণ এ আমাকে করে দিতে পারে। আমি ভুলতে পারবো না মা একলা বাড়িতে আছেন, ছোটো ভাই দু'টো পড়াশুনা করছে এবং বোনটি বিয়ের আন্দাজ হয়ে উঠেছে।

রাণী, বাবা ঠিকই বলেছিলেন, তুমি বড্ড ভালো। তোমার অশেষ দয়া যে, এক দিনেই আমাকে আপনজনের মতো নিয়েছ। কিন্তু আমি কিছু দিতে পারবো না তোমাকে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সবাই চলে গেছে এবং আর যখন কেউ আসবে না, দরোজা বন্ধ করে এসে বাতি নিভিয়ে দিয়ে বসে বসে আমি কাঁদবো ; কেন কাঁদবো জানি না, শুধু কাঁদবো, কাঁদবো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মেঘভারনত শাওন রাতের আকাশ, অন্ধকারে ভিজে হাওয়ায় কার দীর্ঘশ্বাস, আমি কাঁদবো যতক্ষণ বৃষ্টি নামবে। নিরস্ত্র অবিচ্ছিন্ন আঝোরধারায়। প্রলয়ের ভয়ঙ্কর থাবার মতো ঝটিকা এসে তার বিকট কালো আঙুল বাড়িয়ে এক খাবলায় তুলে নিয়ে যা'ক আমার কক্ষটিকে, দুলিয়ে দিক তাকে বজ্রে বিদ্যুতে। আমি তখন কাঁদবো না, আমি

হেসে উঠবো বিকট অট্টহাস্য, যার ধারালো ঝংকারে অকস্মাৎ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আকাশ-পাতাল। হাঁ আমি পাগল হয়ে যেতে চাই, নিখাদ পাগল।

নিজেরই তাজ্জব লাগে, সেই কাঁচা বয়সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়েছি নগরীতে, তখন কেমন করে অত পাকা কথা লিখতে পেরেছিলাম রোজনামচায় কিন্তু পরে বিচার করে দেখেছি, বয়সের আমার উল্টোগতি ঃ মানুষ শৈশব থেকে বার্ধক্যে ওটে, আর আমি বার্ধক্য থেকে শৈশবে নামছি। তবু তখনো ভুল করেছিলাম—ইচ্ছে করলেই তো পাগল হওয়া যায় না, যদি যেত তাহলে বহু বোঝা থেকে রেহাই পেত দুনিয়া, কারণ পাগল মানেই সকল বন্ধনের অস্বীকার এবং বন্ধনেই বোঝার স্তূপ।

স্বপ্নের দিন-রজনীতে একটি ছেলে কেটে গেল। একটি বছর যেন কয়েকটি নিঃশব্দ ঘন্টাধ্বনি। ঢং ঢং ছায়ায় জোছনায় কণ্ঠস্বরে। এরপরে প্রাঙ্গণের প্রান্তে, গাছের সারিতে যখন ফুলের স্তবক জাগল, একদিন সন্ধ্যে হতেই আমার দরোজা ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম ঃ নিভিয়ে দিলাম আমার ঘরের বাতি, শুধু জানালার বাইরে জেগে রইল তারার আলোর একটি ঝাপ্‌সা পট। বারান্দায় খস্‌খস্ স্যান্ডেলের আওয়াজ, তুমি যথারীতি এলে, কপাটে একটু ঠেলা দিয়েই থমকে দাঁড়ালে। তোমার মনে হল বুঝিবা ঘরে কেউ নেই, দরোজা ঠেলে দিয়ে আস্তে করে ঢুকলে। কামরায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এর পরেই বাতি জ্বালবে, কিন্তু তুমি বাতি জ্বাললে না, আমার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করতে লাগল। তুমি শুধোলে বিনীত কোমলস্বরে, এ সময়ে শুয়ে আছ যে?

অন্ধকার জড়িয়ে ছিল ঘরের ভিতরে অথচ তুমি নিশ্চিত জানলে আমার উপস্থিতি, এ আমার কাছে বিস্ময় বৈকি; কিন্তু তা প্রকাশ করিনি, বললাম, ভালো লাগছে না।

কেন? অসুখ করেছে?

বুঝতে পারছি না। কয়টি সরু লিকলিকে পিচ্ছিল সাপ যেন আমার ঘাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল। তুমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, তোমার সুগঠিত মুখ, ছেড়ে-দেওয়া চুলের চারপাশে অন্ধকার জ্বলছে জোনাকিপুঞ্জের মতো। কিন্তু তখন কোমল তরঙ্গ হয়ে নেমে এসেছো। আমার মাথায় তোমার চিকন হাতের ছোঁয়া এবং ঠোঁটেও আকস্মিক ঝাপ্‌টার মতো কয়েক ঝলক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল ; সেই মুহূর্তে তুমি যেন আমাকে অভিষিক্ত করলে রক্তবহ্নিতে, আমার ওপরে একটি চৈতালী ঝড়ের অভিজ্ঞান ছড়িয়ে দিলে।

আর সেই মুহূর্তেই আমি জমে গেলাম, বরফের ভিতরে মৃত মাছের মতো ; একটি বছর ধরে প্রায়ই, সামনা-সামনি, একই টেবিলে পড়াশুনা করেছি, অথচ তোমাকে বুঝতে পারিনি, সেজন্য নয়, কিছু দূরেই অনেক কণ্ঠস্বর এই জন্য। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক হবো? আত্মীয়েরা ভাববে দুশ্চরিত্র, লম্পট?

বাতিটা জ্বেলে দাও লক্ষ্মী।

আজ দুপুরে খেতে আসোনি কেন? ভার্সিটিতে খুব ক্লাস চলছে বুঝি?

তা চলছে। কিন্তু আমার খেতেই ইচ্ছে হয়নি।

কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না তোমার। তুমি হাত ছাড়িয়ে নিলে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে জ্বাললে না বাতি, যাবার সময় বললে, গ্রামোফোনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, গান শোনো, ভালো লাগবে।

কিন্তু গান আমি শুনবো না, কারণ, গানকে ভয় করি এবং তুমি বেরিয়ে গেলে মনে মনে ঠিক করলাম, অন্ধকারেই শুয়ে থাকবো সারাক্ষণ। অন্ধকার নয়, বুনো হিজলের পেলব

কোমল ঋজু নৌকা ঃ দুলন্ত সেই নৌকোয় বসে প্রাণপণে এক পিচ্ছিল দাড় টানি আর ভেসে চলি আশ্চর্য জোয়ারে, যার সামান্য ওপরে হাল্কা নীলাভ হিমেল চাঁদ আর প্রবাহের মোচড়ে মোচড়ে শ্বেতপদ্মকোরক সকল—ভেসে চলি, ভেসে চলি, ভেসে চলি যতক্ষণ না মধ্যবিন্দুতে হঠাৎ উল্টে গেল নৌকো—এবং সেই বিন্দুপথে পাতালের দিকে অনবরত দুর্বার পতন যদিও শেষ পর্যন্ত ভেসে উঠি গুগলিপাওয়া হংসের মতো। লালপদ্মের রক্তিম পাপড়ি, যুগল ছেঁড়া কলিরা ভাসমান যেন রূপায়িত রক্তের সম্ভার।

আধখানা চাঁদ নেমে আসে নিচে আমার মুখের কাছাকাছি, সঙ্গে সঙ্গে চলে এবং আমি সাঁতরে যাই হারিণচোখের মতো এই নদী।

নিমজ্জিত ছিলাম সজাগ হয়ে কাছাকাছি অন্দরমহলে অনেক পরিচিত সংলাপ, কিন্তু দরজার দিকে চাইতে শিহরিত ঃ আবছায়ায় বিশাল শরীর নিয়ে লকলকে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন পিতা এবং তাঁর চোখজোড়া জ্বলছে শ্বাপদের দৃষ্টির সমান। বিছানা থেকেই হামাগুঁড়ি দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিলাম ঃ কেউ নেই!

সে রাত্রে ডায়েরীতে লিখেছিলাম, বুকের ভিতরে, প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু, রক্ত ঝরাবো আমি, তবু তোমার স্বপ্নকে ব্যর্থ হতে দেবো না।

রাণী, বড্ড ভালো তুমি, তুমি আমাকে ভুলে যাও, ভুলে যেয়ো।

কিন্তু তুমি দয়াবতী, তাই তোমাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত হতভাগ্য জীবটিকে ভুলতে পারনি ঃ তুমি এসেছ যখন পরম লগ্ন তখনো। একটু আগে কিছু ঝড় হয়ে গিয়েছে, বিজলির নেভাজ্বলায় আর গুরু গর্জনে আবার চলছে ঝড়ের আয়োজন, জানালা দিয়ে আসছে সিক্তমাটি ও গাছগাছড়ার সোঁদালো বুনোগন্ধ এবং ঝড়ের সময়ে কিছু ছেঁড়া লতাপাতা এসে পড়েছিল যেগুলো তখনো ছড়িয়ে আছে মেঝের ওপরে। কপাটে টোকা টুক্ টুক্ টুক্, আমি উঠে গিয়ে দরোজা খুলে দিলাম ঃ গায়ে চাদর, খোলা চুল—তুমি বসলে আমার শয্যায় ; তোমার ডান হাতখানি আমি টেনে নিই আলগোছে (খরস্রোতা ভরানদীর মতো পরিপূর্ণ নিটোল তোমার শরীর সেদিন হঠাৎ অসতর্ক আয়নার ভিতরে দেখে চমকে উঠেছিলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি রুগ্ন, দুর্বল এবং অসহায়), পরিপুষ্ট নরোম সুগোল হাত, কিন্তু এখন যেন শীর্ণ, আমি শুধোলাম, কি ব্যাপার রাণী, অমন পাগলামি করছ কেন।

পাগলামি! তোমার ঠোঁটজোড়া নড়ল কিঞ্চিৎ।

নয়তো কি। এ সময়ে, এত রাত্রে আমার এখানে এসেছ—

তা'তে হয়েছে কি, আমি একশ'বার আসবো। আমার ইচ্ছে।

এরপর সহসা আমার দিকে ঘুরে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তৈরী হয়ে নাও। এক্ষুণি যেতে হবে। আমরা পালিয়ে যাবো।

কি বলছ তুমি লক্ষ্মী।

ঠিকই বলছি। তুমিতো জানো ও বিয়েতে আমার মত নেই, অথচ বাবা নাছোড়বান্দা। আমি এ বাড়িতে থাকবো না।

কিন্তু আমি কেমন করে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাই? ওটা মহাকেলেঙ্কারী হবে না?

হোক না। আমি রাজি হয়েছি তোমার সঙ্গে যেতে, আর তুমি ওইটুকু স্বীকার করতে পারবে না?

তুমি তো জানো রাণী আমি হতভাগ্য, বহু সংগ্রামে জীবনটাকে গড়ে তুলছি। অনেক কাজ আমাকে করতে হবে। তা'ছাড়া, আমার দুঃখের সঙ্গে কেন মিছিমিছি তোমার ভাগ্যকে তুমি জড়াবে।

আমার ইচ্ছে আমি সুখ চাই না। দুঃখই চাই।

না, রাণী না। তুমি সুখের মধ্যে মানুষ হয়েছ, আমি তোমার চিরদুঃখের কারণ হয়ে উঠতে চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

সহসা বিষাক্ত নাগিনীর রূপে তুমি ফুঁসে উঠলে, আমার বুকের কাছ থেকে তোমার ঋজু শরীরটাকে এক ঝট্‌কায় সরিয়ে নিযে জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো তুমি বলরে, বুঝেছি, সব ভাওতা এই স্তোকবাক্য। আসলে পুরুষ নও, পুরুষ এমন হয় না—তুমি কাপুরুষ। আস্ত কাপুরুষ। তুমি জানো পাঁচ-পাঁচটি ছেলে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে—তারা শিক্ষিত, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। তোমার কি আছে যে এত অহঙ্কার? না রূপ, না স্বাস্থ্য। তুমি ভেবেছ আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, কিন্তু সে তোমার ভুল। আসলে তোমাকে আমি দয়া করেছি, দয়া!

এর কিছুক্ষণ পরেই শোঁ শোঁ আওয়াজ করতে করতে আবার রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেঙে রূপকথার দৈত্যের মতো, ঝড় নেমে এসেছিল। জানালা বন্ধ করলাম, না, আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝড় দুর্বার জাপট দিতে লাগল আমার চোখে, আমার মুখে, সারা চেহারায়—যেন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বন্ধুর স্পর্শ সান্ত্বনা এবং ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নামবার আগেই আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে, তারপর বৃষ্টি শুরু হলে বৃষ্টিতে অশ্রুতে অবিরাম শিহরিত হতে থাকি।

বিল, ডাক্তার সাহেব!

ও ইয়েস।

আচ্ছা, আর তো কোন বিপদের আশঙ্কা নেই? তোমার কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, হ্যাঁ তোমার কণ্ঠস্বর।

না, না। বুকের আঘাতটা একটু সিরিয়াস ছিল, এখন সেরে যাবে। প্যাডের ওপরে ডাক্তারের কলমের দ্রুত খস্‌খস্ শব্দ। আবার বললেন, রোগীকে একটু সাবধানে রাখবেন। উনি তো আপনার আত্মীয়?

জ্বী, হাঁ। স্নিগ্ধ নম্রস্বরে বললে তুমি, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যে স্পেশাল কেয়ার নিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ।

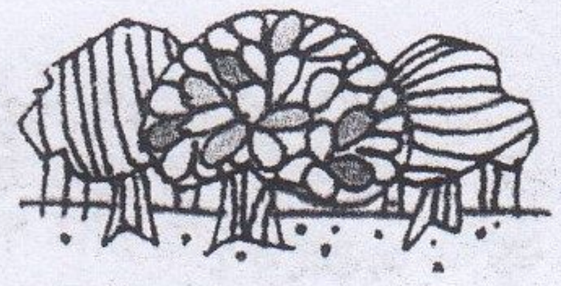
না, না সে কিছু নয়। দিস ইজ্ আওয়ার ডিউটি। তাছাড়া মাস্টার মানুষের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। আফ্‌টার অল্ দেয়ার পুঅর ফেলো।

কথাটা শুনে মনে হল, তুমি হাসলে একটুখানি। তারপর এলে আমাকে দেখার জন্য। ব্যান্ডেজ নিয়েই আমি উঠেছিলাম—আমার চিকিৎসার টাকা তুমি দেবে তা হতেই পারে না। আমি ভিখিরি নই, দেউলিয়া নই। কিন্তু পারলাম না কিছু বলতে, তোমার মুখের পানে চাইতেই থেমে গেলাম। তোমার মুখে স্নিগ্ধতা, একটা প্রশান্তি ; এক গভীর পরিতৃপ্তি, সুষমা। তোমার এই সুখের অনুভূতিকে ভেঙে দেওয়া রীতিমত পাষণ্ডতা। নিজের ক্ষতি হোক তবু সে পরিচয় নাইবা দিলাম এখন, বিশেষত যখন আমার অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে তুমি তোমার বাসার কাজ ফেলে ছুটে এসেছ দেখাশুনা করবার জন্যে।

তুমি এই শহরেই আছ জানতাম, অথচ আশ্চর্য যাকে গাড়িতে যেতে দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়, সে তুমি নও তেমারই মতো অন্য একজন।

জুলাই, ১৯৬৩।

যখন সৈকত



হালকা খড়খড়িগুলো আবার বাজিয়ে গেল মাঝরাতের উন্মুখর হাওয়া, তারপর একটানা ঘনঘন, মৃদু ঝাপটা দিতে থাকে, নিশাচর সাঙাতের মতো, নিষিদ্ধ কাজে যাওয়ার জন্য যে ডাকে সংকেতে।

ঘুম ভেঙে যেতেই কলিম উঠে বসে এবং গায়ের চাদরটা সরাতে গিয়ে দেখে সেটা চাদর নয় শাড়ি, ঘুমের মধ্যে মর্জিনার প্রায় সবটা শাড়িই কখন জড়িয়ে নিয়েছিল নিজের গায়ে তা জানে না।

কাছেই মর্জিনা শুয়ে আছে। তার গভীর পরিতৃপ্ত ঘুমের শ্বাসপ্রশ্বাস শ্রুতিগোচর। সে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে—একতাল উত্তরঙ্গ মাংসপিণ্ড। গোড়া থেকেই স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু এখন যে পূর্ণ জোয়ার, শরীরের বাঁকে বাঁকে বিপজ্জনক উদ্বেলতা। ঘন কালো দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, আধুনিক কবির ভাষায় বলা যায়, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, টানা-টানা ভুরু, মদির নয়ন, রক্তিম অধর। তলপেট উরু পায়ের গোছা পায়ের আঙুল সে বহুবার হাতড়ে দেখেছে, এবং তখন যদিও কিছুই অসাধারণ লাগেনি, দিনের আলোকে সভ্যতার আবরণে সেই দেহধারিণীকেই মনে হয়েছে মারাত্মক। এ কি সত্যি, না তার মনোবিকার, উন্মত্ত ভাবনা? সে তাও বলতে পারে না ; তবে এর মধ্যে বিধাতার যে কিঞ্চিৎ পরিহাস আছে তা স্পষ্ট। রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য দরিদ্র সাংবাদিকের বৌকে আরেকটু কম রূপসী করলে তাঁর ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু আফসোস বৃথা। সে ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে।

কপাল যখন তাকে মার দিয়েছে, কপালকেও সে ছাড়বে না। পতনের চাইতে ধ্বংসই উত্তম।

সে মর্জিনাকে খুন করবে।

মর্জিনাকে খুন করা চাই।

মর্জিনা তার হাতেই খুন হবে। গত কয়দিন ধরে, মনে-মনে, এই আলোচনাই সে করেছে এবং যখন ফয়সালা হয়ে গেল, এইখানে এই সমুদ্রতীরে কটেজে এসে সে অকৃপণভাবে হিসেব দিতে শুরু করেছে। ওর কাছে তার ঋণ অনেক, বহুদিন বহুরাত্রি বহু ঋতু ধরে ক্রমে ক্রমে জমে ওঠা। বড় ঘরের সম্বন্ধ নাকচ করে তাকে বরণ করা প্রথম ঋণ, এত অভাব-অনটনের মধ্যেও হাসিমুখের উপহার দ্বিতীয় ঋণ এবং শিরদাঁড়ায় ক্যান্সার ধরা পড়লে ডাক্তারের পরামর্শ মতো দু'বছরের সম্পূর্ণ অবসরের ব্যবস্থা করা তৃতীয়। এত যে দিয়েছে তাকে কিছু ফেরৎ দেওয়া দরকার। এমন জনকে রিক্তহস্তে বিদায় করা অমানুষিকতা, বিশেষত যখন ঠিক করেছে তাকে হত্যা করবে। ঘুমের মধ্যেই বুকের মধ্যে আমূল বসিয়ে দেবে ছুরি, হৃৎপিণ্ড ছেদা করে ফেললে আর বেঁচে ওঠবার সম্ভাবনা থাকবে না, এবং সে কাজ তো নিতান্ত সহজ। কিন্তু লাশটার কি সদগতি করবে সে হল সমস্যা। সাগরবেলার বালুতে গর্ত করে পুঁতে ফেললে ধরা পড়বার আশংকা, কারণ একটু জোর বাতাস বইলেই বালু সরে যেতে পারে। কাছে—ভিতের পাহাড়ে-জঙ্গলে শেয়ালের বড় আধিপত্য, বালুকাবৃত মৃতদেহের লোভনীয় গন্ধে নিশ্চয় তারা জড়ো হবে রাতের বেলায়, লোকালয়ের কাছাকাছি, কাজেই প্রতি মুহূর্তে ভয়ের দরুন কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফেলে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মৃতদেহের এমন সৎকার করতে হবে যাতে একটা কাকপক্ষীও কোনক্রমেই টের না পায়।

সেজন্য একটি সাম্পানের প্রয়োজন। পা জোড়া পাথরের সঙ্গে বেঁধে বারদরিয়ায় ডুবিয়ে দিয়ে এলেই নিশ্চিন্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তরবারির মতো ধারালো দাঁত মৎস্যেরা এসে ছিঁড়ে খাবে, নয়তো সেই লাশ সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের সঙ্গে মিশে কোথাও হারিয়ে যাবে অনন্তকালের মতো।

মর্জিনা ঘুমুচ্ছে ; এখন ঘুমুক।

টেবিলের ওপর থেকে ছুরিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর আস্তে করে এসে ছিটকিনি খোলে দরোজার। কাছেই সমুদ্র, বারান্দা থেকে দেখা যায়, হাওয়ার সঙ্গে ফেনিল তরঙ্গ ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ছে, উপকূলে একটা অবিচ্ছিন্ন সর্‌সর্‌ আওয়াজ। পৃথিবী যখন নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন কার প্রতীক্ষায় যেন মেতেছে প্রবল মত্ততায়। ডুবুডুবু খণ্ড চাঁদ, অস্পষ্ট জোছনায় চতুর্দিকে মায়ালোকের ব্যঞ্জনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ সম্পূর্ণ ডুবে যাবে তখনই উপযুক্ত সময়, কেননা হত্যাকাণ্ড অন্ধকারে সংঘটিত হওয়াই নিরাপদ। বিশেষত মুখ যেন নজরে না পড়ে, তাতে চিত্তদৌর্বল্য জাগার আশংকা।

মর্জিনার মৃতদেহটা নিয়ে যেপথে আসবে বেলাভূমিতে একটা সিগারেট ধরিয়ে মাঝে মাঝে টানতে টানতে সেখান দিয়ে ধীরপদে হেঁটে এল।

আসলে খুনের চাইতে খুনের সামাল দেওয়াটাই কঠিন কাজ। যদি ওর লাশটাকে দরিয়ার মধ্যে ডুবিয়েও দেওয়া যায় তবু সহজে নিস্তার কোথায়। মর্জিনার আত্মীয় কুটুম্ব আছে, বিশেষত ভাইটি দুর্দান্ত। হাওয়া-বদল শেষ করে যখন ফিরে যাওয়ার কথা তখন দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে না পেলেই কানাঘুয়া শুরু হয়ে যাবে। সওয়াল থেকে সন্দেহ, সন্দেহ থেকে তল্লাশি।

এই বিয়েতে মেজবাহের একদম সায় ছিল না এবং সে, ওর দু'বছর হাসপাতালে শায়িত থাকবার সময়ে মর্জিনার মন ভাঙাবার কম চেষ্টা করেনি। মর্জিনার পাষাণপ্রতিম দৃঢ়তাই ছিল একমাত্র বাধা। নইলে এখন সে বিত্তবান কাপ্তানের বাড়িই উজ্জ্বল করে থাকত।

মর্জিনা রাজি থাকলে কাপ্তান নাকি তালাক ছাড়াই, আইনের ঝুঁকি নিয়ে শাদি করতে তৈরি ছিল।

তার ধারণা, তাড়াতাড়া কড়কড়ে নোট ওড়াতে পারলে আইনের কোমরে জোর থাকে না বেশিক্ষণ।

মর্জিনা রাজি হয়নি।

নাকি অভদ্র গুণ্ডা বলেছে তাকে। মেজবাহ্‌ বড়ভাই, তাকে ধমক দিয়েছে।

আসলে মর্জিনার একটা জিনিশ আছে। বেদেনীর বাজিকরী শক্তির মতো, তার নাম গরবী অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের বলেই সে সব কিছুকে তুচ্ছ করে। এই তার সাহস, এই ব্যক্তিত্ব। কৈশোর থেকে আড়ালে আবডালে খেলাধুলার লুকোচুরিতে গড়ে উঠেছিল যে প্রেম, পরে তাকেই স্বীকার করে নেবার দায় ছিল না, বিশেষ করে যখন বিপক্ষে কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মনে মনে যা সে ঠিক করেছে তাই ঠিক। সে অনুসারে এক দুপুরে বেরিয়ে গিয়ে আদালতে দুইজনে মিলেছিলো।

কিন্তু সম্পূর্ণ তাও নয় ; মেজবাহের চাইতে এখন তালিবের ভয়ই বেশি। প্রত্যাবর্তনকালে মর্জিনার অনুপস্থিতি যার নজরে আসবে প্রথম সে এই ব্যক্তি, যে একদিন জানের জান ইয়ার ছিল অথচ এখন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নিয়েছে।

অবশ্য গোড়াতেই বাধা দিয়েছিল মর্জিনা, বলেছিল, কক্সবাজার বেড়াতে যাচ্ছি, অন্যের বাসায় উঠবো কেন। টাকার জোগাড় না হলে যাবোই না।

না না টাকার প্রশ্ন নয়। জবাব দিয়েছিল কলিম, আসলে জানো তো আমি অসুস্থ।

হাওয়া বদলে যাচ্ছি তোমাকে নিয়ে একদম একলা. একটু ভরসা চাই।

ভরসা, কিসের ভরসা। আমি তো আছি।

হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয় আছো। সেজন্যই যে আমার ভাবনা।

ভাবনা? মর্জিনা যেন বিস্মিত হল, শুধাল, কিসের?

না, না এমনি। কলিম কথাটা ঘুরিয়ে ফেলল, বলল, মানে তোমার সুখ-সুবিধা দেখতে হবে তো? অথচ আমি নড়াচড়া করতে পারি কম।

তালিব সাহেব আমার তালাপি করবেন এই তুমি ভাবছ?

না, তা নয়। চেনা লোক কাছে থাকলে একটু ভরসা এই যা।

বলেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছে টাকার প্রশ্নটাও কম বড়ো নয়। দুই বছর ধরে শয্যাগত। দুই বছরই উপার্জন করেছে মর্জিনা ; ওষুধ কিনেছে, পথ্য দিয়েছে এবং তার নিজেকেও তো চলতে হয়েছে। ক্যান্সারের থাবা দিয়ে মৃত্যু আঁকড়ে ধরেছিল, তার থেকে যে নিষ্কৃতি পেয়েছে, সেবাযত্নের কথা বাদ, তার জন্য পয়সাও কম খর্চা হয়নি, রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়েছে, তবুও ; কাজেই এখন একটু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ডাক্তার হাওয়া-বদল করতে পরামর্শ দিয়েছেন ঠিক কিন্তু তাই বলে খুব পয়সা ওড়াতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তালিবের ওখানে অর্ধেকেরও কম খর্চা হবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তিঃ আপ্তবাক্য ভুল নয়, নইলে যার বাসায় উঠতে আপত্তি জানিয়েছিল তার সঙ্গে এখন ফষ্টিনষ্টি?

অন্যে বললে বিশ্বাস করত না, কিন্তু নিজের জলজ্যান্ত চোখজোড়াকে অস্বীকার করা অসম্ভব। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নিজের চোখে দেখেছে—তালিব ওর হাত ধরেছে, আর মর্জিনা সে-হাত ছাড়াতে গিয়ে হেসে কুটিকুটি।

এইটুকুই যথেষ্ট। নারীর সতীত্ব বিচারে এর বেশি নিষ্প্রয়োজন।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো বেলাভূমিতে, বালুময় সৈকত, আবছা জোছনার তলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস—তাই দেখে, আর আস্তে আস্তে করে পায়চারি। দিগন্ত অদৃশ্য, দূরের দ্বীপ শুধু এক আঁধারের পোচের মতো ঃ লোকজন কেউ নেই, কোথাও। হঠাৎ মনে পড়ে, এই সময়ে ভৌতিক কিছুও ঘটতে পারে, বিশেষ করে যখন রাত একটা। পিছন থেকে দৌড়ে এসে কেউ জাপটে ধরলে? গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে, এই ভাবনায় ঢিব্‌ঢিব্ করে বুকের তলা। মাঝে মাঝে চোখ ঝাপসা ঃ এক সময় দেখে বাঁদিক থেকে ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসে একটি ডিঙি নৌকা, যার মধ্যে একজোড়া নরনারী, হাসছে, আর যেন ডাকছে হাতের ইশারায়। কাছে এলে দেখল তরুণী আর কেউ নয়, মর্জিনা এবং সঙ্গী তারই বন্ধু তালিব ঃ সে পিছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে মর্জিনাকে ঃ অদ্ভুত দৃশ্য!

এসো কলিম, আমাদের সঙ্গে এসো।

তারপরে দু'জনেই হেসে লুটোপুটি।

কলিম ভাবলো চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু চোখ কোচ্‌লে আবার চাইতেই দেখে আগের মতো তেমনি তরঙ্গের আবর্তন।

ছুরিটা বিঁধিয়ে রেখেছিল বালুর মধ্যে, তা তুলে নিয়ে ফিরে আসতে থাকে কটেজের দিকে। মনে-মনে ধিক্কার দেয় নিজেকে—এত অল্পতেই শংকিত? ভয় মায়া মমতা, সামান্য উস্কানি পেলেই দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠে, বেড়ে যায় ঃ বুদ্ধিমান লোক এদের প্রশ্রয় দেয় না। ভয়কে জয় করতে হবে, দলন করতে হবে সেসব হৃদয়বৃত্তিকে, যা শুধু দুর্বলতার পরিচয়।

কে ওখানে?

আমি, দরোজাটা খোলো, আর চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নাও লক্ষ্মী, আমরা এখন পালিয়ে যাব।

জানালার কাছে মর্জিনাকে যে বলছে এই কথা সেও সেই একই লোক। মর্জিনা হুড়মুড় করে কোনক্রমে কাপড় জড়ালো গায়ে. তারপর বেরিয়ে পিছন পথে দ্রুত চলতে থাকে দুইজন।

আসলে এটাও একটা সন্দেহ, যা মনে জাগতেই চলার গতি বাড়িয়ে দেয় ঃ যেন সত্যি এখন গিয়ে দেখবে ঘরে কেউ নেই।

কেউ নেই, সহসা অদ্ভুত লাগে ব্যাপারটা, অর্থাৎ পৃথিবী মর্জিনা শূন্য—এমন করে কোনোক্ষণে ভাবেনি। মর্জিনা ভোরের মতো সত্য, রাতের মতো সত্য। জন্মাবার পর কত বছর মর্জিনা-হীন কেটেছে তা সত্যি মনে পড়ে না। শৈশব যৌবন কর্মপ্রয়াস, সর্বত্র মর্জিনা। মিলনে মর্জিনা, বিরহে মর্জিনা। আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো মর্জিনার অস্তিত্ব। অথচ আগামী সকাল থেকে মর্জিনা অদৃশ্য হবে, রক্তমাংসের মূর্তি হিসাবে চিরতরে, হয়তো থাকবে শুধু মর্জিনা নামে একটি কল্পনা, একটু ভাবনা, কিংবা দূরবর্তী কোনো স্বপ্নের রেশ।

আস্তে দরোজাটা ঠেলে আবার কামরায় প্রবেশ করে, প্রথমেই নুয়ে হাতড়ে দেখলো মর্জিনা আছে কিনা। মর্জিনা আছে, ঘুমিয়ে আছে।

কাছে বসে সে, ওর অঙ্গ-প্রতঙ্গে হাত বুলোতে থাকে, নেশাগ্রস্তের মতো।

একি! হঠাৎ পাশ ফেরে মর্জিনা, না লক্ষ্মী, ঘুমিয়ে থাকো।

মর্জিনা!

না, শুয়ে পড়ো তো।

মর্জিনা আমি বলতে চাই—কলিম ভাবলো বুঝি চেঁচিয়ে বলছে, কিন্তু আসলে ঠোঁটে অস্পষ্ট গুঞ্জন।

বুঝেছি, মর্জিনা একটানে ওকে পাশে শুইয়ে দিয়ে গলা আঁকড়ে ধরে, নিমগ্নস্বরে বলে, খুব দুষ্টু হয়েছ।

দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার একটানা আওয়াজ, হাওয়ার বেগ যেন বেড়েছে কিঞ্চিৎ।

বৃশ্চিকের মতো কি একটা শির্‌শির্ করে মস্তিষ্কে উঠল, হঠাৎ কলিশ বেশ জোরে ধাক্কা দিতে থাকে, মর্জিনা! মর্জি!

এবার সত্যি হকচকিয়ে ওঠে মর্জিনা, ওর ঘুম ভেঙে যায় পুরোপুরি। কলিশ বলল, মর্জিনা আমি তোমাকে খুন করবো!

কি? তড়াক করে উঠে বসে বিছানায় শাড়িটা জড়াতে জড়াতে শুধালে, কি বলছ?

আমি তোমাকে—কলিমও উঠে বসলো, অকম্পস্বরে আবার বলল, আমি তোমাকে খুন করবো।

ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি, তবু ঠিকমতোই কথা বলল মর্জিনা, দুঃস্বপ্ন দেখেছ? রাখো বাতিটা জ্বালি।

কলিম ওর হাত ধরে ফেলে শক্ত করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, না। বাতি জ্বালাতে হবে না। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

কি বলছো তুমি আবোল—তাবোল, এতরাত্রে আদিখ্যেতা ভালো লাগে না। চলো শুয়ে থাকি।

না। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখ আমার হাতে ছুরি। বাইরের পাথরে ধার দিয়ে এনেছি।

সত্যি একথা বলছো তুমি? আত্মরক্ষার জন্য যেন ভিতরে ভিতরে তৈরি হতে থাকে, আর সে জন্যই অন্যদিকে চালিয়ে নেবার চেষ্টা।

তোমাকে খুন করবো, আমি মনে মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু জানো আমি হৃদয়হীন নই, সেজন্য তোমার ইচ্ছানুসারেই তুমি মরবে। তার মানে, তুমি কি ধরনের মরতে চাও। আমাকে বলো।

ঠিক আছে। তুমি যখন চাও, তখন আমার মরতে আপত্তি নেই। মর্জিনা উরুটা কিঞ্চিত সরিয়ে বলল, কিন্তু কেন মরবো জানতে বাসনা হয়।

কেন মরবে জান না তুমি?

না। এই না-টা যেন হ্যাঁ, কারণ সবকিছুই জানে মর্জিনা, আয়নার মতো পরিষ্কার।

তুমি জানো কিন্তু স্বীকার করতে চাও না।

আমি কিছুই জানি না।

এবার হঠাৎ শিখার মতো জ্বলে উঠল কলিম, ওর কাঁধে দু'হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কেন তুমি ব্যভিচারিণী, এ তুমি জানো না?

আরো স্পষ্ট করে বলো। অবিচলিত কণ্ঠস্বর মর্জিনার।

স্পষ্ট করে আর বলবো কি। একথা ঠিক নয় যে তুমি তালিবের সঙ্গে—

না, তালিব কিছু করতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় পরে মর্জিনা। সে কিছু প্রকাশ করবার জন্য যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বলল, কিন্তু তবু স্বীকার করি আমি, তোমাদের ভাষায়, যাবে বলে ভ্রষ্টা, ঠিক তাই। আমাকে খুন করবার জন্য তুমি ছুরি হাতে নিয়েছ, কিন্তু এর চাইতে সাংঘাতিক কিছু শোনবার জন্য তৈরি হও!

আমি তৈরি আছি। বলো তুমি।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। তাহলে সত্যি তোমার অনেক মানসিক উন্নতি হয়েছে, বলতে হবে। মর্জিনার স্বরে পরিহাসের সুর, আবছা অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসে সে বলতে লাগল, আমাকে তুমি খুন করবে সেজন্য আমি তৈরি, কিন্তু তার আগে আমার সব কথা তোমাকে বলতে চাই। প্রথমে যা বলবো তা হল, আমি যা করেছি সব তোমার জন্য। সেরেফ তোমার জন্য!

কলিম চুপ মেরে থাকে, পাথরের মতো স্তব্ধ।

ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে মর্জিনাকে, যেন বিষাক্ত ছোবল মারতে উদ্যত। তবু শুনতে হবে ওর সব কথা, সব কাহিনী।

তোমাদের সমাজ, তোমাদের সভ্যতার এমন রীতি আমার জানা ছিল না—মর্জিনা যেন অন্যগ্রহের অধিবাসিনী, কিংবা পৃথিবীর হলেও, পাহাড়ী কন্যা, যে অনেক বিশ্বাস করে এসেছিল, কিন্তু এখন ভেঙেছে সব বিশ্বাস। সে বলতে থাকে তন্দ্রার ভাষায়, মরবার আগে আমি সব বলবো। কিছুই গোপন রাখব না এবং আমি জানতাম একদিন সব বলতে হবে, আমাকে, জবাবদিহি করতে হবে। সে সময় এল সাগর সৈকতে, ভালোই। তুমি অসুখে পড়লে, আমি বেরুলাম বাইরে—সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে দুনিয়ার একটা ছদ্ম আবরণ যেন উন্মোচিত হয়ে গেল। পরিচিত যারা, সব অন্য চোখে তাকায়। পাড়ার ছেলেরাও শিস দিতে ছাড়ে না। কিন্তু আমার স্থির প্রতিজ্ঞা তোমাকে বাঁচাবো। সেজন্য সব অপমান, সব লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে যাব। বেহুলা যদি যমের হাত থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে আনতে পারে, এ যুগের আমি নারী কি একটু ওষুধও তোমার মুখে তুলে দিতে পারবো না?

ডাক্তার ওষুধ পথ্য। শয়নে স্বপনে এই আমার জপমন্ত্র।

ডাক্তার ওষুধ ও পথ্যের জন্য প্রতিমাসে অন্তত হাজার টাকার দরকার অথচ প্রথম মাসেই আমার সঞ্চয় নিঃশেষিত।

দ্বিতীয় মাসের গোড়ায় কাগজের মালিক, দেখা করলে বললেন, সোরি ম্যাডাম। আমি বড় জোর লিভ্ উইদাউট পে মঞ্জুর করতে পারি। আজকাল চাকরি মেলে না কাজেই ওটাও মিঃ

কলিমের জন্য কম করা হয় না। তার সার্ভিস স্যাটিসফ্যাকটরি। সেজন্যই আমি ওইটুকু করতে চাই। ইন্‌শাল্লাহ্ উনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে আমার কাগজে জয়েন করতে পারবেন।

আমার রাগ হল। বললাম, এটুকুতেই আপনার দায়িত্ব শেষ? আপনার কাগজকে গোড়া থেকে যারা গড়ে তুলেছে ও ছিল তাদের অন্যতম। দিন নেই, রাত নেই—সকাল নেই দুপুর নেই, আপনার কাগজের জন্যই খাটাখাটি করেছে। আর এজন্যই না অসুখটা হল।

এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। সম্পাদক আমার মুখের উপরে বললেন, ক্যান্সার ইজ এ ডিফারেন্ট টাইপ অব ডিজিজ। নোবোডি ক্যান টেল্ হাউ ইট অরিজিনেট্‌স।

তবু আপনার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে একথা অস্বীকার করতে পারেন না।

না, তা পারি না। তবে সেজন্য নির্ধারিত মাইনেও তাকে দিয়েছি। আমি দেখলাম তর্ক নিষ্প্রয়োজন। মেষশাবককে ভক্ষণ করবার যুক্তি সর্বদাই নেকড়ের কাছে জমা থাকে।

নবীভাই একদিন বিকেলে এসে বললেন, প্রেসক্লাবে চলো মর্জি। একটা লিখিত আবেদনপত্র দাও। আর সবাইকে মুখে বলো। সকলের চাঁদায় একটা মাসোহারার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

আমার ভীষণ রাগ হল। বললাম, ধিক্ তোমাদের চাঁদায়, নবীভাই ধিক্। মরে যাব, তবু কারুর কাছে হাত পাতবো না।

তুমি মিছে সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ মর্জিনা। নবীভাই বললেন, বন্ধুদের সহানুভূতি লাভের অধিকার কলিমের আছে।

তা তোমরা তাকে দেখাও, আমার কাছে এসেছ কেন? চিকচিকে পানি দেখা দিল আমার চোখের কোণে, কান্না ঠেলে উঠতে চাইলো কণ্ঠনালীতে, কিন্তু নিজেকে দমিয়ে রাখলাম।

চুপ হয়ে গেলেন উনি আমার আবেগের তীব্রতায়, কিন্তু পরে আঘাত করতেও ছাড়লেন না। বললেন, তোমার কাছে এসেছি কারণ তুমি তাঁর স্ত্রী। তার প্রতি তোমারও কিঞ্চিৎ কর্তব্য আছে।

ধন্যবাদ, কিন্তু আমার কর্তব্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। তোমাকে বলে দিই, যারা মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নেয় আমি তাদের ঘৃণা করি।

নবীভাই ক্ষুব্ধ, ব্যথাহত। উনি চলে যাওয়ার পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম আমার বাড়াবাড়ি হয়েছে, উনি আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিতে এসেছিলেন, আমি ফিরিয়ে দিলাম। এছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না হয়তো। ক'দিন সব দেখে শুনে ভেতরে-ভেতরে এমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, অল্প সুযোগেই সব প্রকাশ পেল, বিস্ফোরণের মতো।

কিছু কারণ যে না ছিল এমন নয়।

ওরা তোমার বন্ধু, তোমার বিপদে যদি সাহায্যই করতে চায়—এত ভনিতা কেন? আমার বিচারে এ আত্মপ্রতারণারই শামিল।

সেদিনই ঠিক করলাম, চাকরি নেবো। তোমাকে হাসপাতালে পাঠাবার আগে থেকেই এই পরিকল্পনাই আমার ছিল।

বান্ধবীদের প্রত্যেককে বললাম, কোন সুযোগ করে দিতে পারে কিনা। নিজেও খোঁজখবর নিতে লেগে গেলাম।

আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারিনি ; কিন্তু এক সপ্তাহেই বুঝতে পারলাম বড়ো চাকুরির জন্য বড়ো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই, যদি তাদের দৃষ্টির কাছে নত হতে পারি। কিন্তু মেয়েরা কি শুধু লালসার পণ্য?

বাইরে চলাফেরা করতে দেখে বেশ কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীও জুটে গেল। বাদল নামের ছোকরাটা একটি অচেনা লোককে নিয়ে এল একদিন, বলল, ভাবী রাজি হয়ে যান। দেখবেন

এক ছবিতেই আপনি বিখ্যাত।

জ্যাকেটপরা সঙ্গের লোকটি, যিনি সেই ছবির পরিচালক, বলল, শুধু বিখ্যাত নয়। আপনি হবেন আমাদের রুপালি পর্দার রাণী। আপনার ফেকাটিংয়ে আমি বিশ্বজয়ের স্পষ্ট আভাস দেখতে পাচ্ছি।

সিনেমার কথা ভুয়ো, ওদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, লোকটাকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে বুঝতে পারি। কিন্তু ভদ্রভাবে জানিয়ে দিলাম, না ভাই ছবিতে নামবার কোনো প্ল্যান আমার নেই। আমাকে এপ্রোচ্ করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ।

এমনি চলছে, সব অনিশ্চিত। এবং ক্রমে শেষ পয়সাটি পর্যন্ত খতম।

অলঙ্কার ছেড়ে দিয়ে তোমার ওষুধ পথ্য জোগাচ্ছিলাম, কিন্তু সেভাবে আর ক'দিন চলে? ঘুম আসে না সারারাত, আমি ক'দিন না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু তোমার ব্যবস্থা? অভাব কিছু আছে জানতে দেবো না এবং আমি ভালোই আছি, সেই হাসি মুখ দেখাবো তোমাকে। অসুখে দুশ্চিন্তাটা মারাত্মক হতে পারে, তাই এত সতর্কতা।

দুটো টিউশানির অফার পেয়েছিলাম, শেষ তক্ তাই নিলাম। টাকা অবশ্য কম, তবু দুটো দিক থেকে সুবিধে। প্রথম ছেলেমেয়েদের পড়ালে সময় বেশ কেটে যাবে এবং দ্বিতীয়ত পরিপূর্ণ সৎ উপার্জন।

মর্জিনা থামলো, এবং চুপ করেই থাকে অনেকক্ষণ। আবার ঘন-ঘন হাওয়ার ঝাপটা জানালার খড়খড়িতে, নীরবতার মাঝখানে তা শোনা যেতে লাগল। আর কথা বলে না মর্জিনা, দর্‌দর্ করে তার দু'গাল বেয়ে ঝরে অশ্রুধারা—সে কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কলিমের একবার ইচ্ছে হল ওকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে, কিন্তু কিছুই করলো না—সে স্থির হয়ে বসে থাকে নির্বাপিত প্রদীপের মতো।

এভাবে আরো কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর কলিমের মুখ থেকে আলগোছে বেরিয়ে এলো, থামলে কেন। বলে যাও।

না, আর বলবো না।

বলবে না মানে?

আমি আর বলতে পারবো না।

মর্জিনা এখন শান্ত, জানালার দিকে চেয়ে ফিস্‌ফিস্ করল, তুমি আমাকে খুন করো।

চন্ করে রক্ত চড়ে মাথায়, হঠাৎ কলিম হাত বাড়িয়ে ওর বাজু ধরে ফেললো, ক্ষিপ্তের মতো বলল, এত সহজে খুন করবো না। তোমাকে বলতে হবে, সব বলতে হবে।

যদি না বলি তুমি কিচ্ছু করতে পারো না। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল মর্জিনা—সে নিরুদ্বেগ, একেবারে নির্বিকার। এরই যেন ব্যাখ্যা করে আরেকটি কথায়, 'আসলে এখানে তোমার জোর খাটাবার কিছু নেই। বলা না বলা আমার ইচ্ছে।

তারপর দু'জনেই চুপ। আবার কানে বাজতে থাকে সমুদ্রের গম্ভীর কলধ্বনি এবং মাঝে মাঝে বাতাসের দাপাদাপি।

দু'জনে যেন এক অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে নিমজ্জিত। এক সময় শোনা গেল মর্জিনার কণ্ঠস্বর, কি আর বলবো। এখানেও একই চিত্র, যে বাড়িতেই যাই আমার দেহের পানে তাকিয়ে থাকে পুরুষ মানুষেরা। এক মাসে চারবাড়ি বদলালাম—দুই বাড়ির কর্তা, আর দুই বাড়ির ছেলেছোকরাদের জ্বালায়। সক্কলেই প্রেমের বিদ্যাসাগর। কত আর সইতে পারি। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত একজনের কাছে ধরা দিতে হল। লোকটা আধবুড়ো, সমাজের অত্যন্ত মানী ব্যক্তি-বাইরে আমাকে মা বলে সম্বোধন করত। সে-ই প্রতি মাসে

টিউশনির মাইরে একশো টাকার ওপরে, গোপনে হাজার টাকা করে দিয়েছে।

মর্জিনা আবার নির্বাক। কিন্তু এখন বেশিক্ষণের জন্য নয়। শুধু কিঞ্চিৎ বিরতি দিয়ে বলল, যে পাপ করেছি তার জন্য কারুর কাছে ক্ষমা আমি চাই না। আর তা বাধ্য হয়ে কিনা, সে বিচারও অবান্তর। তুমি ভালো হয়ে উঠেছ এই আমার সান্ত্বনা। তুমি আমাকে খুন করো। আমি তৈরি।

চাঁদ ডুবে গেছে, এখন শেষ অন্ধকার।

কলঙ্কিনী, ধিক্ নিঃশ্বাস মোর তব কাছে ঋণী। বুকের ভিতর নিঃশব্দ যন্ত্রণার মোচড়, কিন্তু পরিপূর্ণ হতবাক, কলিমের চোখ ছাপিয়ে দর্‌দর্ অশ্রুধারা নেমে এল।

মর্জিনা বলল, কিন্তু ছুরিতে মারলে বিপদে পড়বে। আমি বলি, চল সমুদ্রে যাই, গোসল করার সময় পানির নিচে ডুবিয়ে দেবে আমাকে। পানিতে ডুবে মরলে কেউ কিচ্ছু কইতে পারবে না।

একটি কি দুটি পাখির কলকাকলি, দিগন্তে ভোরের আলোর রেখার দিকে এক ঝাঁক গেল মিলিয়ে। ক্রমে সাগরপাখিরা ওড়ে। সকাল সূর্যের আভায় আন্দোলিত বিশাল দরিয়া। ফেনিল তরঙ্গ বহুদূর থেকে গড়িয়ে এসে ভেঙে পড়ছে প্রবল উচ্ছ্বাসে। বালুকা বেলায় এখানে-ওখানে লোকজন কম নেই। কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর কেউ কেউবা দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। উদ্ভাসিত-অনন্ত পারাবার তবু কোথায় যেন শেষ আছে সমাপ্তি আছে তার। বহুদূরে ঢেউয়ের ওপরে ভাসছে কালো রেখার মতো কয়টি জেলেনৌকা—আশ্চর্য জীবন সংগ্রাম। এই বিপুল জলধিও আয়ত্তে আসে, কখনো কখনো, যখন সে দেয় মুক্তা-ঝিনুক মৎস্য উপহার-কিন্তু তবু তার বৃহৎ পটে রাগদ্বেষ সুখদুঃখ হাসি অশ্রু কত তুচ্ছ। সমুদ্রে মৃত্যু, সুন্দর মৃত্যু।

কোমর-পানি পর্যন্ত কাছে কাছেই ছিল, ঢেউয়ের ঝাপটা খেয়েছে একসঙ্গে।

আরেকটি ঢেউ ছুটে আসছে—উচ্ছ্বসিত প্রবল, দুরন্ত। দূরে থাকতেই প্রাণপণে এগিয়ে মর্জিনা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

তৎক্ষণাৎ কলিমও যায় পিছু পিছু ঝাঁপিয়ে পড়ে—কিন্তু তখন পানির নিচে কিংবা ওপরে, কোথাও তাকে দেখতে পেলো না।

সে হাঁপাতে থাকে, তারপর গলাপানিতে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে চিৎকার করে উঠল, মর্জি-না-!

এমন সময় দুটি হাত ও একখানা মুখ ঠেলে উরুর কাছে, সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিয়ে জাবড়ে ধরে টেনে তুলল। ও সংজ্ঞা হারায়নি, ঢেউয়ের ওপরে মুখ উঠতেই আর্তনাদের মতো উচ্চারণ করল, আহ আমাকে ছেড়ে দা-ও!

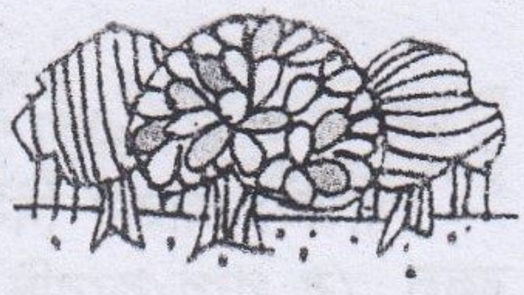
না, মর্জি! তোমাকে ছাড়বো না! বুকের কাছে সজোরে আঁকড়ে ধরে কলিম সৈকতের দিকে আসতে আসতে বলল, সমুদ্রে ডুব দিয়েছি, এবার আমরা নতুন করে বাঁচবো মর্জি, নতুন করে বাঁচবো!

ভ্রমণবিলাসী লোকগুলো, চিৎকার শুনে, জলদি-জলদি এদিক-ওদিক থেকে এসে একজায়গায় জড়ো হয়েছিল, দৃশ্যটি উপভোগ করতে করতে তারা ভাবলো সাগর-সৈকতে এমন কতই ঘটে, একটা তামাশা!

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য হলেও সমুদ্র তাদের ধারণ করেছিল, সে জানে উভয়ের চোখ থেকেই যে অশ্রু ঝরেছে তা'ও লবণাক্ত এবং তা ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে মুছে গিয়ে এই অনন্ত বিপুল জলধারার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশেছে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

টেকনাফ



এই পরিষ্কার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ফুটলে তার ছায়ায় মনে হয় যেন কোনো পাহাড়ী মেয়ে অভিমানে ঠোঁট বেঁকিয়ে রেখেছে এবং খাড়ির ভিতরে সারবেঁধে—জ্বলা কেরায়া-নাও আর ঘাসিনৌকার লাল-লাল আলো তার গলার হার ; কিন্তু নিকষ কালোমেঘে আসমান ছেয়ে গেলে পর সব একাকার ঃ হুঁশিয়ার মাঝিমাল্লারা ছপ্‌ছপ্‌ দাঁড় ফেলে মোহনা থেকে চলে যায় নদীর অনেক ভিতরে, উজানে শক্ত গাছের গুঁড়ি বা পাথরের সঙ্গে কষে বাঁধে গলুই, ধারালো হাওয়ার তোড় থেকে বাঁচবার জন্য লণ্ঠন লুকিয়ে রাখে পাটাতনের তলায়। তখন, নাফের এপার-ওপার গাঁ-গেরামের মধ্যেও একবিন্দু আলোর চিহ্ন দেখা যায় না : সমগ্র পৃথিবীটাকেই কে যেন মুড়িয়ে দিয়ে ঘন তমসার নিশ্ছিদ্র চাদর দিয়ে।

এমন রাত—বৎসরের এক সময় এমন রাত প্রায়ই আসে এবং এমন রাতকে বঙ্গোপসাগরের এই তীরাঞ্চল ও তার কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দারা ভয় করে। ভয় করে এ-জন্য যে, এই কৃষ্ণ যবনিকা যেন মৃত্যুরই পতাকা; কারণ চক্ষের নিমেষে তার আড়াল থেকে বান-তুফান-প্লাবন এসে পানির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের মতো দ্বীপপুঞ্জ ও ভূভাগকে চিরতরে মুছে দিতে পারে। সমুদ্রের করাল মূর্তির কাছে এরা এতই দুর্বল, অসহায়। তারা বিশ্বাস করে মহাপ্রলয় কিংবা রোজকেয়ামতের রাত্রিও কখনো এসব রাতের চেয়ে বিশাল ও ভয়ঙ্কর হবে না।

ছোটবেলা থেকেই কোরবানও তা বিশ্বাস করত ; সেজন্য মউত জিনিশটা তার কাছে এতই স্বাভাবিক লাগে যে, সে এ সম্বন্ধে একদম উদাসীন। কোনো কোনো রাত্রে বিরান দরিয়ার কিনারা দিয়ে সাম্পান বেয়ে যাওয়ার সময় আজরাইলকে দেখেছে ঃ বিরাট বিকট মূর্তি, অনেক আদমীর জান কবচ করে ফিরছিল হয়তো, দেখে একটু কপাল কুঁচকিয়েছে মাত্র ঃ হয়তো কিছুই দেখেনি, তবু এতেই আনন্দ। সাইক্লোনের পরে, তাড়াতাড়ি গিয়ে লাশ উল্টেপাল্টে দেখেছে, পয়সাকড়ি জেওরপত্তর যদি মেলে। তার রুপেয়ার দরকার, বহুৎ রুপেয়ার। রুপেয়া পেলে ইমারত বানাবে না, আমিরী করবে না, বিবি আনবে না—সেই রুপেয়া দিয়ে কিনবে এমন দাওয়াই, যা পায়ের গোছায়, উরুতে কব্জিতে দেবে নৌজোয়ানী, দবজ সিনাটাকে আরো ফাসনা করে তুলবে। সে শুক্তি চায়, নতুন শক্তি। একটু বাড়তি শক্তি, প্রথম এবং শেষবারের মতো একটি কাজ করবে, তাই। তার পরে যা হবার হোক। পীর বদর যদি খায়েশ করেন তাতেও আপত্তি নেই।

অনেক রাত্রে ছইয়ের ধারে বসে একা, মনে-মনে কিরা কাটবার পর সাত বছর কেটে গেছে। তবু, সময়টা যেন সাতদিনের সামিল। পার্থক্য যেটুকু তা শুধু বাইরে, নিজের মধ্যেই ; সেদিন ছিল লুঙিপরা সাদাসিধে ছেলেটি, আর আজ মাথায়—মুখে একরাশ কুচকুচে চুল,ত মাথার চুল মুখে এসে পড়ে আর বাতাস বইলে মুখের চুল মাথার দিকে যায় উড়ে—যেন এক জবরদস্ত প্রাগৈতিহাসিক জন্তু। গোবদা-গাবদা, গাঁজা টানে, গরগরে স্বরে বলে কথা। চোখ গুলুমের মত লাল। সেই কবে নৌকা বেচে দিয়েছিল আবার নৌকা কিনেছে এবং এখন, নৌকাই বাড়ি, নৌকাই ঘর। ➤

সেই কবে নৌকা বেচে পেয়েছিল পাঁচ-কম ষাট টাকা। তা সম্বল করেই বেরিয়ে পড়েছিল। কোমরে বাঁধা খুতির সঙ্গে আরো একটা জিনিশ ছিল, ড্যাগার, দুধারি ছুরি, যা কারুর বুকে আমূল বসিয়ে দিতে পারলে কলজে, প্রবালের মতো রক্তিম, চাক-চাক বেরিয়ে আসে।

দূরের জন্য বেরিয়ে পড়বার আগে কাছের তল্লাটকে তন্ন-তন্ন করে দেখেছে ঃ মহিষখালি, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চর আলেকজান্ডার, যে-সব জায়গায় কোনদিন হয়তো যেত না, সেখানকার খড়োঘরের দাওয়ায় ও বিজন বালুতটে পড়েছে তার পদচিহ্ন। নারকেলের ছায়ায় বালির মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে সূর্যের নিচে ভেঙে ভেঙে পড়া ফেনিল তরঙ্গরাশিকে দেখতে দেখতে একটি প্রশ্নই বারবার বিস্ময়ের মতো জেগেছে ঃ এ কি করে সম্ভব! এ বদমায়েশি, না বেঈমানী?

সে রাতে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে একটা মূর্তিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিল। নাম ধরে ডাকলো। অতি চেনা কণ্ঠস্বর। ইস্‌মাগলার শুকুর মামুদ, শুক্‌কুজ্যা। শুক্‌কুজ্যাকে মোটেই পছন্দ করে না, তুব ধীরে ধীরে সেই শুক্‌কুজ্যারই খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। তার মানে আর কিছু নয়, কড়ি। সারাদিন এপার-ওপার মাকুবাজি করে মেলে মাত্র দেড় কি দুই, আর একরাত শুক্‌কুজ্যার কেরায়া বেয়ে আট দশ টাকা। চেরাই মাল পাচার করার ঝুঁকি অবশ্য আছে, তবে থানা-পুলিশও বাঁ-হাতের বশ এই যা ভরসা।

শুক্‌কুজ্যা ঘরে ঢোকবার সময় বারান্দা থেকে কি একটা আনলো টেনে, বস্তার মধ্যে বড় একটা গাঁটরি। বিড়িপাতা নয়, সুতা নয়, নিশ্চয় কাপড়। এ-জিনিশ ঘরে রাখা বিপজ্জনক। কিন্তু শুক্‌কুজ্যা যখন কইছে সিকের কাছে থুয়ে ছেঁড়া কাঁথায় ঢেকে রাখলেই চলবে, তখন, না করতে পারে না। বিশেষ করে এখন, বলতে গেলে, শুক্‌কুজ্যাই মা-বাপ। হপ্তাভর বান, ঘরে কিছু নেই বুঝে নিজে থেকেই পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছে সে।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি থামলো, এবং তারপরেও কিছুক্ষণ বসলো শুক্‌কুজ্যা। শুক্‌কুজ্যার গাল ভাঙা, চোখ কোটরাগত, কপাল উঁচু, কিন্তু গলার আওয়াজ গাঢ় ও গম্ভীর। হালকা-পাতলা লোকটা হলেও, সোনার বাঁধানো দাঁত বাদ দিয়েও তার মধ্যে রয়েছে একটা চাকচিক্য আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির ছাপ।

শুক্‌কুজ্যার মুখে টাট্টি নেই, যাচ্ছেতাই বলে যখন-তখন, যদিও কথা বলে কম, কিন্তু এখন তার কথাগুলো মোলায়েম, এবং যেন সোডার বোতলের ছিপি খুলে গেছে, এমনি বকর-বকরে মশগুল। ঘরে ঝাপ না থাকার দরুন ময়না আড়ালে যেতে পারেনি ; বহুপরা ময়লা কাপড়ের আঁচল মাথায় টেনে চাটির একধারে বসে আছে চুপচাপ। কথার ফাঁকে শুক্‌কুজ্যা থাকলে একটু দেখলো তাকে, কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

কিন্তু শুক্‌কুজ্যাকে ভুল বোঝা উচিত নয়। এমন সহানুভূতি, এমন দরদ কার? খারাপ হলেও সে যথেষ্ট ভালো।

শুক্‌কুজ্যা বিদায় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাপড় ফেলে জ্যা-মুক্ত তীরের মতো টান হয়ে দাঁড়ালো ময়না। এমনিতেই চঞ্চল, এখন যেন আরেকটু বেশি। কেন হবে না? সারাদিন উপোস।

বুঝতে পারে কোরবান। চালডাল আনবার জন্য মাথলা মাথায় সে দোকানের দিকে গেল।

দোকান থেকে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখে ময়না শুক্‌কুজ্যার গাঁটরিটা খুলে ফেলেছে এবং একটি লালডোরা শাড়ি নিয়ে পরখ করছে কেমন মানায়।

সব্‌বোনা-শ্!

ময়না মুখ বেঁকিয়ে বলল, ইস্।

ভাবটা এই, এখানে অনেক শাড়ি ওর একটিও নেই, তাই একটা নিয়ে পরবে এই তো ঠিক।

কোরবান মানা করে, না—না।

কি সুন্দর শাড়ি! ময়না ময়লা কাপড়টা ছেড়ে দিয়ে পরেই ফেললো শাড়িটা, দ্যাখ তো।

পাতার আগুনে দাউদাউ-জ্বলা উনুনের ধারে বসে কোরবান গুড়ুগুড়ু হুঁকো টানে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে ময়নাকে। বাপের আদুরী। চাষীর মেয়ে তবু দরিয়াকে খালি বাইরেই দেখেছে, পুতুলিতে পোহায়নি কান্নার সায়র। ময়না যেন সত্যি ময়না পাখি, তেরো বছর অবধি ময়নার মতো উড়ে বেরিয়েছে। ময়নার মা কোরবানের মা'র সই, জবান দিয়েছিল, নইলে কি আর পায়? ছোটবেলায় বৌ-বৌ খেলত, এত সাধের ময়নাকে রানীর মতন রাখতে পারে না, আফসোস কম নয়।

আসলে পয়সা বেটি আদপেই ছিনালী, ভালোমানুষী দিয়ে তার মন পাওয়া ভার। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, তেমনি সোজা পথে টাকা পাওয়া যায় না। তার জন্য চাই কায়দা চোরাগুপ্তি—; যে যত বড় ধনী সে তত বড় লুটেরা। এলাকায় ক'জন আছে তাদের কিস্‌সা জানে, ক'দিনেই আঙুল ফুলে কলাগাছ।

শুক্‌কুজ্যারা বুদ্ধিমান, নইলে চুনোপুঁটি হয়েই থাকত, এমন রুই-কাতলা হতে পারত না। এমন উপায় থাকতে গোবরে পোকার মতো দিন গুজরানে লাভ কি।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোয় না, অনেক রাতের শেষে আবার শুনতে পেল চাপা গলায় নিজের নাম। পাইকার সঙ্গে নিয়ে এসেছে শুক্‌কুজ্যা।

ঝাঁপ সরিয়ে গাঁটরিটা ফেরৎ দিতে দিতে কোরবান বলে উঠল, রাখো।

গাঁটরির কাঁচা বাঁধনটা দেখে সব বুঝতে পারে শুক্‌কুজ্যা। মনে মনে খুশিই হয় যেন। ওর হাতটা ধরে ফেলে বলর, থাক্ পরুক।

না—না। দাম?

জবাবে কাঁধে একটা থাপ্পড় মারলো শুক্‌কুজ্যা, তারপর দাঁত বার করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

রাত পোহাতে আরো কিছু দেরি ; ময়নার শরীরে গুটানো পাতলা কাঁথার নিচে নিজের দেহটাকে সাপের মতো ঢুকিয়ে ওর গভীর শ্বাস নিঃশ্বাস শুনতে শুনতে জ্বলে কোরবান। সবার মতো কাপড় নেই ঠিক, তবু এভাবে শাড়ি দেওয়া-নেওয়ারই বা মানেটা কি। ময়নার যেন দাবি। কিসের দাবি? একেই বলে আওরাত। দেখেও দেখতে চায় না, শুনেও চায় না শুনতে ; কিংবা যা বোঝার নয় তা বোঝে ভালো, আর যা বোঝবার তা বুঝতেই চায় না,। আওরাত আজব চীজ, তার কিনারা করা মুশকিল।

বৃষ্টিভেজা হিমেল সকাল, তবু মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে এক কাপড়ে গাঙের ঘাটে গেল ময়না এবং ফিরে এসে, বারান্দায় মাথায় চুল ঝেড়ে পরলো নতুন শাড়িটা। চেনা অঙ্গে

অন্যরূপ। দৃষ্টি ফেরানো যায় না। এক শাড়ির গুণেই ক'দিনের বিষণ্নতা কেটে পরিপূর্ণ সজীব ও সুন্দর।

তার দিকে চেয়ে ঝিম্ ধরে থাকে ; কেমন ভয় পায় কোরবান। এ-যে শরতের কাশবনের হিল্লোল নয়, শ্রাবনের ভরানদীর শিহরণ—যাকে আঁধারের আবরণে লুকিয়ে রাখাই নিরাপদ কারণ দিনের আলোকে সে কুলভাঙায় পারঙ্গমা।

কিন্তু ময়না যে ময়নাপাখি, নতুন শাড়ি পরে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে কি করে? তর সইছে না, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে পাড়াপড়শিনীদের দেখাবার জন্য বেরিয়ে পড়লো।

কে দিল রে? বাপের বাড়ি থেকে পাঠাতে পারে এই অনুমানে শুধায় কেউ কেউ।

কে আবার! ঠোঁটের ফাঁকে একটু মধুর হেসে জবাব করে ময়না, মনিষ্যি।

কিন্তু, নুন আর পোড়া লঙ্কা টিপে পান্তা খাওয়ার পর ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে সোয়িাস্তি ছিল না কোরবানের—এক অদ্ভুত মগ্নতা, এবং দংশন। ওপারে জনপদ এপারে নগর। নদী পার হতে মাথাপিছু মাত্র তিন পাই কেরায়া। খ্যাপের শেষে হাতের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ করে পয়সাগুলো, যেন বিদ্রূপ করে তাকে। ইচ্ছে হয় ছুঁড়ে ফেলে দেয় পানির মধ্যে, খোলামকুচির মতো। এমন ফালতু রুজি। গ্রাম্য দলের সঙ্গে একটি নববধূ, পরনে ঝলমলে পাটের শাড়ি, হাতে বালা, কানে মাকড়ি, গলায় সোনার হার! তাকে শহর দেখতে নিয়ে যাচ্ছে, বায়েস্কোপ, নয় পীরের দরগা। ময়নাকে এমন করে সাজালে আরো অনেক ভালো লাগত। কিন্তু একটিও জেওর নেই ওর। চান্দির চেইন, চান্দির বিছা ছিল, কবে বিক্রি করে দিয়েছে। নৌকা থামিয়ে অন্য সবাইকে ফেলে মেয়েটাকে নিয়ে পালালে হয় না? শুধু জিনিশপত্তর রেখে ছেড়ে দিত। বিকেলে বাড়ি ফেরবার আগে মাছ-তরকারি কিনবার সময় দেখে বড় বড় দোকান, ঘর ভরতি কাপড়-চোপড়, শাড়ি, কামিজ, ওড়না! কাচের ভিতরে কত মিষ্টি, থরে থরে সাজানো। কাছেই রাস্তার দু'পাশে দোতলা তিনতলা দালান। এগুলোর কাছে তার দাম ওই লোম ওঠা কুকুরটার চাইতে বেশি নয়।

বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির কাছাকাছি শুক্‌কুজ্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখেই কলরব করে ওঠে শুক্‌কুজ্যা, কিরে? অত দেরি ক্যা?

রঙ্গে!

কোরবান আর কিছু বললো না, ক্লিষ্টমুখে এগিয়ে চল্‌ল। কাজ দেবার অছিলায় শুক্‌কুজ্যা বাড়ি এসেছিল নিশ্চয়। অনুমানটা সত্যি। তার হাজিরার আলামত, জলচৌকিটা তেমনি আছে, মাটিতে সিগারেটের ছাই। কলজে দর কত।

শুক্‌কুজ্যা যে এসেছিল, দোরে পাড়া দিতেই ময়না বললো তা, এবং কি জন্য এসেছিল তাও জানাতে কসুর করলো না। কিন্তু সে কঠিন হয়তো রসিকতা রার ইচ্ছা ছিল, হালকা মন্তব্যের কাছে গিয়ে থেমে যায় ময়না, বুঝতে পারে খিদের ছায়া নয় চেহারায়। কিন্তু হয়েছেটা কি। হাসি—খুশি আনন্দ, এও কি তার দু'চোখের বিষ? সোজা লোক নিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদ। ময়না চুপ হয়ে গিয়ে চালগুলো ঘটিতে ভরলো, মাছ-তরকারি তুললো কুলায়। তারপর ভাত বেড়ে দেওয়ার আগে মেঝেটা ঝেড়ে সাফ করবার সময় চমকে ওঠে, সে হতভম্ব, কোরবান লাফিয়ে উঠে এসে ওকে ধরলো, ক্ষিপ্তের মত পরনের শাড়িটা টানতে টানতে বলতে থাকে, খুলি ফ্যাল্ খুলি ফ্যাল্। মাইনষের কাপড় তুই পিন্‌বি ক্যা?

আহ্! রাখো!' সজোরে ঝটকা মারে ময়না, কাপড়ের নিচে ওর নিরাবরণ শরীর,

মাইনষের কাপড় পিন্‌বোনা-ন্যাংটা থাকবো নি?

হ, ন্যাংটাই থাকবি।

ইস্ আমার বাহাদুর রে! ইমুন মরদে আবার শাদি করে!

কি কইলি? কোরবান গর্জে উঠে নেকড়ের মতো তেড়ে এসে, ওর মাথার চুল টেনে ধরে কাত করে ফেলে চার হাত-পায়ে মারতে থাকে। কাঁদে না, চিৎকার করে না, নাগিনীর মতো ফোঁস্‌ফোঁস্ করে ময়না, এবং যতটা পারে, বাধা দেয়। মারের পরে ছেড়ে দিলে পড়ে থাকে তেমনি মেঝের ওপর, আলুথালু ছিন্নবসনা। এরপর কাঁদে, শুধু কাঁদে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ভাসিয়ে কাঁদে। অবিরল অশ্রুধারায় গাল, মাটি, চুল একাকার।

এমনিভাবে যে রাত নেমে এসেছিল, ধ্বংসলীলার সমস্ত আয়োজন নিয়েও আজকের রাত সে রাতের তুলনায় কিছু নয়। সে রাত ছিল যন্ত্রণাবিদ্ধ, নারকীয়। কি তীব্র অভিমান ওর! আদর মানলো না, ক্ষমার আর্জিকে দ্বিগুণ জ্বালায় ফিরিয়ে দিল। সে রাত দুঃসহ, দুর্বোধ্যও বটে, কারন, ওকে বুঝতে পারেনি, বর্ষণের পরের স্নিগ্ধতাকে পৌষের প্রশান্তি বলে ভুল করেছিলো। এবং তাইনা এখনো এমন অস্থিরতা, বারে বারে ফিরে ফিরে বিস্মরণ।

নেই, নেই, নেই। কোনো সন্দেহ নেই সবকিছুর মূলে আছে একজন। সে একজন, সে ময়না। একজনই সব। নইলে শুক্‌কুজ্যার মতো পাতি শিয়ালের সাহস হত না।

হিসেবে কোনো ভুলই ছিল না ওদের, কিন্তু হিসেবের বাইরেও তো থাকে অনেক কিছু? তাই এতকাল পরেও, ধরা পড়েছে।

নিজের পরিকল্পনার চিত্রটা ভাবতে নিজে-নিজেই শিউরে ওঠে কোরবান, বৈঠায় জোর মোচড় মারে। অন্ধকারে মোড়া সমুদ্রের দিক থেকে, নদীর অনেক ভিতরে চলে আসতে আসতে ক্রমেই কঠোর সংকল্প, হাতের মুঠি ও পেশীতে যেন তারই পুঞ্জীভূত বেদনা। এই তো বিজলি চমকালো। নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসিতে চিরে চিরে গেল আকাশটা, এবং একটু পরেই, প্রলয়—নির্ঘোষে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসবে ঝড়ের দানব-তার মধ্যে, হ্যাঁ তার মধ্যেই-মানুষের চোখের আড়ালে, একান্ত মনের সুখে হাসেল করবে অনেকদিনের অনেক রাতের মতলবখানা, ঘরে ঢোকবার পর, অতি সন্তর্পণে কাছে গিয়ে, শক্ত করে মুখ বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে আসবে নৌকায়, তারপর ছেড়ে দেবে তা একরোখা ভাটিয়ারি হাওয়ায়। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু নয়। নিখুঁত অপহরণ মাত্র। পরের পর্যায়টাই আসল যখন হালছাড়া নোঙরহীন নৌকা তীরবেগে ছুটে চলেছে আর হারিকেনটা, অনেক বাঁচিয়ে রেখে, পাটাতনের নিচ থেকে ঝকঝকে ধারালো ছুরিটা বার করেছে! ওর চোখের সুমুখে ওরই একেকটা অঙ্গ, কেটে কেটে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করায় কি কুব বেশি পাশবতা? না, না, বিশেষ কিছু না। এই তো হাত যুগল সুন্দর, যা দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরত এবং যা দিয়ে পরে পরপুরুষকে আদর করেছে। এই ঠোঁট যেখানে এঁকে দিত উষ্ণ চুম্বন! এই গলা এই বুক এই পেট এই উরু, এই তো সবটুকু তার যা অন্যকে নগ্ন করে মগ্ন করে দীপ্ত করে বিলিয়ে দিয়েছে। ওহ্‌হো কি অদ্ভুত! এরা ছোটবড়, রক্তাক্ত মাংসখণ্ড মাত্র। লাখো লাখো লকলকে ফণা তুলে জাগা ভুখা দরিয়াকে সে এগুলো বিলিয়ে দেবে আঁজলা ভরে ভরে, আর তীক্ষ্ম উল্লাসে চিৎকার করে উঠবে, আর হাসবে হা হা হা। তারপরে কি? তারপরে, তারপরে,—শান্তি। স্রোতের চক্রে পড়ে লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে যদি হঠাৎ নিমজ্জিত হয়ে তলিয়ে যায় নৌকোটা, তাহলেও খেদ নেই।

ঘন ঘন বিজলি চমক, শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—হাতড়ে হাতড়ে কোরবান বড়গাছের শিকড়ে দড়ি বাঁধলো, পাটাতনে উলটিয়ে মুখ উঁচু করে দেখলো অস্ত্রগুলো। ভালো করে কাছা মারলো! তারপর সেই কাছার ওপরে আঁটিয়ে পরলো কোমরবন্ধ। শিশিটা হাতের তালুতে কাত করে কোষ-কোষ তেল নিয়ে গায়ে মাখে। শরীর পিচ্ছিল ও খানিকটা উষ্ণ রাখতে হবে, তাই এ ব্যবস্থা। চামড়ার খাপে পোরা ড্যাগারটা কোমরে গুঁজল, এবং হাতে তুলে নিল টর্চটা।

ততক্ষণে গাছপালা আন্দোলিত হতে শুরু করেছে, সরবে এসে পড়লো ঝড় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত তোলপাড়। বোঝা গেল এ ঝড় নয়, তুফান, একটানা গতিতে রণিয়ে রণিয়ে ছুটে চলেছে! সবল তার বাঁধন আর প্রবল স্পন্দন। এদিকে ওদিকে, ভয়ার্ত চিৎকার—এবং আজানের ধ্বনি। ও অতিকষ্টে এগিয়ে চলল, যা পায় কাছাকাছি ধরে, টাল সামলে নেয়। আবার চলে। দূরে তো ছিল না? তবু এখন বহু দূরে। একটা ডাল ভেঙে পড়ল কাছেই, কিছুদূরে টিনের কিচিমিচি। বাতাসের বেগ আরো বেড়েছে, কোনোদিক থেকেই শোনা যায় না আর ক্ষীণকণ্ঠের কলরব। প্রলয়ঙ্করী শব্দ প্রবাহের মাঝে অন্য সকল শব্দ হারা, অবিচ্ছিন্ন মুখরতার তলে আবৃত।

আরেকটু এগুতেই কোরবান সতর্ক। শুক্কুজ্যা আজ বাড়ি থাকবে না তা জেনেই এসেছে। তবু সাবধানের মার নেই। আহা, যদি একটি বিড়ি টেনে নিতে পারত! কিন্তু না, এক পলক সময় নষ্ট করলেও চলবে না।

কংক্রিটের খাম্বা লাগানো বড় ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে! কিন্তু উঠানের ধারে যে চালাটা জোর মোচড় খেয়ে উঠেছে একেকবার, তার বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়, তবু শুধু টিনই উড়িয়ে নেবে, না সমূলে সবটুকু তাই প্রশ্ন।

আবার বিজলি চমকের মধ্যে দেখলো চালাঘরের সামনের কপাট জোড়া সশব্দে খুলে গেছে, এবং ঘরের ভিতর থেকে একজন মহিলা কয়েকটি ছেলেমেয়েকে আগলে ধরে নিয়ে আসছে দৌড়ে এদিকেই। দু কাঁখে দুটি শিশু এবং আঁচলে ধরা আরো তিনটি—কোনমতে বারান্দায় এসে উঠল। বারান্দায় একটা লোক, ভাবলো পড়শী কেউ, জোরে জোরে তাড়াতাড়ি বলল, আমার বাচ্চাগুলিনরে বাঁচাও, ভাই। নয়া মাগীর দেমাক কত, বড়ঘরে থাকতে দেবে না। আলো বেশ্যা, এ ঘর তো আমারই আছিল। অখন উরাৎ ভরা আছে রঙ্গ করছস! দাওনা ভাই একটু ধাক্কা!

সারাগায়ে তেলমাখা, মাথায় বাবরি, গালে দাড়ি, এমন বেশে থতমত খেয়ে যায় কোরবান! তবু আর কেউ আশেপাশে নেই জেনে, টিপ দিয়ে টর্চটা জ্বাললো—দেখে চোখমুখ ভাঙা সুতিকাগ্রস্ত একটি স্ত্রীলোক। পরনের জামা-কাপড়ও ময়লা। আধ-ন্যাংটা বাচ্চাগুলো লেপটে আছে শরীরে, জোঁকের মতো।

কার কথা কইতাছ তুমি? টর্চটা নিভিয়ে কোরবান চেঁচিয়ে শুধাল, শুক্কুজ্যা—শুকুর মামুদের বিবি ময়নার কথা?

না, না—আমিই তো ময়না! ওর বলা শেষ হওয়া মাত্র কড়কড় করে একটা বাজ পড়লো, কাছেই এবং বাতাসের সঙ্গে বর্ষণও শুরু হয়ে গেল।

শুনলো কি শুনলো না কোরবান—কিংবা, শুনলেও মনে করলো কানের ভুল, তাই, আবার টর্চটিপে বেশ খানিকটা নুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কি কইলা তুমি?

বজ্রের আওয়াজে থর্‌থর্ করে কাঁপলো মেয়েটি, এবং সেই কাঁপুনি নিয়েই বললো, কই আমারে চিন না বুঝি? আমিই তো ময়না, ময়না-বৌ!

না-না! কোরবান মুহূর্তে স্থির, প্রথম ফিস্‌ফিস্ করে তারপর টর্চের আলোয় মেয়েটির আপাদমস্তক দেখতে দেখতে তির্যকস্বরে বলে উঠলো, অসম্ভব! একদম ঝুট্। তুমি—তুমি ময়না না!

অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। তার টানে এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কিম্ভূত লোকটার দিকে চোখ তুলে ভয়ার্তস্বরে জিজ্ঞেস করে ময়না, তুমি কে? কেডা তুমি?

আমি? আমি কেউ না!

কেউ না মাইনি?

হ্যাঁ, আমি কেউ না!

কেউ না মাইনি? ভূত?

না, না, আমি কেউ না! ময়নার কাঁধে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে কোরবান, ময়না কই আছে কও—নাইলে তোমার গলা টিইপ্যা মারুম্! কও কোথায় ময়না!

এই মুহূর্তে ময়না উপলব্ধি করে এ সেই একজন, আর কেউ নয়। ওর শিরায় শিরায় কেমন একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি। যেন আঁধারের মধ্যে আলো, শঙ্কার বদলে সাহস। লোকটাকে চিনবার চেষ্টা করে এবারে অকম্পস্বরে বললো, আমিই, ময়না!

না, না! মাথার চুলগুলি কাঁটা দিয়ে ওঠে, হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় কোরবান। সত্যি কি মানুষ দেখছে সে? প্রেতিনী নয়তো?

দাঁড়াও! ময়না আবার বলে উঠলো। তেমনি হালে সে এগিয়ে আসতে থাকে তার দিকে।

না, না! শরীরে আগুন ধরা বালকের মতো চিৎকার করে উঠলো কোরবান, তারপর এক ধাক্কায় ময়নাকে ফেলে দিয়ে বারান্দার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লো। এ সময়, ঝটিকার বেগ বলকে বলকে বেড়ে ওঠে, এবং তার মনে হয়, যে স্নায়ুতন্তু এতক্ষণ পেশীগুলোকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল তারা হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে কুঁকড়ে গেছে। সে তাই কাঁপছে, কাকের মতো ভিজে গিয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়িয়ে পিছনে চাইলো না ; এবং পিছনে না চেয়েই দিল ছুট্। পিছন পিছন আসছে না তো সেই মূর্তি? সেই হাতজোড়া, যা প্রসারিত করেছিলো? অথবা তার হাওয়া তারই আকর্ষণ? সে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে উঠলো নৌকায়, নদীটা যেন উথলে উথলে সমুদ্রের দিকে ধাওয়া করেছে। এখানেই কি বসে থাকবে?

না, না। এই ঝড়, এই তুফান যেখানেই নিয়ে যাক নিক, নিক। বাত্যা-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ। তরঙ্গ উত্তাল। শব্দ শব্দ শব্দ। এই শব্দ কার আহ্বান? নৌকোর বাঁধন কুলে দিল, আর তা দুলতে দুলতে ঢেউয়ের ওপর আছাড় খেতে খেতে ধেয়ে চলে দরিয়ায়। কখন হাল ধরেছে বলতে পারবে না। কোথায় চলেছে? এরই নাম মৃত্যু, মৃত্যুর অভিসার? যদি তাই হয়, নদী ছাড়িয়ে সমুদ্রের গভীর গহীন কেন্দ্রমূলে তাকেই করবে আলিঙ্গন।

কিন্তু, সত্যি যখন, মোহনায় এসে আরেক ধাক্কায় টেকনাফ ছাড়িয়ে গেল, তখন তার সমগ্র চেতনা আর্ত রবে উৎক্ষিপ্ত; দুই হাতে বৈঠা চেপে ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে! কিন্তু বৃথা, বৃথা উদ্যোগ। বিক্ষুব্ধ দুরন্ত পাহাড়ের মতো তরঙ্গ এসে ছোট ডিঙিটাকে লুফে নিল।

এবং তার মাঝখানে, অতল গহ্বরে চালান করবার আগে একে নিয়ে খেলতে থাকে। শুধু কিছুক্ষণের জন্য। শরীরের আনাচে-কানাচে বিন্দু বিন্দু হয়ে লুকোনো সমস্ত শক্তি এখন আয়ত্তে, ঠোঁটের তলায় ফেনা ছুটেছে, তবু এই ভয়ঙ্করের কাছে এর ক্ষমতা কত? এ যেন ধৃষ্টতা বেয়াদপি! তা আর সইতে রাজি নয়! তাই হুড় মুড় করে আরেকটা ঢেউ এসে তার প্রবল এক থাবড়ায় উল্টে দিয়ে নৌকাটা। ও বোবা হয়ে গেছে, চিৎকার করবার ভাষা নেই। দম নিতে পারছে না, কে যেন পানির ভিতরে চুবিয়ে ধরেছে মাথাটা! না, বুঝতে পারে, নৌকার গলুই। সেটা ধরে প্রাণপণে ঠেলা দিয়ে ওপরে উঠলো। আহ্ মুক্তি। হাওয়া, বাতাস। বাতাস নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। ফেনার পরে ফেনা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। একবার ডোবে, একবার ভাসে। এরই মাঝখানে যেটুকু সময় তাকেও কাজে লাগায় ঃ গলাটার একটু উঁচু করে চায় দূরে, বহুদূরে—কালো প্রলেপের মতোও দেখা যায় না মাটির পৃথিবী, কি দিগন্ত। কতদূর চলে এসেছে? কাছেই কি সেন্ট মার্টিন অথবা আন্দামান? কিন্তু না, যেখানেই এসে থাকুক সে চিন্তা অবান্তর! মাতাল সাগরে ভর দিয়ে থাকার জন্য চাই কিছু, চাই একটা অবলম্বন। ভাঙা গাছ, তক্তা, বাঁশের চালি। কাছে ভিতে একটা কিছুই নেই? মানুষের লাশ? একটা লাশ পেলেও আঁকড়ে ধরে ভাসতে পারত। না, না থাক। সে যদি তার হয়? কি বিদঘুটে, বিশ্রী। এখানকার হাঙ্গরগুলো সাংঘাতিক, ওদের মুখে গিয়ে না পড়লেই হল। আর ঘূর্ণিস্রোত? তাকেও ভয়, কারণ সে অমোঘ, ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে যাবে অন্য কোথাও নয় একেবারে পাতালে। একি পাজোড়া কোথায়? মনে হয়, করোটি থেকে বিচ্ছিন্ন। তলোয়ার মাছ এসে কেটে নিয়ে গেল নাকি? না, ঠাণ্ডায় অবশ। পিছনে কি একটা আওয়াজ উঠছে না? পর্বত ভেঙেভেঙে পড়ার মতো? চোখ বুজে গায়ের সমস্ত জোরে অন্ধের মতো সাঁতরাতে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো, বর্ষনের শেষ, তুফানও পড়লো। শুধু আকাশের ডাক গুড় গুড়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ। কিন্তু ওটা কি? ঐ যে দূরে? নতুন মেঘের সমাবেশ? তারা তো এত নিচে নেমে আসে না? আবার পাহাড়ের মতো উঁচুও নয়। তাছাড়া একটি দুটি, লাল-লাল, বিন্দু-বিন্দু আলো। না, না, আর ভুল নয়, আর সন্দেহ নয়—সে টেকনাফ, সত্যি টেকনাফ, দরিয়ার নোনা পানির ওপর যেখানে রয়েছে মাটি এবং যেখানে রয়েছে অনেক শিশুর, পুরুষের, নারীর কণ্ঠস্বর, মুখ।

ভাসমান বরফখণ্ডের মতো নিজের মধ্যেই নড়ে নড়ে উঠে কোরবান, অবশ দেহের অভ্যন্তরে একান্তে ধিকিধিকি করে জ্বলে প্রাণের বিন্দুটা সুচের মতো হয়ে, বাড়তে বাড়তে চোখের মণিতে এসে ঠিকরাতে থাকে। টেকনাফ কত দূর আর কতদূর?

অক্টোবর ১৯৬৩

শিউলিঝরা দরোজা



ওই দক্ষিণের দরোজাটা, খুললেই জলজ্যান্ত সে, দাঁড়িয়ে আছে যেন চোখের উপর, মুখের উপর। কে লাগিয়েছিলো, কেউ জানে না ; এবং চোখের আড়ালেই থাকে প্রায় সারাবছর, কিন্তু শীতের মৌসুমে যেন অফুরন্ত। ফুল পাতা বুনো গন্ধ। ওখানেই পড়ার ঘর, ভারি হাওয়ায় ঘিরে রাখে সারারাত, আর রুমি গভীর শ্বাস টানতে টানতে অন্ধকারে রাত জাগে—অবিরাম শিউলিঝরার নীরবতার মধ্যে ডুবে যায় ধীরে ধীরে, নিরিবিলি।

এইটুকু! কিন্তু আরো আছে। এবং তা প্রতিদিনের জটিল নকশা, যার মধ্যে আঁকা হচ্ছে ছবি বিচিত্র রেখায়।

এইখানে, যদিও কিছু দূরের পুরনো শহরটা বাড়ছে—বাড়ছে আকারে আয়তনে বর্ণে এবং অক্লান্ত সরব গতিতে—এইখানে এই গলির শ্যাওলা-পড়া ভাঙা ইটের পাঁচিলঘেরা পুরনো ভাড়িটার ভিতরে সন্ধ্যা নামে নিঃশব্দে, গুটি গুটি পায়ে। জনবিরল অরণ্যের ছায়ায় যে মায়াহরিণী। অন্যের কাছে যাই হোক এ অন্তত রুমির উপমা। এই সন্ধ্যা, যেন একফালি শীতল ঘাস, যার উপরে বসে থাকা চলে একলাই। এবং তখন, নিঃশব্দে একটি ধারা জেগে ওঠে চেতন-অচেতন সত্তায়। যেন সে নতুনভাবে সংলগ্ন হয় অতীতে, বর্তমানে, এবং নেমে আসে ভবিষ্যতেরও একগুচ্ছ ছায়া। চুল ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, পাতায় ছাওয়া ডালে এখনো অজস্র কলি, জমাট বেঁধে আছে। এগুলো ফুটবে, তারপর ঝরবে আরো অনেক রাত ধরে। ঠোঁটের কোণে হাসলো। মনে হচ্ছে কে যেন আসবে কাজ। কে? চেনাই হবে, কেউ। এই সময় নিঃসঙ্গ! কিন্তু এই সময়েই সবচেয়ে বেশি পরিবেষ্টিত। চারটা বাজতে বাবা বেরিয়ে পড়েন। সোয়াচারটার মধ্যে ছোট ভাই দুটো খেলার ময়দানে এবং বড় ভাই তো হিসেবের বাইরে, কারণ তার বাসায় আসা যাওয়া সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কেউ থাকে না। এ সময় তাই নিস্তব্ধ অথচ এ সময়েই যেন ওর কানে, ঘরে বারান্দা প্রাঙ্গণে নিঃশব্দে বাজে নানা কণ্ঠস্বর।

তারও চেয়ে অদ্ভুত সেই পুরনো কামরাটি যেখানে বাবা মা থাকতেন এই সময়ে ওকে টানে সে। সেখানে এখন টিক্‌টিক্ করে চলছে দেয়ালঘড়িটা, নিচে মেহগনি রঙের খাট, যার শিয়রে রিভলভিং শেলফ এবং অন্যান্য আসবাব। আগে যেভাবে ছিলো ঠিক তেমনি আছে। ওয়ারড্রব, সেলাইকল। দেয়ালে টাঙানো যুগলচিত্র। তিন মাস হয়েছে, কিন্তু যেন তিন ঘণ্টা। তেমনি উজ্জ্বল, স্পষ্ট সেই দৃশ্যাবলী। একদিন এমনি সন্ধ্যায় বেরিয়ে মা আর ফিরে আসেননি। এবং রাত ক্রমে বাড়তে থাকলে বাবার অস্থিরতা।

আসলে কাল জিনিশটা, আলেয়া, কিংবা শুধু ধারণামাত্র—নইলে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে ভোরের দিকে গড়িয়ে-যাওয়া সেই রাতকে এত কাছের মনে হত না।

মা—বিছানার নিচে লুকানো বইটা যার ভিতরে গোপন চিঠি আছে, তুলতে গিয়ে রুমি ভাবলো—সাহসী মেয়ে ঃ শুধু ভয়ঙ্কর-প্রকৃতিতে নয়, সাধারণভাবেও—এই সেদিন একেবারে বাড়ির ভেতরে চলে এলেন। ভাগ্যিস বাবা তখন ছিলেন না—নইলে কি যে কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটত একখান। কিন্তু উনি যেন নির্বিকার, সে আরো বিস্ময়। উনি এখন বাবার সেই বিখ্যাত বন্ধু যার ছবি কাগজে ওঠে তাঁর সম্মানিতা বেগম—তবু ভাবখানা যেন জ্যান্ত মানুষগুলো সুদ্ধ এই পুরনো বাড়িটা তারই অনুগ্রহের উপরে টিকে আছে। সব কেমন বিদঘুটে, উদ্ভট।

বাবা এসে যখন শুনলেন, বাঘের মত গর্জন করতে লাগলেন।

কে তাকে ঢুকতে দিয়েছে, হ্যা ; বল্ দেখি, শিগগির বল্। নইলে সব কটারে বার করে দেবো এই বাড়ি থেকে—

কিন্তু কেউ কিছছু বললো না। বুবি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে, রুমি নিরুত্তর।

শিগগির বল নইলে—

অবশেষে রুমিই মুখ খুললো। বললো, কে আবার ঢুকতে দেবে, উনি নিজেই এসেছেন দরোজা ঠেলে।

বাহ্ চমৎকার! উনি নিজেই এসেছেন! রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুখ বিকৃত করে বাবা বললেন, এটা তার নিজের বাড়ি, না? ইচ্ছে করলেই ঢুকে পড়বেন! না, হবে না। এসব চলবে না। আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি গুলী করতাম। হ্যাঁ, গুলী। গুলী করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম।

প্রকৃতপক্ষে তখন গুলী করবার মতো কিছু ছিলো না! কিন্তু এই শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। প্রতিদিন কাগজে গুলীর খবর, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, মৃত্যু। এটাই বোধ হয় কারণ। এই ঘটনার সাত দিনের মধ্যে, এক প্রাক্তন ছাত্র-অফিসারকে ধরে, সত্যি সত্যি পিস্তল কিনে এনেছেন।

তখন থেকে রুমি রীতিমত শংকিত,বিশেষ করে ক্রমে বিকেল হয়ে এলে যখন এই বাড়ির আঙিনায় ছায়া নামে, নিঃশব্দে তখন ওর রক্তের ভিতরে যেন কিসের ধ্বনি ওঠে—ঘরের মধ্যে গেলে স্থির থাকতে পারে না, কেবলই ভয়, মা যিনি এখন বেগম ফয়জুন্নেছা খান, কখন আবার আসেন। বাইরের দরোজায় একটু শব্দ, আর ধড়াস্ করে ওঠে বুকের ভিতরটা—যে কাজই হাতে থাকুক সেদ্রুত বেরিয়ে আসে বারান্দায়। পিস্তল পকেটে নিয়ে বাবার এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র নয় এবং তাকে বাড়ির দিকে যেতে দেখলে, পিছু নেওয়াটাও স্বাভাবিক।

তারপর মুখোমুখি, কথা কাটাকাটি। একটি আকস্মিক, তির্যক আর্তচিৎকার।

এই শঙ্কা, এই ভয় সাময়িক নয়, কিংবা নয় কোনো নির্দিষ্ট ঘটনায় জড়ানো বরং যেন সত্তারই অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে নিগূঢ় নীল প্রবাহের মতো। সারা বাড়িময়, কক্ষে, দেয়ালে দেয়ালে একটি ছায়া অদৃশ্য—যে মাঝে মাঝে শুধু ঠেলাই দেয় না অস্তিত্বের অন্তরালে থেকে চাপ সৃষ্টি করে। নইলে এখন, চিঠি বার করতে গিয়ে এমন করে কাঁপতো না হাত। মায়ের ঘরেই, আধো-অন্ধকার শেলফের এককোণে রেখেছিলো ; কেউ আসে না এইখানে অথচ তবু আতঙ্ক। এই একটিই নয়, বহু চিঠি? দিনের পর দিন বহু পাগলামীর দলিল। সেই ছোট্ট চিরকুট লিখেছিলো, তাও তকে নিরস্ত হবার জন্যে, মিনতি জানিয়ে। ধরেছে উল্টো ফল। থামবার বদলে যেন বাঁধভাঙা নদীর মতো নেমে এসেছে অফুরন্ত স্রোত। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলে চারপাশটা রাতের চেয়েও তিমিরান্তিক মনে হয় ওর, ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে শিরার ভিতরে রক্তধারা। এই একটি চিঠি, বিশেষ মারাত্মক ; ইতোমধ্যে কয়েকবার পড়েছে এবং এখনো, এই সন্ধ্যার আগে দেয়ালের খুপরির আলোকেমেলে ধরলো চোখের সামনে ঃ আমি, কোনো কথা শুনবো না। তুমি তৈরি হও। আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই ; এই কারাগার থেকে তুলে নিয়ে তোমাকে নতুন ভোরের সোনালি সড়কে।

বাবার বিশ্বস্ত ও প্রিয় ছাত্র সেলিম ঃ ইউনিভারসিটিতে চাকরি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু আহ্বানের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়েছে নইলে বাবাকে তো বলাও যেত। দর্শনের লোক তাই বুঝি দর্শনীয় কিছু করবার ইচ্ছে। শেষাংশে আছে, কবে তোমার

সুযোগ হবে আমাকে জানাও। কিছুদিন আমরা থাকবো রাঙামাটিতে,-এবং যাওয়ার আগে চিঠিতে সব জানিয়ে যাবো, কাজেই বিশেষ হৈ চৈ হবে না। তবু যদি কিছু ঘটে তার মোকাবেলা করার মতো শক্তি আমার কাছে। আর দ্বিধা করো না তুমি। আমাকে বাঁচাও।

কিন্তু কি আশ্চর্য! হঠাৎ ফিরে আসে নিজের মধ্যে—এ চিঠি তো সেলিমের নয়—মায়ের ঘরেই খাটের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলো তার প্রেমিকের স্বাক্ষরবিহীন হস্তলিপি, যার মধ্যে আরো অনেক বাঁকাচোরা ঢেউ খেলানো ফেনানো ফাঁপানো কথা, কয়েকবারই ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেছে সংকল্প, কেন সে নিজেই জানে না। এর যেন রয়েছে এক অমোঘ শক্তি, অকাট্য সম্মোহন, যা বাজছে ওরই কানে কানে নিষিদ্ধ রাগিণীর মতো। যদি তাই হতো তাহলে চিলো সত্যি বিপদ, কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যে উদ্দেশ্যেই হোক অত সহজ নয়! নাড়ির বন্ধন যা পরিবারের মধ্যে এমন সুদৃঢ় কি করে তাকে অস্বীকার করা যায়? সে ভাবনার অতীত ; উপরন্তু যতই ব্যাকুল হোক না, পরকে বিশ্বাস কি, প্রয়োজন ফুরোলে পরিত্যাগ এটা অনেক ক্ষেত্রেই তো সাধারণ। সেলিম আজকাল, আগের মতন যখন-তখন দেখা দেয় না, এ ভালোই ঃ যদি চিরতরে বন্ধ করে দেয় আসা যাওযা তাতেই বা দুঃখ কি। না, কোনো দুঃখ থাকবে না। কিন্তু এর সঙ্গে কি মায়ের ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে?

মা চলে যাওয়ার তিনদিন পরের সন্ধ্যা, আসন্ন বর্ষণের কাজলকালো মেঘে আসমান আচ্ছন্ন হয়েছিলো। এমনিতে রক্তচাপের রোগী, বাবা আকস্মিক আঘাতে শয্যাশায়ী। বাইরে থেকে ওষুধ নিয়ে—ভেজানো দরোজা ঠেলে সেলিশ প্রবেশ করলো ওর ছোট্ট কামরায়। সারাক্ষণ শুশ্রুষা করে ক্লান্ত, হাতপা ছড়িয়ে শুয়েছিলো, এলোমেলো ; রুমি আঁতকে উঠলো, হঠাৎ দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে থাকে নীরবে, কাছেই, কারণ চেয়ারে টেবিলে জায়গা কম ; ধুক্‌পুক্ করছে বুকের ভিতরটা, নিজেই কান পেতে শোনে নিজের রক্তের প্রতিধ্বনি।

স্যারের অবস্থা এখন কেমন? শুধালো সেলিম ঘামে ভেজা কপালটা জামার আস্তিনে মুছতে মুছতে।

ভালোই, রুমি বলল, এখন ঘুমোচ্ছেন।

ঠিক আছে। উঠলে ওষুধটার এক ডোজ খাইয়ে দিও। আসি—

কেন একটু বসুন না। এমনিভাবে আর কোনদিন কথা বলেনি রুমি, নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই একটু নতুন ঠেকলো। আরো কাছে এসে দাঁড়ালো সে, প্রায় সামনাসামনি। শিশির-ভেজা গোলাপের মতো মুখখানি তার চাউনির সম্মুখে তুলে আরো বললো, আপনি এসে চলে গেছেন শুনলে বাবা রাগ করবেন। চা দিই?

না, রুমি। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না। ঠিক আছে, আমি বরং রাত্রে আরেকবার এসে স্যারকে দেখে যাবো।

রুমি লক্ষ্য করলো তার চোখের ভিতরে একটি ছায়া যা ঠিক অচেনা নয় ; যে বলিষ্ঠ দৃপ্ত আয়োজন মুহূর্তে ছিনিয়ে নেয় সর্বস্ব তার আভাসও সেখানে অনুপস্থিত। থর্‌থর্ করে যেন কাঁপুনি উঠবে সারা শরীরে, কিন্তু তার আগেই মেঘের গুড় গুড় আওয়াজ মেঝের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কড় কড় একটা বজ্র যদি পড়ত এখন ঠিক ছাদের উপরে কিংবা বারান্দায়, মন্দ ছিলো না। একরাশ ঝড়, অথবা এক পশলা ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। কিন্তু কিছুই হোলো না। সেলিম আস্তে করে বেরিয়ে গেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আবার শুয়ে পড়ে। ক্লান্তি, ক্লান্তি। এই ক্লান্তির যেন শেষ নেই ঃ ভিতরে কোথায় একটি আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছিলো দপ্‌দপ্ করে, সহসা দমকা হাওযায় ফুৎকারে নিভে গেল।

দুঃখ নেই, কারণ এটাই তো সবচাইতে সঙ্গত।

বাবা বোধ হয় কিঞ্চিৎ আঁচ করতে পেরেছিলেন, নইলে রাত্রে আবার দেখতে এলে তার হাত চেপে ধরে এমন কথা বলতে পারতেন না। এমন কথা ঃ বাবা, তোমাকে আমি আমার সব দিয়েছি, আমার জ্ঞান আমার বুদ্ধি। সকল বিদ্যা। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমার ছেলেমেয়েরা যেন তোমার কাছে আশ্রয় পায়।

সেলিম দরদী ছেলে, শিক্ষকের এমন আবেদনে বিগলিত হোলো, বলল, আমাকে অপরাধী করবেন না স্যার। জীবন দিয়েও আপনার স্নেহের দাম দিতে পারবো না। ওদের মতো, আমিও তো মাতৃহারা হয়েছি।

এইবার, জ্বলে উঠলে, দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক, হাত ভর করে বসে বললেন, কে বললে ওদের মা নেই? ওদের মা হবে। আমি আবার বিয়ে করবো। ও মনে করেছে কি? আমি বুড়িয়ে গেছি, না? ভুলে গেছে, মরা হাতিও লাখ টাকা। রুমি, মা, সেলিমকে খাইয়ে দে।

কিন্তু সে ওঠবার নামও করে না এইজন্য যে, সে শত সাধাসাধি করলেও খাবে না সেলিম। তার খিদে নেই এমন নয়, কিংবা হলে ফিরে গিয়ে ভালো খাবে তা-ও নয়, তবু এখানে খাবে না, এই সত্য। এইটে বিশেষ করে বুঝতে পেরেছে সন্ধ্যায় যখন চা খেতে অসম্মতি জানিয়েছিলো। তবু বাবাকে খুশি করবার জন্য, বিষণ্ন করুণ চিবুকটা তুলে শুধালো, খাবেন কিছু? দেবো?

খাবেন মানে? নিশ্চয় খাবে। সেলিম জবাব দেবার আগেই বললেন, ছেলেমানুষ যখন-তখন খাবে। দে, শিগগির।

স্নেহের এই বৈশিষ্ট্য, সে অন্ধ, সে জোর করে চাপিয়ে দেয় অনেক কিছু যাতে স্বাধীনতা বিপদে পড়ে। অনিচ্ছুক সেলিমকে খাওয়াতে গিয়ে রুমি ভাবলে এই বাড়িতে যে বিরাট ছন্দপতন ঘটছে তার আঘাত থেকে কেউ বাদ পড়েনি ঃ কিন্তু কার বেদনা কোথায় কতটুকু তা অনির্ণেয়। বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে গিয়ে শুয়েছিলো সোয়া বারোটার দিকে, কিন্তু প্রায় সারারাতই ঘুমুলো না ঃ এ এক অদ্ভুত মত্ততা যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। একুশ বছর ঘর সংসার করেছেন অথচ কত সহজভাবে ছেড়ে গেলেন। এ মৃত্যু না জন্মান্তর? এতকাল পরে আবার কি নতুন সার্থকতার অন্বেষণ? অনেক প্রাপ্তি, তবু কামনার শেষ নেই, এটা অবশ্য সত্য ; কিন্তু আত্মত্যাগেই তো মহত্ত্ব? এই সন্তান সন্ততি, তাদের মুখ চেয়েও তিনি নিবৃত্ত হতে পারলেন না? এরই নাম বুঝি প্রেম? অপরিণামদর্শী, স্বার্থপর, অবিবেচক? একদিন তাই পুরনো বাড়ির ভিতরে সন্ধ্যা নেমে এসেছিলো, আরো নিঃশব্দে, আরো চুপি চুপি। অন্যেরা তো ছিলোই না, সে নিজেও যখন কলেজের অনুষ্ঠান শেষে ফেরে তখন দিনের আলো নিভছে। গেট ভিতর থেকে বন্ধ, বেশ কিছুক্ষণ জোরে খট্‌খট্ করলেও কারুর সাড়া নেই, অবশেষে যে খুললো সে বুবি। ওর গালজোড়া পানির জোয়ার। প্রথমটায় তাজ্জব হয়েছিল কারণ বুবি মাটির পুতুল, সাত চড়েওরা করে না অথচ এখন অমন করে কাঁদছে! কি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু সেই সুযোগ দিল না। ওকে টেনে নিয়ে এলো, রান্নাঘরে। এতক্ষণ নজরে পড়েছে, ডান হাতের একটা আঙুল কেটে গেছে ওর, রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এ কি করে হোলো রে?

ধারালো বটি দিয়ে রাতের জন্য লাউ কুটছিলো বুবি কিন্তু সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে ওদিকের বারান্দার প্রথম দরোজাটি দেখিয়ে বললো, আম্মার ঘরে—

বল্‌না।

সেই ভদ্রলোক।

ও।

উনারা অনেকক্ষণ আছেন।

বেশ তো। বাইরে বললেও, ভিতরে রুমি বিব্রত ঃ সমস্ত টুকরো ঘটনা, দিনরাত্রি, সকাল-বিকেল, নিঃশেষে বিজড়িত, মূর্ত। কিন্তু কোনক্রমে এতটা গড়াবে ভাবতেও পারেনি, যদিও ইনি প্রায়ই আসেন, বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গল্প-গুজবে মত্ত থাকেন। এবং কিছুক্ষণ পর-পর, করে ওঠেন উচ্চহাস্য। এই হাসি এতই পরিচিত, যেন এই বাড়ির ইট-কাঠ-লোহার মতোই অবিচ্ছেদ্য। রিটায়ার করার পর পলিটিক্সে এসেছেন এবং খেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভেজানো দরোজার দিকে আরেকবার তাকাতে ওর শরীরের ভিতরে কি একটা শির্‌শির্‌ করে গেল, সরুসুতোর সাপের মতো; ঝিম্‌ঝিম্‌ করে মাথা এবং ঝাপসা চোখজোড়া। আড়ালে গিয়ে, রুমি একটা পিঁড়িতে বসে পড়লো।

এককাপ চা দে আমাকে বুবি।

আর কিছু খাবেন না? জিগগেস করলে ঃ সে, ঠাণ্ডা কেটলিটা উনুনে চাপিয়ে দিয়ে।

না। রুমি জবাব দিলো, এবং কলমটা দিয়ে মাটি খোঁচাতে থাকে আনমনা।

নীরব বাড়িটা ; ওরা দুটি মেয়ে। এগিয়ে যায়নি সেই বারান্দার দিকে যেখানে একটি ঘরের ভেজানো দরোজা—যায়নি, কারণ যাওয়াটা নিরর্থক। কিচেনেই থাকে ওরা, চুপচাপ। একজন কেবল টুকিটাকি কাজে নিয়োজিত। সম্মুখ-দরোজা দিয়ে কখন উনি বেরিয়ে গেলেন জানলো না।

মা, এখন বারান্দায়, সন্ধ্যার বাতি জ্বলবার কিছুক্ষণ পরে, সংক্ষিপ্ত প্রসাধন সেরে। অবিচলিত, এবং যেন আত্মস্থও।

বুবি! রুমি ফিরেছে? ডেকে জিগগেস করলেন স্বাভাবিক স্বরে, যেন এমন কিছু ঘটেনি যা অন্যরকম।

এটাই বিস্ময়কর : সেদিনও যখন এসেছিলেন কাপড়চোপড়ে অলঙ্কারে প্রায় আগেরই মতো, কেবল দামে একটু বেড়েছে এবং এই বিয়াল্লিশেও গত ক'মাসে, বয়েস কমতির দিকে। তেমনি বেপরোয়া, নিরুদ্বেগ। গাড়ি বড়ো রাস্তায় গাছের নিচে পার্ক করিয়েছেন, এবং অন্য কেউ তো নেইই, ড্রাইভারকেও সঙ্গে আনেননি। মায়ের সম্পর্কে যখন ভাবনা ভিড় করে আসে তখন এইখানেই খেই হারিয়ে ফেলে! খুঁজে পায় না কূল-কিনারা। মানুষ কেমন করে এমন হৃদয়হীন হয় তা বুদ্ধিরও অগম্য।

বাড়িতে প্রবেশ করবার পর কারুর আপ্যায়নের জন্য অপেক্ষা করেননি, অল্পক্ষণের মধ্যে পরিচিত ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন ; এরপর বারান্দায় এসে, পানের পিক্‌ ফেলে ডাকলেন, বুবি! ও বুবি! কোথায় গেলি তোরা?

আওয়াজ শুনে নিজের কামরার কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখে রুমি, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বুবি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

ওকে দেখেই বলতে লাগলেন, এ বাড়িতে মানুষ থাকে না জানোয়ার সব? তোরা কি করিস, হ্যা? খাওয়া আর ঘুমোনো, এই সার, না? ছি ছি! সব জঙ্গল হয়ে আছে। এই ভূতি, মুখে রা নেই কেন? রুমি কোথায়?

মুখ নিচু করে বললো বুবি, আমি জানি না।

আহাহা কি ঢংয়ের কথা, জানি না। তুই জানিস না তো জানবে কে? ইডিয়েট?

চোখা চোখা, এমনি ধারালো সব মন্তব্য তিনি করলেন, অনর্গল, অবলীলাক্রমে ; ছেলেদের কথা শুধালেন এবং জবাব না পেয়ে বকাবকি করলেন খানিকক্ষণ তাদের উচ্ছৃংখলতার জন্য। রুমিকে খুঁজে বার করলেন যখন ওর নিজের কামরায় তখন কান্নায় ওর

গাল ভেসে যাচ্ছে। ওকেও তিরস্কার করলেন, বিশেষত শরীরের যত্ন নেয় না বলে, এবং পরিশেষে, ভ্যানিটি ব্যাগটা কনুইয়ের কাছে হাতে ঝুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আজ সময় নেই। অন্যদিন, আসবো, তখন যেন এমন নোংরা না দেখি!

সেই অন্যদিনের জন্যই ভয়, বরং বলা যায়, আতঙ্ক, কারণ বাবা অনর্থ ঘটাতে পারেন।

এমনো তো হতে পারে যে, আজই আসবেন? ভাবতে ভাবতে রুমি খালি পায়ে ঘাসের ওপরে গেল, আশেপাশে কিছু মরশুমি ফুল।

এই ভাবনাটা অকারণ নয় ; অতীতে অনেকবার দেখেছে যখনই কাউকে মনে করেছে আসছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ হয়েছে প্রত্যাশা। এ অলৌকিক কিছু নয়, তবু যেন এর মধ্যে কি এক রহস্য আছে লুকানো।

মনে হচ্ছে তিনি আসতে পারেন ; কিন্তু মুশকিল বাবা যে বলে গেছেন বেশি দূরে যাবেন না এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই আসবেন ফিরে?

ঘাসের ওপরে সে হেঁটে বেড়ায় নিঃশব্দে, এবং আশ্চর্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই গেটের কাছে চেনাহাঁটার শব্দ ঃ মা শান্তভাবে বাসার ভিতরে ঢুকলেন, অন্যদিনের মতোই ; কেবল আজকের ব্যতিক্রম, হাতে ধরা বড়ো একটি প্যাকেট।

যদিও ভেবেছিলো নিজের কামরায় গিয়ে খিল এঁটে দেবে কিন্তু সে নড়তে পারে না একটুও, ঘাসের ওপরে দাঁড়িয়েই ফ্যালফ্যাল করে তাকায় তার দিকে। সারামুখ নিমেষে শাদা, বিবর্ণ হয়ে গেল।

কিরে, আর কেউ নেই বাসায়? বললেন, কাছে এসে আর তক্ষুণি ঝর্‌ঝর্‌ করে দুইচোখের পানি ছেড়ে দিলো রুমি ; তিনি ডানহাতটা ওর মাথায় বুলোতে লাগলেন এবং বললেন, ছিঃ অমন করতে নেই; তুই না বড় হয়েছিস? এই দ্যাখ্‌ একটা শাড়ি এনেছি তোর জন্য, আর একটা হাতঘড়ি। ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হবি, ভালোমত যাওয়া দরকার, আর শোন্‌ এই জামাগুলো মন্টু পিন্টুকে দিস্‌। লক্ষ্মী মেয়ে, কথা বল্‌।

না, না। রোদনভরা গলায় কোনরকম উচ্চারণ করলো, তারপর জিনিশগুলো দুই হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল ঘরের ভেতরে।

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বেগম ফয়জুন্নেসা খান ; কিন্তু কিছুক্ষণ মাত্র। প্যাকেটগুলো তুলে নিয়ে ভিতরে এলেন, মাঝের কামরায়, যেখানে দুই দেয়ালের সঙ্গে লাগানো দুটি মুক্ত চৌকি, ছেলেপুলেরা থাকে। আজ যেন অন্যদিকে বিশেষ খেয়াল নেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে একনজর দেখলেন শুধু বাড়ির ভিতরটা, কিন্তু বুবিকে ডাকলেন না। এগিয়ে গিয়ে দরোজা ঠেলে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন যেখানে থাকতেন একদা।

সাক্ষাতের ধাক্কায় মনে ছিলো না, হঠাৎ খেয়াল হল, আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে রুমি, তারপর দ্রুতপায়ে হেঁটে এলো। কপাটের কাছে ওকে দেখতে পেয়েই উনি বললেন, এই যে রুমি। আচ্ছা বলি, তোরা লেখাপড়া শিখেছিস্‌ কি জন্য? বাপ্‌টার একটু যত্ন নিতে পারিস্‌ না? ঘরটা জঙ্গল হয়ে আছে। এই ট্রাঙ্কে দুইজোড়া বিছানাচাদর ছিল, খুললেই পারতিস্‌?

কিন্তু এতকথা শোনবার সময় ছিলো না, দুই পায়ে রীতিমত কাঁপুনি উঠেছে, রুমি প্রায় বিকারগ্রস্তের মতো বললো, মা আপনি জলদি চলে যান। বাবা পিস্তল কিনেছেন!

কি বলছিস্‌? নিজের বিছানা-চাদরটা পরিপাটি করতে করতে উনি ফিরে তাকালেন।

এইবারে জোরে জোরে বললো রুমি, বাবা পিস্তল কিনেছেন। আপনাকে দেখলেই গুলী করবেন। জলদি চলে যান!

উনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে জ্বলে উঠলো চোখজোড়া ঃ যেন আগুন

ঠিকরে পড়তে লাগল। চিবিয়ে বললেন, পিস্তল কিনেছেন! বেশ লায়েক হয়েছে দেখছি। কিন্তু অত সোজা না। এই দ্যাখ্, আমিও পিস্তল এনেছি।

কাছে ফেলে-রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে দেখালেন মেয়েকে গুলীভরা চক্‌চকে কালো আগ্নেয়াস্ত্র।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবার উচ্চারণ করলেন, ইডিয়েট!

এখন রাত। বাতি নিভিয়ে দিলো রুমি, এবং বাতি নিভিয়ে দিলে অন্ধকার। ও ঘরে ভাইয়েরা হৈ চৈ করছে, আরও, এখানে-ওখানে বিচিত্রধ্বনি। কিন্তু সকল ধ্বনির যেখানে শেষ সেখানে সব শান্ত, সেখানেই সুখ। সেজন্যই, বাবার ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলো, নিঃশব্দে, যদিও বাইরের আভায় আবছা ঘরে ছায়ামূর্তির মতো নড়েচড়ে উনি বলছিলেন, আপনমনে, অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মতো—আমি ঠিক বুঝেছি এ তোর মায়ের কীর্তি। এমন সুন্দর করে বিছানা আর কেউ পাততে পারে না। আমারই দোষ। ভালো না লাগলে চলে যাও কে তোমাকে চায়—আমিই বলেছিলাম। এত অভিমান, চলেই গেল।

রুমি নীরব, বুঝতে পারলো, উনি কাঁদছেন এবং কান্না থামাতে থামাতে বলছেন, চলে গেছে, তবু এখন কাঁধে কেন? আমার বালিশটা ভিজিয়ে রেখে গেছে।

অসহ্য, অসহ্য! রুমি সেই পরিচিত বইটা, যার ভিতরে অনেক চিঠি আছে, আস্তে করে টেনে নিলো, এবং বলল, আসি বাবা।

কিন্তু বলেনি কিছুই, বাবার কথাগুলো অসহ্য গলায় অনুমতি না নিয়েই পিছন ফিরে পা বাড়িয়েছিলো বারান্দার দিকে।

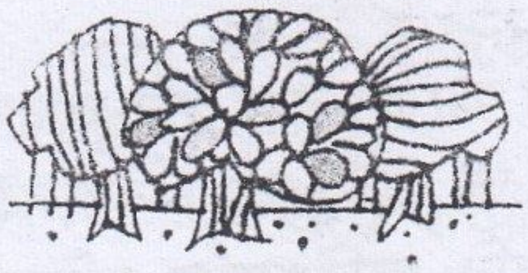
ঢং ঢং ঢং, ক'টা বাজলো? লক্ষ্য করেনি, জানতেও চায় না। ও ঘরে অনেক কণ্ঠস্বর তার মধ্যে একটি, ভারি গম্ভীর ধরনের। সেলিম এসেছে বুঝি? আসুক, আসুক না। ডাকলেও সে আর কাছে যাবে না।

উসকো চুল আলুথালু বেশ ঃ চিঠিগুলো মুঠো করে ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলে এলো রান্নাঘরে, পাতিল ঘিরে দাউদাউ জ্বলছে লাকড়ির উনুন। বুবি একটু সরে গেল। উনুনের সামনে বসে একটি একটি করে চিঠি আগুনের ভিতরে ফেলে রুমি, আগুনের ভিতরে সেগুলো আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে! এবং আগুনের আভায় স্থির ওর চোখজোড়া থেকে টপ্‌টপ্ করে ঝরে অশ্রু যাকে আগুনের রঙে মনে হয় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

ঘরের পিছনে টিপ্‌টিপ্, ঝিপ্‌ঝিপ্ পোকামাকড়ের ধ্বনি, এবং এখন বকুল ঝরছে না? অন্ধকার, নিজের কামরায়, একলা, স্থির তাকিয়ে আছে বিছানায় উপুড় হয়ে, গায়ের উপরে অর্ধেকটা জুড়ে নরম লেপ। নিঝ্‌ঝুম চারদিক। আস্তে আস্তে হাত ভর করে উঠলো। সাবধানে, পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে, প্রথম, বাইরে তাকায় জানালাটা একটু ফাঁক করে তারপর খিল খোলে দরোজার। দাঁড়িয়ে আছে তেমনি শিউলিগাছ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতা, অজস্র ফুল। টুপ্‌টুপ্ ঝরছে। এই ফুল ফোটানো, ফুল ঝরানোই বুঝি ওর চরিত্র? কোমল খালি পায়ে নেমে গেলো ঝরাফুল কুড়াবে বলে প্রতিভোরের মতো, কিন্তু ওখানে গিয়ে বসে রাশি রাশি ঝরাফুলের মাঝে, এবং তারপর হঠাৎ কি মনে করে শুয়ে পড়ে, ফুলের গন্ধে ভরপুর। স্বপ্ন দেখছে? ঘুমোচ্ছে সে কি? না ঝরাফুলের মাঝে ঝরাফুল হয়ে আছে!

আবিষ্ট নয়নে চেয়ে দেখে হালকা হাওয়ার চাপে খুলে ফেলে আসা দরোজাটি বন্ধ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে।

নভেম্বর, ১৯৬৬।



রূপান্তর

প্লিজ ডক্টর। এই শব্দাবলী আবার ঠোঁট থেকে সদ্য বেরুলো ফিরেও তাকালেন না ডাক্তার করিম, শেষ ব্যান্ডেজটা আঁটো করে দিলেন। তেমনি নিমগ্ন এবং নির্বিকার। আবোল-তাবোল রোগীর স্বভাব, হতে পারে ত এটুকু চিনি। কিন্তু আগেও স্থির, ডীম করে জ্বালানো হ্যারিকেনের আলোয় ঘামেভেজা থলথলে মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, দৃঢ়স্বরে, আমার জামাটা খুলবেন না।

খুলবো না?

জ্বি না, স্যার।

কেন, ব্যাপার কি! এবার সত্যই বিস্ময়ের ছায়া তাঁর চেহারায়। যেন উপলব্ধি করলেও জিনিসটা অহেতুক খ্যাপানো নয় ; বললেন, এ তো রক্তাক্ত জামা!

স্যার। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, আমার মা দেখবেন।

দেখবেন? তোমার মা? চোখজোড়া তাঁর কপালে ওঠবার শামিল, কিন্তু হঠাৎ কাছেই আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দ ; কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠে যন্ত্রপাতি ব্যাগের ভিতরে ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করলেন। 'ইট্স্ ননসেন্স্। শিগ্গির বেরিয়ে যাও। ঠিকানাটা ওরা এখনো জানতে পারেনি বলা যায় না। আই ডিপার্ট! উইস উই গুডলাক। নিখুঁত চাতুর্য ; রিকশাওয়ালার বেশ নিতে দু'মিনিটের বেশি সময় লাগলো না এবং সবুজ চাদরে ফারুক আমার গলা ইস্তক ঢেকে দিলে আমি সোজা হয়ে বসবার আগেই শুনি বাইরে ক্রিং ক্রিং দ্রুত মিলিয়ে গেল।

দু'জন ছদ্মবেশী ও সশস্ত্র মুক্তিফৌজ যাচ্ছে। লন্ডনের এফারসিয়েস; বাঘা চিকিৎসক: মেডিক্যাল কলেজের সার্জারির স্তম্ভ ; স্বাধীনতার জন্য তার এই রূপান্তর আদর্শস্থানীয় বৈকি! আজকেও, আরও অনেক জায়গায় যাবেন নিশ্চয়ই; শহরে কিলবিল বিচ্ছুর আনাগোনা।

গোয়েন্দা বিভাগকে অত্যন্ত তৎপর করে তুলেছে তবু আমরা জনবহুল রাস্তাকেই বেছে নিয়েছিলাম অপারেশনের স্থান হিসেবে। গেরিলা টেকনিক। যেন ওস্তাদের মার ; হতচকিত শত্রুর গুলি তবু লাগলো। জখম নিয়েই ; দৌড়ে অন্ধকার গলির মুখে এসে না পড়লে ধরা পড়তে হোত নির্ঘাত। এবং তার মানে শুধু মৃত্যু নয়, পাশবিক নির্যাতন। মৃত্যুকে ভয় নেই কিন্তু চোখ উপড়ে ফেলে চামড়া তুলে এই যে তিলে তিলে অত্যাচার তা অসহ্য। এরা কি মানুষ? মানুষতো নয়ই, পশুও নয়, কারণ পশুও তার পাশবতার উপরে উঠতে পারে না। বাঘ যখন শিকার ধরে নিমেষেই করে তাকে ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নভিন্ন ; আর এরা মানুষ মারে কিন্তু একবারে মারে না।

কিন্তু ওরা জুলুমের যত পন্থাই আবিষ্কার করুক সব তুচ্ছ ; হৃৎপিণ্ডের ধ্বনির মতো আমরা প্রতিমুহূর্তে গুনছি এক নাম, স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য যে-কোন মূল্য দিতে আমরা মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেকটি তরুণ প্রস্তুত। পতঙ্গের পাখা উঠেছে। হয়তো মরবারই জন্য।

টররর টররর, কাছেই এবার এলেমজির শব্দ। চমকে উঠে শুধোলাম, গাড়ি আসতে আর কত দেরি?

এইতো তারেক বললো, সাড়ে ন'টার মধ্যে অবশ্য আসবেই। এখনো তেরো মিনিট বাকি।

ওরা ঘুমিয়ে পড়লে মুশকিল হবে।

জানি অনাবশ্যক মন্তব্য।

কারণ বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও মা সজাগ থাকেন, কেন থাকেন তার সব কারণ আমি জানি না। তবে তার সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে নানা বাঁকাস্রোত তা একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট। আমাকে সেদিন, যদিও ঝকঝকে দুপুরে, চিনতেই পারেননি, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর আরো কাছে এসে কিছুক্ষণ স্থির। ধীরে ধীরে একটা স্বস্তি ও প্রশান্তির আলো ফুটে উঠলো তাঁর চেহারায়, এরপরে আশ্চর্য স্মিতহাস্য। আমাকে আগলে ধরে কোমলস্বরে বললেন, জয়, সত্যি তুই?

ভালো করে দ্যাখো, আমিই তো।

নাহ্, মনে হয় অন্য কোনো ছেলে।

বেশ, তাই যদি হয় ক্ষতি কি? রুমালে মুখের ঘাম মুছে বললাম, আমাকে তোমার মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়াই ভালো।

আমি তোকে ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু। আবার হাসলেন মা, এবার পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ মধুর হাসি। বললেন, এত ভেবে লাভ কি? জানিস, বাকুল ধরা পড়েছিলো। ওকে নাকি ঘাড় ভেঙে মেরেছে। যাক গে, আচ্ছা তুই এমন কালো হলি কি করে? সত্যি তাজ্জব।

কেমন করে বোঝাবো এটাই স্বাভাবিক। বললাম, তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম বোধ হয় তারই জন্যে।

রহস্য নয়, এই আমাদের প্রথম দীর্ঘ বিচ্ছেদ। দুই বোন তিন ভাই এবং বাবা, সবাই আমার প্রিয় ঃ কিন্তু মায়ের প্রসারিত চাউনির সীমানা থেকে বেরিয়ে গেলাম একদিন, অথচ মা আয়ত চোখজোড়া মেলে তাকিয়েছিলেন এটা আমার কাছে ; এখনো দুর্বোধ্য। এটা কি নিষ্ঠুরতা? ভালোবাসা এই?

কিটব্যাগটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়ি মাড়াবার সময় চিক্‌চিক্ পানি জমেছিলো চোখের কোণে, তুমিই আমার জন্মদাত্রী জননী? নিরীহ আদমী, বাবা ; ঠিক তারিখেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। একসেকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রকৃতপক্ষে জনগণের সেবক, তা সে যে প্রশাসন ব্যবস্থাই আসুক না ; কাজেই সামরিক কালোখাতায় আমাদের এই বাড়ি চিহ্নিত ছিলো না।

তবু মা'র। রীতিমত পীড়াপীড়ি। মাঝে মাঝেই বলে উঠছিলেন, যেন স্বগতোক্তি ঃ হাজার হাজার লোক যাচ্ছে গ্রামে, তুইও যা জয়। তোর ছোট মামারা তো গেছেন, ভালো কাটবে সময়।

কিন্তু তোমরা?

থাকবো এখানেই। কিঞ্চিৎ চিন্তিত, কিন্তু দ্বিধামুক্ত, বললেন, দেখা যাক কি হয়।

সবাই থাকছে, অথচ আমাকে যেতে হলো, চলতে চলতে আমার ভিতরে একটা অভিমান দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। বেশ, আমিও নেবো এর প্রতিশোধ। গ্রাম থেকে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো, জানাবো না।

লিখবো না চিঠি। আমি অবহেলার যোগ্য?

তৈরি হয়েই ছিলাম প্রথম সুযোগেই।

পথে পা বাড়াই ; পাশের বাড়ির সরওয়ার এবং আরো এগারোটি ছেলে যাচ্ছে আগরতলা ট্রেনিং নেয়ার জন্য। নানির পাছড়াপাছড়ি, মামাদের তিরস্কার, কিছুতেই দমলাম না ঃ ওরা হাল ছেড়ে দিলো এবং সকালে বাড়ির সামনে আমগাছতলায় ভিড় করে দাঁড়ালো যখন আমরা দল বেঁধে বেরুলাম।

মাত্র একটা সার্ট, একটা লুঙি ঃ পকেটে ছাপান্ন টাকা ; ছায়াঢাকা আঁকাবাঁকা সড়ক

বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন আলগী পৌঁছি, তখন প্রায় সন্ধ্যে। মেঘনা নদী, ঘাটে অজস্র নৌকো।

সূর্য অস্তে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে ছ'টা নৌকো ছাড়লো শরণার্থী বোঝাই করে, যাদের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংগ্রামী তরুণেরা ; দেখা যাচ্ছে বৃহদাকার ব্রীজ, এবং আশুগঞ্জ, পূর্বাঞ্চলের শক্তিশালী মিলিটারী ঘাঁটি। আমরা ঘাড় নিচু, জড়াজড়ি করে বসে আছি ; বুকের ভিতরটা ঢিব্‌ঢিব্ করে, বুঝি অকারণ। আরেকটু এগুলে লালপুর, যেখানে মাঝিরা গাঙ ছেড়ে পাটক্ষেতের কাছ দিয়ে চলতে লাগলো যার অর্থ গোলাগুলি শুরু হোলে আত্মরক্ষার সুযোগ লাভ।

লালপুরে আরেক গাঁটি, তার পাশে কাটিয়ে রসুলপুর যখন, তখন রাত দশটা ; এখানে আরো উঠলে শরণার্থী, গাদাগাদি গাঁটরি-বোচকা ; কেউ কেউ কাঁদছে, যারা রয়ে গেলো পেছনে কান্নায় বলছে বিদায়, এবং বুড়ো একজন হাউমাউ শব্দে দোয়া করছিলো।

রসুলপুর ছেড়ে রাত দু'টোয় শিবনগর। আলগীতে কিছু মুখে দিয়েছিলাম তারপর একটানা এত পথ, উদ্বিগ্ন যাত্রা ; কিন্তু এখানে একটু সচেতন হোতেই টের পাই খিদেয় কণ্ঠরোধ হওয়ার জোগাড়।

চিড়েমুড়ির পুটুলি বার করলো সরওয়ার, আমার সামনে মেলে ধরলো। মনে মনে হাসি। ধনী বাপ-মায়ের আদুরে দুলাল, অজস্র খাদ্য ও বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে, আজ তার এই দশা। মায়ের আমার দুধে আলতা রং এবং সে রং পেয়েছি আমিও, যা এই চাপা উত্তেজনার একটানা স্রোতে ফিকে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু এসব তুচ্ছ ; প্রত্যেকে জ্বলছি আমরা একাগ্র শিকার মতো—একমাত্র লক্ষ্য সীমান্ত, গন্তব্য ওপার। এখানে থেকে সিয়েনবি রোড দেখা যায়, যা পেরিয়ে যেতে পারলে বিপদমুক্ত। ওখানে একটা পুল ; পাহারা দেয় ছাব্বিশটি রাজাকার এবং কিছু পাঞ্জাবী। পরদিন বিকেল চারটায় নৌকা এলো নিমবাড়ি নিমবাড়ি প্রসিদ্ধ জায়গা, শরণার্থী অবস্থান শিবির ঃ গিস্‌গিস্ করছে, দুই বাড়িতে শ'আটেক লোক। প্রায় সবাই নির্ঘুম। ক্ষুধার্ত, অস্থির। সাদাসিদে মাঝিরা, বিপদের ঝুঁকি নিতে চায় না ; দালাল পোড়া সিগারেটটা ফেরে বললো এখন পার করানো মুশকিল, এদিকে পাঞ্জাবীরা বাঙ্কার করছে। তিনদিন পরে আবার যাত্রা শুরু, পুলের কাছে রাজাকাররা ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিলে, আমরা এগিয়ে যাই তাড়াতাড়ি পুলের নিচ দিয়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এমন এক স্থানে পৌঁছি যেখানে চতুর্দিকেপানি ; কিন্তু কাছাকাছি, কচুরিপানা ঠাসা ঃ রাস্তা পেলাম অনেক কষ্টে। এখান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া এমন কি আগরতলার বৈদ্যুতিক আলোও দৃষ্টিগোচর। ঘাঁটির চিহ্ন সন্ধানি বাতি। একটু সামনে রেললাইন, সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর স্থান। কারণ এখানে প্রায়ই আসে সৈন্যদল—যাকেই দেখে, শরণার্থী, মুক্তিফৌজ কি পাবলিক, তাকেই মারে। মানুষ মারা এত সহজ, ট্রিগার টিপলেই হোলো ঃ নিমেষে খতম।

মা তাজ্জব হয়েছিলেন কে কেড়ে নিলো আমার গায়ের রং এবং কে দিলো কৃষ্ণপ্রলেপ এঁকে শরীরে ঃ আমি তো জানি না ; অন্ধকারে এগুচ্ছি আমরা গুটি গুটি, দালার আবার বললো সিগারেট খাবেন না, কোনো শব্দ করবেন না ; এরপর আরেকটি। পুল যেখানে যাওয়ামাত্র দেখি আরো ছাব্বিশটা নৌকা, আমাদের ছ'টা বাদে। পার হচ্ছে চুপচাপ নীরব রাতের ভিতর দিয়ে, ইন্ডিয়া তখনো এক মাইলের মতো।

কসবার ঘাঁটি ঝিক্‌মিক করছে ; ওখান থেকে হঠাৎ সার্চলাইট ছাড়লে সবাই হুঁশিয়ার, পিলপিল নৌকা থেকে নেমে এখানে ওখানে লুকিয়ে পড়ে ; এবং যারা নামতে পারলো না জলদি, নৌকাতেই পড়ে থাকে চুপচাপ। লাইট ঘুরলো কিছুক্ষণ পর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা

আওয়াজ শুরু হোলো এনতার, যার মধ্য দিয়ে আমরা মনিয়াম গিয়ে উঠলাম। মনিয়াম এদিকের শেষ সীমান্ত।

এখান থেকে আর একা ছোটো নদী পেরুলে ভারত সীমানা, মাধবপুর। আনমনা ক্ষণেও মা কি ভাবেন তার চোখের মণি স্রোতের মধ্যে ভেসে চলেছে কচুরিপানার মতো। নিরাপত্তা নেই বিন্দুমাত্র। খোলা প্রকৃতি, খোলা বর্বরতা, এবং যাদের হাতে চিলো রক্ষণের ভার তারাই নিয়েছে নৃশংস ঘাতকের ভূমিকা। আরো কিছু বাকি।

আরেকটু এগুতে পারলেই বুকের ভিতরে থেকে বেরিয়ে আসবে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

ভারত, ভারতবর্ষ, ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান ঃ যেন স্বপ্নের ভূখণ্ড ; আমরা যখন ভিড় করেছি মনিয়াম নদীর ঘাটে, মাত্র মাইলটেক দূরত্ব অথচ তখনো আশংকা, মৃত্যুর আগে আমরা কি পৌছাতে পারব গন্তব্যে? রাত দু'টো লোকে লোকারণ্য—ঘাটের দিকে যাওয়াই মুশকিল—কয়েক হাজার শরণার্থী নৌকামাত্র বিশ পঁচিশ ; তুব একটা পেলাম ; এবং অবশেষে মাধবপুর, যেখানে মানুষের দিকে মানুষের মতো চোখ তুলে তাকাতে পারি।

জান ছেড়ে মাটি লেপটে বসে পড়ি আমরা দু'জন এবং আরো কয়েকজন, কাছে এলো একটি গরীব হিন্দু পরিবার। পরিবার, একটা যুবতী মেয়েও আছে সঙ্গে ; বুড়ো বললো, ভাইরা আমাদেরকে দয়া করে একটু এগিয়ে দিন, আমরা আগরতলা যাবো। বললাম, আমরাও ওদিকে যাচ্ছি চলুন না। তখন হাঁটু সমান কাদা, বৃষ্টি হয়েছিলো কিছুক্ষণ আগে ; মাধবপুর থেকে পাহাড়ের শুরু ; পাহাড়ের উপরে জঙ্গল, বাঁশঝাড়-রাত তিনটে বাজে, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই যাই ; এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেলাম ভারতের আধামাইল ভিতরে।

ঠিক করেছি, কোনো হিন্দুবাড়ির বারান্দায় রাত কাটাবো খড় বিছিয়ে। কিছুটা নিশ্চিত নিদ্রা ; কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম। যদি দেখতেন মা, ভারী তোষক তুলতুলে নরম বালিশে শাথা রেখে আরামে ঘুমোনো ছোটবেলা থেকেই যার অভ্যেস, সে এখন পুটুলি মাথায় স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে আছে, কি করতেন জানি না ; আধঘুমে দেখতে পাই মা'কে কিন্তু আশ্চর্য তিনি প্রসন্ন, যেন সন্তুষ্ট। আমাকে আরো ছোটবেলায় কেন কঠিনের মধ্যে ফেলে দিলেন না সেজন্য রাগ হোলো তাদের প্রতি। যদি তেমন হোতো, তাহলে আজকে এত কষ্ট পেতাম না। চারটি দিনের যন্ত্রণার সিঁড়ি বেয়ে এসেছি, বুঝতে পারি আমি নেতিয়ে পড়েছি সলতের মমতো। সরওয়ার শক্তসমর্থ, যেন পাথরে কুদানো মূর্তি, ঝিকমিকে কালো ঃ নিশ্চয়ই শ্যামল প্রকৃতি উর্বরমাটি এবং মুক্ত আলোহাওয়া ওকে গড়ে তুলেছে। এর মতো হতে পারতাম যদি। শিলাখণ্ডের মতো ওর মসৃণ বুকে হাতটা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। এবং সকালে ঠাকুরবাড়ি, যেখানে এক্সচেঞ্জ। পাকিস্তানী মুদ্রার বদলে ভারতীয় মুদ্রা ; রেট একশোতে আটাশি। মেয়েটির নাম বিনু ; যখন বাজে সাতটা, ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটছি। রাস্তার পাশে শণার্থী শিবির, ডানদিকে উঁচুনিচু পাহাড়, মাঝে মাঝে বাস, বেবী-ট্যাক্সি ও রিকশা চলছে। পাঁচ মাইল হাঁটার পর আগরতলা টাউন। টাউনে পৌঁছেই তাড়াতাড়ি যাই কংগ্রেস ভবনে যেখানে ট্রেনিং এর জন্য ভর্তি করা হয়। বেশ বড় দালান, অনেক কোঠা এবং দুতলায় রিক্রুটিং অফিস। আমরা দুইজন, যখন ঢুকলাম একজন লোক টেবিলে বসে আছে। বললাম আমরা ট্রেনিংয়ের জন্য ভর্তি হতে এসেছি। উনি শুধোলেন, আপনার কি কোন লীগ-লিডারের কাছ থেকে সিলিপ নিয়ে এসেছেন? বললাম, নাতো। সরওয়ার বললো, এনেছিলাম পথে হারিয়ে ফেলেছি। উনি বললেন, সরি, সিলিপ ছাড়া সম্ভব নয়। বেশ রাগ হোলো, বললাম, আমরা বাংলাদেশের ছেলে এই কি যথেষ্ট নয়? উনি দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন না। লিডার যদি না পান যে-কোনো লীগ কর্মীর কাছ থেকে হলেও

লেখা আনতে হবে। সরওয়ারের চিবুক দৃঢ় হয়ে উঠলো, বললো ঠিক আছে ; আমরা আসছি। পথে বেরিয়ে অনেককে শুধোলাম, এবং অবশেষে বারোআনায় রিকশা করে এলাম জয়বাংলা হেড অফিসে, কিন্তু হায়। অফিস বন্ধ তখন। আবার রিকশা করে গেলাম রাজবাড়ি; সুসংরক্ষিত দোতলা অট্টালিকা, সুন্দর সদর দরোজা। চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে একটি কামরায় অফিস, শরণার্থী ভর্তি করে এইখানে নাম ঠিকানা লিখে কার্ড দেয়া হয়, যা শিবিরে যাওয়ার জন্য অপরিহার্য। কপাল ভালো, অনুরোধ করতেই ওরা কাগজ দিলো। কংগ্রেস ভবনে ফিরে এলে সেদিনই আমাদের পাঠিয়ে দিলো হাঁপানিয়া। আঠারোদিন এখানে থাকবার পর গোকুলনগর যুবশিবির, যা হাঁপানিয়ার পাঁচমাইল দক্ষিণ-পূর্বে: এইখানে কাটাই দেড়মাস। তারপর আমাদের গেরিলা ট্রেনিং সেন্টারে পাঠালো অমপিনগর। অমপিনগর গোকুলনগর ক্যাম্প থেকে একশ পঁচিশ মাইল দূরে। পাহাড়ঘেরা জায়গা। উঁচুউঁচু পাহাড়, আর গভীর জঙ্গল। তার মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তা। জনমানবহীন পরিবেশ। মাইলখানেক দূরে ছোট্ট একটা ঝর্ণানদী, নাম জানি না ; সাধারণত হাঁটুপানি থাকে, কিন্তু বৃষ্টি হলে উঠে ফুলেফেঁপে। চতুর্দিকে বাঁশঝাড়, বিশেষত মুলিবাঁশ এবং বন্যজন্তু বানর, হনুমান, সাপ, জোঁক এবং আরো অনেক নাম না-জানা হিংস্র জীব। আমিও কি এদের একজন? মা জানেন হয়তো। একেকটা তাঁবুতে কুঁড়িজন করে আছি, বাঁশের মাচানই চৌকি। পানির খুব কষ্ট ঃ মাইলটেক দূরে যে নদী, তার থেকে পাইপ দিয়ে আনার ব্যবস্থা ; প্রথমে আসে দু'টি ট্যাঙ্কে—যেগুলো প্লাস্টিকের তৈরি। তারপর পরিশোধ ট্যাঙ্ক, সেখান থেকে গ্রেনেডের চোঙা দিয়ে আনি ছাউনিতে ব্যবহার করার জন্য। মা আমাকে ভুলে গেছেন? জানেন নাতো এখন কেমন রুটি মেনে চলি ঃ ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ, সাড়ে পাঁচটা থেকে দু'টো পিটি। আধঘন্টা চা-পুরি নাশতা। সাড়ে ছ'টা থেকে বারোটা হাতিয়ার শিক্ষা। খোলাজোড়া ফায়ার। গোসল, খাওয়াদাওয়া বারোটা থেকে দু'টো পর্যন্ত, এবং আবার, আড়াইটা থেকে চারটা, হাতিয়ার। হাতিয়ার সবরকম-থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এসেলার, এলেমজি, এসেমজি, মর্টার, চাইনিজ রাইফেল, চাইনিজ এসেনজি, আইয়েআর জিওথ্রি। থারটিসিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ। নানা চার্জ-মাইন চার্জ, ব্লিচিং চার্জ, পেয়ার ফুটিং চার্জ, গ্রেসার চার্জ, কাশটিং চার্জ, বোরহোল চার্জ, যাদের মালমলস্ টিয়েনটি স্লাভ জিনিস্লাভ পিকে মার্ক ওয়ান পিকে মার্ক টু এক্সপ্লোসিভ এইট নট এইট। এগুলোকে বাঁধতে হয় (তারে—কটেক্স বুস্টার, কভার বুস্টার, সেফটিফিউজ ডেটিনেটর জংশন, সবই দেখি নেড়ে নেড়ে। তারপরও যদি মা ভাবেন কোথায় গেল তার ছেলের চাপাকলি রং তবে কি করবো। এবং পুলভাঙার কাজ, রাতের অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম আমরা চারজন। গার্ড দুইজন, সশস্ত্র। দু'টো পায়া ভাঙতে হবে এবং পুলের উপরের রেললাইন। পায়ার চতুর্দিকে একফুট পরিমাণ গর্ত করে বিস্ফোরক সাজাই সারিবদ্ধভাবে কিন্তু পায়ার সঙ্গে লাগিয়ে। তার দিয়ে বাঁধলাম। বেশি করে মাটি দিয়ে ঢাকি কারণ যত বেশি মাটি ততই কার্যকরী বেশি। কটেক্সকে আবার দ্বিতীয় পায়া। চিপা দিয়ে মাটির উপরে তুলি একটি কটেক্স, তারটা তিনশো গজ দূর ইস্তক নিয়ে গেলাম এবং তাতে ফিট করি বুস্টার কভার, সেফটি ফিউজ ডেটিনেটর। উড়িয়ে দিলাম। কি সুন্দর ভাঙলো, যেন একটি কবিতার বিস্ফোরণ পৃথিবীটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দেড়াম করে এক প্রচণ্ড শব্দ। ঘাম ঝরছে রোমকূপ দিয়ে, কিন্তু এখন আর ভয়ের নয়, বিজয়ের। মৃত্যু বুঝি এমনি অভ্রান্ত এবং আকস্মিক। মাঝে মাঝে মৃত্যুর ভয় এসে আমাকে জড়ায় আধোঘুমে আধো জাগরনে, মায়াবী জালের মতো, কিন্তু বিস্ফোরণের সঙ্গে যেন সে উড়ে গেল চিরতরে ছিন্নভিন্ন হয়ে আচমকা। আমার শরীরের নরম পেলব।

সোনার বরণ আচ্ছাদনটাও নীরব ঝাঁকুনিতে ঝরেছে কখন জানি না ; কালো-কালো গোঁফ উঠেছে ; বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। গান গাইলে আওয়াজ আসে ফাটাবাঁশের মতো. রাত্রে মাচানের হালকা শয্যায় শুয়ে শুয়ে দেখছি মা'কে, চুল ছেড়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছেন ঃ চিরচেনা রূপ. বিছানায় যাওয়ার আগে ঠিক এমনি সময়ে আমি বিরক্ত করতাম, বেশি টানতাম কাপড় জড়িয়ে, কি ভাবছেন এখন? জয়কে নিশ্চয়ই, যার গায়ের রঙে এবং মুখের সর্বত্র নিজের ছাপ? কক্‌খনো চোখের আড়াল করতেন না, এমনকি আরো পাঁচটি কোলে আসবার পরও। একি তার নিজের সত্তা? তরুণী বয়সে ভাষা-আন্দোলনের মিছিলে বেরুতেন ফেসটুন হাতে নিয়ে এবং স্বাধীনতার জন্যে লড়তে এসেছেন, হাতে মারণাস্ত্র? মা'কে বুঝতে পারিনি। ইনি দুর্বোধ্য, নদীর মতো গভীর। নদী যে কুলপ্লাবিনী বর্ষার কিন্তু শরতে খামারের মধ্যে শায়িতা, তিনি শোবার ঘরের খাটের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন হাঁটু তুলে আলুথালু বেশে ; যেন অনেক দিন পরে মফস্বল থেকে আসবেন বলে বাবার প্রতীক্ষায়। তিনি শুয়ে আছেন। আমি অস্ত্র শিখছি। কত গোলাগুলী। রাইফেল ১০ রাউন্ড। এলেমজি ২৭। এসেলার ১৭। স্টেনগান ২৫। টু ইঞ্চ মর্টার ১ বোমা। গ্রেনেড ১। টারগেট মানুষের বুক, টিনের মধ্যে আঁকা ছবি তিনশো গজ দূরে। বুকের মধ্যে কালোদাগটি. বিঁধিয়ে ফেলাই সাধনা। হায়রে, মানুষ মারবার বিদ্যা শিখছি এখন। ছাত্র ছিলাম, ছেড়ে দিয়েছি লেখাপড়া। কারা আমাদের ছুঁড়ে মেরেছে এই দাউদাউ আগুনের মধ্যে, নেপথ্যে কোন্ ষড়যন্ত্রী? কোনদিন দেখবো না তা'দের চেহারা? মা মুয়ে আছেন। আমি গুলি করছি দণ্ডায়মান, বসে হাঁটু গেড়ে। কখনো বা শুয়ে মাথার উপরে। শিকারী বাঘের মতো গুটি গুটি পা'য় নিঃশব্দে এগিয়ে আমার প্রথম এলটাইপ এমবুশ হবিগঞ্জের সীমানায়, যখন উত্তর আকাশে মেঘের পাহাড় জমে উঠেছিল নিচে মাত্র চারশো গজ দূরে সজাগ শত্রু। চন্‌চন্ রক্ত সঞ্চারিত হতে তাকে মগজের কোষে কোষে এবং নিমেষে আমি বেড়ে উঠি সাগর পাড়ে বোতল থেকে ছাড়া পাওয়া দৈত্যের মত্যে, কামরূপে তমলুকে দুই পা ; পেশল-উরু ফুলে ফুলে ওঠে স্তম্ভের মতো এবং কালো কালো বিশাল বুক মেলে দিয়ে তাকাই নিচে বিজলি ঠিকরে পড়ে চোখে, পাথর চাকার মধ্যে চাকু ধার দেয়ার সময় যেমন ফুলকি। দেখতে পাই গাছগাছড়া নদনদী, ঝর্ণা, সবুজ প্রান্তর। নড়ছে, নড়ে নড়ে উঠছে, একেকবার। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো চিৎকার। চাপা গোঙানি আর্তনাদ। সশস্ত্র, সঙ্গিন ওখানে ওরা কারা? যে চিনি আমি ; জোর করে ধরে নিয়ে নিলো একটি মেয়েকে, পুরো ন্যাংটা করে শুইয়ে দিলো ঃ দ্রুম্‌দ্রুম্ ফাঁকা আওয়াজ করে একজন, আরেকজনের অট্টহাস্য। একের পর এক ধর্ষণ করছে ওরা, আমি ছুঁড়ে মারি একের পর এক কঠিন বজ্র। কোন্ যাদু বলে বিশ্বাস হলো রমণী পাহাড় বুনিজোড়া কালো মেঘে চুল ছড়িয়ে গেলো এবং তার আড়াল থেকে ভেসে ওঠে ক্ষতবিক্ষত চাঁদের মতো কলঙ্কিত পূর্ণাঙ্গ মুখ ; হঠাৎ চমকে গিয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠি, মা। মা আমার, তুমি আমার কথা কেন শুনলে না? আমার চোখমুখ গলতে থাকে, আমি ঝরছি বৃষ্টি হয়ে ঝম্‌ঝম্। তারপর নিশ্ছিদ্রবর্ষণ ; পৃথিবী হারিয়ে গেল এক নিবিড় আদিম তমসার ভিতরে।

শহরে বাতি জ্বলছে ;. কিন্তু আমার সামনে জুলছে যেন অন্ধকার। বাঁ হাতের বাহুতে গুলি লেগেছিলো, ডান হাতটা এখনো মুক্ত ; তাই দিয়ে চোখজোড়া কচলিয়ে তাকাই আশেপাশে যেখানে কোথাও পশ্চিমা ট্রাফিক পুলিশ, কোথাও রেস্টুরেন্ট আলো ও কিছু ঝাঁঝালো গান। এই কৃত্রিম স্বাভাবিকতার মধ্যে গাড়িতে কিংবা রিকশায় পাবলিকের চলাফেরা কুবই কম। মিলিটারি টহলদার জীপ একটিও দেখলাম না, তাহলে মফস্বলে এখন

অবস্থা খারাপ? ফারুকের বাবার নতুন সাদা টয়োটা, সে নিজে ড্রাইভ করছে, ভিতরে আমরা দু'জন, আমি আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছি মহিলার মতো, এবং আমার থুৎনিতে সাদা দাড়ি, গোল টুপি মাথায় বুড়োবেশী তারেক ; গাজির পাঝাড়া, মাঝে মাঝে বলছে বেগম সাব, হাতে দিচ্ছে চাপ এবং খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে। কাপড়ের নিচে হাতের মুঠোর মধ্যে একটা গ্রেনেড ধরে আছি, এমারজেনসির জন্য। গেটে তালা ছিলো না, আমরা চলে গেলাম একদম ভিতরে ; গাড়ি বারান্দায়, ওখানে আমাদের গাড়িটা, ড্রাইভার স্টীয়ারিং হুইল ধরে তৈরি। কোথায় যাবে ওরা এখন? বাইরে থেকে গাড়ি আসার আওয়াজ পেয়েই দ্রুত নেমে এলো সবাই কিন্তু একি কাউকে চেনবার জো নেই ঃ মা'র চুল ধবধবে সাদা, দুইবোন রিগান ও তুসি চুল কেটে ফেলেছে এবং পরেছে ট্রাউজার সার্ট। ওরা বিষণ্ন কিছুটা শঙ্কিতও। গাড়ির কাছে মুখ নিয়ে এলেন মা, কিঞ্চিৎ নিচুস্বরে বললেন, এসেছিস? আমি জানতাম আসবি তুই। জলদি উঠে আয় এই গাড়িতে, এক্ষণি চলে যাচ্ছি আমরা বাসা ছেড়ে।

আমাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিলো ওরা। রিগান বললো, ভাইয়া বাবাকে....। ওকে থামিয়ে দিয়ে মা বললেন, আজ ধরে নিয়ে গেছে অফিস থেকে পাঁচটার সময়।

চুপ হয়ে যাই ; এবং চুপ হয়ে থাকি সব্বাই, এক মুহূর্ত। তারপর কয়েক মুহূর্ত দ্রুত সক্রিয়তা। একান্ত দরকারী কিছু জিনিসপত্র, বাকসপেটার আগেই উঠেছিলো, এবার ওরা উঠছে একেকজন। মা দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে আবার আদেশ দিলেন, জলদি নাতো।

কি জবাব দেবো বুঝতে পারছি না। ফারুক বললো, ও কোথায় যাবে? তারেক বললো, আমাদের রিপোর্ট করতে হবে তো।

গাড়ির দরজা খুলে মা আমাকে ধরলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, তোমরা দু'জন তো রয়েছ। আমার সঙ্গে যাবে জয়। একজনকে দিয়েছি ; আমাদের বাঁচবার জন্য এইকি যথেষ্ট নয়?

কণ্ঠস্বর গাঢ় এবং দৃঢ়, কিন্তু আমরা কিছুই বুঝলাম না। নামতে নামতে চাদরটা সরিয়ে বললাম, দ্যাখ মা। আমার রং ফিরে পেয়েছি।

এতো রক্ত! অকস্মাৎ মা ভেঙে পড়লেন, তার দু'চোখে দরদর অশ্রুধারা ; আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এই বুঝি আমি চেয়েছিলাম। বেশ, ভালোই হোলো! নদীর স্রোতে আমিও মিশেছি। তোমরা কিছুই ভেবো না বাবা, জয়কে নিয়ে আমরা সবাই ফিরে আসবো। ফিরে আসবো।

চারদিকে যেন লাল-নীল হলদে অজস্র সাংকেতিক আলো, নড়ছে, কাঁপছে, আসছে। গাড়ি দু'টি গুটি গুটি বেরিয়ে এলো রাস্তায় ; এবং নিমেষে কুশল বিনিময় না করেই দুই বিপরীত দিকে আমরা তীরবেগে ছুটে চললাম।

জুলাই, ১৯৭১।

নীরবতা



পিস্তল নয়, একটা মোটা কালো আঙুল সটান উঁচিয়ে আছে পুরু ঠোঁটের উপরে হুঁশিয়ারির ভঙ্গিতে, এবং উপরে একজোড়া লালচে কুৎকুৎ চোখ। তবু চিৎকার মেরে উঠত। কিন্তু তা আঁচ করেই বোধ হয় টর্চের আলো ফেললো—সঙ্গিন তাক করে দাঁড়িয়ে সৈনিক। তার পিছনে আরো একজন। আর একজন দরোজার কাছে। সারা বাড়িটাই হয়তো ওরা ঘেরাও করেছে, নিঃশব্দে।

কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে একজনকে, দেখাই যথেষ্ট।

হায় হায় ফাটা কপাল ; নুরা যে অমন জলদি মতলব হাসিল করতে আসবে তা যদি বুঝতে পারত মেঘার বাপ। নসিব, নসিব। নইলে কেন অমন জালে আটকা পড়বে, ভেটকি মাছে মতো? প্রতি বছর কলার উপরে জলজলা চলে, জমি কেনে ; কিন্তু এবার কলাই বুঝি কাল হোলো। মৌসুমের এই প্রথম ছড়ি, মোটাতাজা বাইশ হালি সাগর, পাকা সোনার রং, সেটা পাইচার মধ্যে নিয়ে আরঙের উদ্দেশ্যে মেলা দিয়ে আর-দুইজন বেপারীর সঙ্গে কেন মিলিটারি ছাউনির দিকে গেল মেঘা, সেই তো আজল। পয়সার লোভ? হাঁ নিশ্চয়ই। দক্ষিণ পাড়ার জলা, এই সেদিন এর চাইতে নিয়োম একটা বেচে এসেছে দেড়শ টাকায়—সে তুলনায় এটার দাম হবে নির্ঘাৎ দুশোর কম নয়। কিন্তু হোলো উল্টাফল! ছড়িটা তো বিনি পয়সায় নিয়েই গেল, মেঘাকেও আটকে রেখেছে আজ এগারোদিন। বেবাক কইলো শান্তি কমিটির মেমবর নুরার সঙ্গে বেশ ভাব মেজর সাবের, ইচ্ছে করলে একমাত্র সেই বাঁচাতে পারে ; বুঝলো মেঘার বাপ। একদিন রাতে গেল তার কাছে, হাতে পা'য়ে ধরলো। কিন্তু পাষাণ টলে, নুরা গলে না। বরং গাল দিলো, চোখ রাঙালো। পরদিন কাকুতিমিনতি করবার জন্য বাচ্চাকাচ্চা দিয়ে বৌকে পাঠালে অনেক আমাংলা কথা শোনাতে লাগলো, এবং তখনই বোধ হয় নজর পড়ে তুফানীর প্রতি, যে ভাইয়ের ছোটো ছেলেটাকে কোলে নিয়ে একটু দূরে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছিলো, চিনতে পেরে এক সময় নরম হয়ে গেল গলা, বিদায় দেয়ার সময় জানালো সন্ধ্যের সময় যাবে ওদের বাড়ি।

এইতো, গর্‌গর্ করে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে জ্বলছে কেরাসিন কুপি, নুরা সিগারেট টানছে জলচৌকিতে বসে এবং সাপের ছোবলের মতো দৃষ্টি বাড়িয়ে দিচ্ছে বারবার, সামনে এসে দাঁড়ানো তুফানীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। এমন একটা মাল কাছেই ছিলো ভেবে প্রথমে আফসোস হলো, সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কারের চাপা উল্লাস, গুড়ের চায়ের বাটিতে চুমুক দিচ্ছে আর করছে চুক্‌চুক্ শব্দ ঃ মেজর সায়ের কি যে খুশি হবেন।

ভারী-ভারী মৃদুমৃদু দুলালো আমের ডালা। কেন এলো সে এখন অমাবস্যার এই অন্ধকারে, কি দুঃখ পেয়েছে আবার আমি জানি না কিংবা কি আনন্দ যা দুঃখেরই মতো অথবা কেমন বুঝি না। কিন্তু যখনই এমন হাজিরা হঠাৎ ছলছল করে ওঠে আমার প্রবাহ পারের ঘাসে ঝোপে ঝাড়ে হেলেদুলে পড়ে নলখাগড়ায় কাশের গুচ্ছে, এর মানে কি এই যে, ওর নাড়ির সঙ্গে আছে আমার নাড়ির যোগ হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে হৃৎপিণ্ড থাক বা নাই থাক, ওর মনের ছোট বেদনাও আমার শরীরের আয়নায় ছায়া ফেলে এবং তক্ষুণি আমি অস্থির

বৈশাখের রাত্রে ভীষণ তুফান যার কালো থাবার খাবলায় খাবলায় উছলে উঠেছিলাম ঝলকে ঝলকে ছুটে গিয়েছিলাম উঠোনে বারান্দায় তখন প্রবেশ শোঁ শোঁ ধ্বনির ভেতর সে জন্ম নিয়েছিলো আঠারো বছর সে আর কত দিন এবং সে রাতে যে কাঁচামিঠে গাছটা গোড়া উপড়ে হেলে পড়েছিলো, এখনো তেমনি আছে, তুফান ওকে নিয়ে এসেছে তাই। নাম ওর তুফানী। কালো-কালো চোখজোড়া ফোলা ফোলা ঠোঁট, বড় অভিমানিনী। আগে আমের ডালে বসে আমার টলমলে পানিতে পা ডুবিয়ে সহজেই ভুলতো দুঃখ, কিন্তু এখন শ্যামলী রাজহংসীর মতো দারুণ বয়স, সহজে ওঠে না, সহজে বসে না, সহজে চলে না, সহজে বলে না। হ্যাঁ পাছদোরায় দুরুদুরু বুকে দাঁড়িয়ে তুফানী শুনেছে নুরার প্রস্তাব, যা শুনতেই শাদাদাড়ির ভিতরে আঙ্গুল চালিয়ে হাউমাউ করে উঠলো।

বাজী, হায় আল্লাহ হায় আল্লাহ করতে লাগলো। কোন্ পাপে এমন গজব নাজেল হোলো, মুখের সামনে নুরা বলে কিনা তুফানীকে নিয়ে গেলেই মেঘাকে ছাড়বে নইলে খতম, কারণ মিলিটারি বলছে সে মুক্তিফৌজের গুপ্তচর। এখনো সময় আছে, এখনো শুধু আটকেই রেখেছে, এখনো চামড়া তুলে নুন লাগায়নি, আঙুল কাটেনি। হাত পা একে একে আলগা করে নেয়নি। তা'ছাড়া দু'তিন রাত তারপর তুফানীকেও দেবে ছেড়ে, এটা কি আর অমন! মেজর সাচ্চা আদমী কথার বরখেলাপ হবে না এবং রাতে নিয়ে যাবে আর রাতেই দেবে ফিরিয়ে কেউ জানবেও না। নেহাৎ দরদী, তাই দু'দিন সময় দিলো নুরা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে সামান্য জিনিশের জন্য একমাত্র পুত্র হারানো পরিবার ধ্বংস শুনতে শুনতে কানে আঙুল দিলো তারপর ভাউজের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো, কাঁদলো, ভাউজও কাঁদলো দু'জন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ, তারপর থামলো দু'জনেই।

তাকিয়ে রইলো চোখে চোখে। পরস্পর নিঃশব্দে অসহায় বোবা চাউনিতে কি কইলো ভাউজ আর তুফানীই কি জবাব দিলো! ফ্যাল্‌ফ্যাল্ তাকিয়ে থেকে দু'জনেই জানে দু'জনের মনের কথা কেউ জানে না কাউকে, এখানে এসে কিছুক্ষণ থর মেরে বসে থাকে তারপর আমের ডালে বাড়ি দিয়ে দিয়ে ভাঙে ডানহাতের বাঙবিড়গুলো। দূরে দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে একটি তারা—কি তার নাম মনে নেই। সেইখান থেকে যেন হঠাৎ তীরের মত ছুটে এলো একবিন্দু আলো এবং মনের ভিতরে গিয়ে জ্বললো। হ্যাঁ, একটি উপায় আছে—গলায় কলসী বেঁধে এবং সেই কলসী বুরিয়ে নিয়ে ডুব দিলেই পৃথিবীতে যেখানে এত লাঞ্ছনা সেখানে ফিরে আসতে হয় না, অন্তঃস্রোতের সঙ্গে কলসীই নাকি টেনে নিয়ে চলে আস্তে আস্তে পাতালের দিকে। বেপারিবাড়ির বৌ ফুলজান এমনিভাবে শান্তি পেয়েছিল এবং আরো অনেকে। মা তাদের নাম জানে অনেক বয়েস হলেও কিছু ভোলে না ওর পক্ষেও এটা তো সহজ বড়জোড় লাগবে কিছু নিরালা সময় এবং রাতই সবচে উপযুক্ত বিশেষত দুপুর রাত যখন সবাই গভীর ঘুমে থাকে মগ্ন এবং গাছপালাও।

ঝিম্ ধরে থাকে, কিন্তু এই কি সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেলে বরঞ্চ বেড়ে যাবে ওদের রোখ এবং তখন এসে ঘরবাড়িও পুড়িয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে বরং—আর ভাবতে পারে না তুফানী। মাথার ভিতরটা গোলমেলে হয়ে যায়, বুক ধড়ফড় করে, যদি এমন হোত না না তুফানী! চুল ছেড়ে দিয়েছে আরো আলগা করে আঁচল খসে পড়েছে। আমি দেখলাম ওর শরীরটা যেন বাড়ছে আরো বাড়ছে আরো আরো বৈশাখে মেঘ যেমন করে বাড়ে এবং

প্রায় দ্রুততালে। ছেয়ে ফেলে আকাশটাকে কালোপানির ভারে টইটম্বুর কিন্তু যার মাঝে লুকিয়ে থাকে তরবারির মত ঝকঝকে জিলকি আর আগুন আর বজ্র আর তীক্ষ্ম তীক্ষ্ম শব্দ চিকন চাবুকের মতো একটি হাসি অন্ধকারকে চিরে চিরে গেল আচমকা তুফানীর শাদা চিরল চিরল ফকফকে দাঁতগুলো ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো এবং চোখজোড়া জ্বললো ছুরির মতো। এইতো এইতো আর কি ভাবনা! কিন্তু হুল্‌হুল্ করে উঠলো কেন আমার হৃৎপিণ্ডটা। অবশ্য খুব আদর করি আমি তফানীকে খুব—যখন সে আমার ভিতরে নামে ওর ডগমগে পেলব গতরে ঠেলা দিতে আঘাত করতে বড় ভালো লাগে। ওর দেহ ঘিরে হর্ষের হাজার আয়না হয়ে নাচতে থাকে ঘুরতে থাকে ঢেউ আমার প্রবাহ এবং যখন সাঁতার কাটে আমি আন্দোলিত হতে থাকি, কেন জানিনা ওর অঙ্গসঞ্চালন ভিতরে আমার নিদারুণ ঝড় তোলে। মনে হয় বুঝিবা এক্ষুণি একটি প্রচণ্ড মোচড়ে জলস্তম্ভ হয়ে অনেক উপরে উঠে যাবো আর ওকে সম্মোহিত হয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে খেলবো দানবের মতো। আমি ব্রহ্মপুত্র মানসরোবর থেকে এত দূরে এসে যেন উৎস হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু যখনই এমন মুহূর্ত মনে হয় যৌবন ফিরে পেলাম। আগেই বলেছি আমি বুঝি না আমি তুফানীকে বুঝি না যদিও আমার কোলেই জন্ম আমার বুকের উপর বাড়ছে গাবের ঝোপড়ার ভিতরে ডানা ঝাড়া দেয় ঝড়ের পাখির ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো চুলগুলো ধরে পিছনে গেরো দিচ্ছে এমন সময় মাথায় একটা দবজ হাত, বাজী এসেছে খুঁজতে খুঁজতে এইখানে কারণ জানে এখানেই আসে তুফানী, অন্য কোথাও যায় না তুফানী। নিজের আঙুল দিয়ে ছুঁলো পিতার খসখসে চামড়া কিন্তু কেউ কিছু বলে না, মেঘার বাপ বসলে মেয়ের পাশাপাশি। কাঁধে ধরলো, কাঁদছে নিঃশব্দে, ফেলছে চোখের পানি এবং তুফানী এখন দৃঢ় পাথর খোদাই প্রতিমার মতো এমনিভাবে কাটালো কিছুক্ষণ। তারপর নিজের ডানহাতটা তুললো এবং আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলো বাপের চোখ মোছা হয়ে গেলে দু'জন থ মেরে বসে থাকে আরো কতক্ষণ।

আমিও জানি একসময় মেয়েকে ছেড়ে উঠলো মেঘার বাপ, ঘাটের সিঁড়িতে নেমে ওজু করতে থাকে আস্তে আস্তে এবং মুখে অস্পষ্ট বিড়বিড় ; নামাজ পড়লে মনের একটা হদিস পেয়ে যেতে পারে, এই বিশ্বাস। দুঃখীর সহায় বিপদের বন্ধু পরম করুণাময়, তার দরবারে হাত পেতে কেউ ফিরে আসে না, পায় কিছু না কিছু। হয়তো বুঝতে পারে না কিভাবে এলো আশীর্বাদ। তবু আসে একথা ঠিক। বাপকে নিয়ে যাবে ঘরে, তাই তুফানী বসে আছে তেমনি ; মাটিতে হেঁচড়ে পড়া আমগাছটার কাছাকাছি, গামছাটা পেতে দাঁড়ালো একটা নির্জীবমূর্তি। রাকাৎ বাঁধে। রুকু দেয়। সালাম ফেরায়। দুই হাত তুলে করে মোনাজাত। মাটিতে জন্মেছে মাটিতেই জীবন, একটি পয়সা মারেনি কখনো কারুর, জেনে শুনে কোনো পাপ করেনি; তবু কেন এই শাস্তি? না এটা ঈমানের পরীক্ষা? হয়তো তাই, ভাবলো মেঘার বাপ, কিন্তু এই পরীক্ষায় কিভাবে পাস করবে, তাই মুশকিল। মেঘাকে ছাড়িয়ে আনা চাই কিন্তু তুফানীকে ওদের হাতে তুলে দিলেও চলবে না। লোকে জানে মেঘার বাপ চিকন বুদ্ধির মানুষ, বাপের কাছ থেকে পেয়েছিলো মাত্র বাড়ি আর দেড় কানি জমি অথচ এখন আধদুন জমির মালিক, মাটিতে লেগে থাকে জিরের মতো কলাটা মূলাটা আলুটা দিয়ে মাটি টিপে পয়সা বার করে। সেই মেঘার বাপ আজ দিশেহারা। তার চিকন বুদ্ধি পুরনো দায়ের মতো ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথার ভিতরে আতিপাতি করে খোঁজে আছে কিনা কোনো প্যাঁচ কোনো কায়দা।

কিন্তু কিছুই না পেয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে প্রার্থনার হাত এবং পরে সেই হাতজোড়া গুটিয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আহত পশুর মতো। তুফানী দেখলো, আস্তে করে উঠলো এবং কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে তাকে আগলে ধরলো আলতুভাবে, ইচ্ছে করলেই যেন আঁচল ছড়িয়ে তাকে ঢেকে দিতে পারে শাওনের ভরামেঘ যেমন আবৃত করে রাখে বজ্রের অস্থিরতাকে, কিন্তু তুফানী চুপচাপ, মাটিতে লেপটে বসে টেনে নিলো বাপের মাথাটা উরুর উপর, তারপর নিঃস্পন্দ আরো স্থির।

বাড়ি ঘেরাও হয়েছে জেনেও তুফানী বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। ভাইয়ের বাচ্চাটাকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়েছিলো, ওখান থেকেই চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো সবকিছু। এবং যখন দেখলো বা'জানের বাজু ধরেছে নুরা আর একটি সেপাই বেয়নেট উঁচিয়ে আছে তার চোখের দিকে। তুফানী উঠলো ঃ জাবারের নিচে গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে পড়লো ভাউজ আর মা ; কিন্তু তুফানী ঝাঁকড়াচুল পিছনে ফেলে, এবং আঁচলটা ঘাড়ের উপর দিয়ে বুকের কাছে নিয়ে আস্তে করে হেঁটে গেলো ওদের কাছে ; মেয়েকে দেখে যেন শিউরে ওঠে মেঘার বাপ কিন্তু তবু ঠাণ্ডা, বিশেষ করে টর্চের আলোর আভায় যখন আচমকা চোখ পড়লো তুফানীর চোখের দিকে নিমেষে টান হয়ে উঠলো ধনুকের ছিলার মতো। চোখের পানি মুছে ফেলে বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে, এবং উঠে দাঁড়ালো। এদের এমন ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ভড়কে যায় রা—কাছেভিতে মুক্তি কোথাও ওঁৎ পেতে নেই তো? না আশংকা কম। তাদের খবর মতে এই এলাকতাটা এখনো নির্ঝঞ্ঝাট, তাই না নুরার মতো টাউটও বুক ফুলিয়ে চলে। একপা দু-পা করে হাঁটছে, পাছদোরার মাটির কয়েক ধাপ ছাড়িয়ে নামলো, তারপর আরো যেতে থাকে যেমন করে বাড়ির কন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যায় শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে তেমনি কুণ্ঠিত পদক্ষেপ।

সামনে নুরা টর্চ হাতে নিয়ে এবং পিছনে দুজন সৈন্য একসময় রাইফেলের গাদায় মৃদু গুঁতো মারে মেঘার বাপের পিঠে জলদি হাঁটবার জন্য, কারণ যত তাড়াতাড়ি গাঁও ছাড়িয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে পড়ে এবং সেখানে উঠতে পারে নৌকায় ততোই ভালো, যদিও লড়াইয়ের সব সরঞ্জাম সঙ্গে মওজুদঃ

অমন সহজে কৃতকার্য, মনে মনে খুব বেশি হলো ওরা, বেশ আব্দার উপরন্তু মেঘলা আসমান ; এবং গাছের একটি পাতাও নড়ছে না, প্রকৃতি নিথর-নিস্তব্ধ আর থমকে দাঁড়িয়ে আছে সময়টা ; এরই মধ্যে পায়ে চলা যেন স্বয়ংক্রিয় ; কখনো এমনি উঁচুনিচু আর কখনো ঘাসে ছাওয়া পথে অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল ডিঙির কাছে। ছই আছে, যার সম্মুখ কাপড়ে ঢাকা তবু মাঝে মাঝে হাবিজাবি ছিদ্রের মতো আলো ঃ ভিতরে সলতে কমিয়ে রাখা একটি হারিকেন জ্বলছে, গলুয়ের কাছে লগি হাতে এক মাঝি, পাছায় আরেকজন। কিছু দূরে থাকতেই একবার টর্চ মারলো নুরা, ওদের আগমনের সংকেত।

নদী আমি। দূরে পর্বতের বরফগলা জলে আমার জন্ম। এবড়োখেবড়ো পাথর লতাগুহার উপর দিয়ে চল-চঞ্চল। কখনো ফেনিলতা, কখনো প্রকাণ্ড শামুকের মতো বাঁকা, নেমে আসি জনপদ শস্যক্ষেত্র ভিজিয়ে মাটিতে স্তরে স্তরে শিকড়ে শিকড়ে ছড়াতে ছড়াতে উর্বরতার জীবনরস আর কতকিছুই নজরে পড়ে। তাজ্জব চিতাবাঘ গাঙচিল হরিণের নিঃশব্দ পিপাসা নিবৃত্তি, কিন্তু সবচেয়ে বড় তাজ্জব মানুষ কারণ কত লাখো বছর হিয়ায় হিয়া রেখেছি কিন্তু বুঝতে পারিনি তাকে, বিশেষত কুমারী কন্যা যে ঝড়ের রাতে জন্ম নিয়েছে তার কিনারা পাওয়া অসম্ভব। তাই আমি কেবল দেখছি আর কিছু নয়। ডিঙিতে তুলে দিলো

ওকে। হাউমাউ করে উঠতে চাইলো মেঘার বাপ। তাকে গুঁতো মেরে ফেলে ওরা। দ্রুত হেঁটে গেল নদীর পাড় দিয়ে কিছু দূরে আরেকটি নৌকো। এদিকে মাঝি ডিঙি চাড়ে মেজর বাইরে এলো এবং তুফানীর হাত ধরে ওকে ভিতরে নিলো। দুজনের ভারে নড়েচড়ে ওঠে ছোট ডিঙি। দাঁত বার করে হাসছিলো মেজর, কিন্তু আলো বাড়ানোর পর তুফানীর মুখের দিকে তাকাতে থেমে যায় যেন এক আশ্চর্য যাদুতে কি মায়াভরা মুখ সজল কালো চাউনি কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত। পরক্ষণে বোতলটা বার করে ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢাললো কিছু লাল পানীয় এবং তখন, বৈশাখী আকাশের রংফেরার মতো তুফানী রূপান্তরিত, ভাঁজে বাঁজে হারিয়ে গেল তার সকল কোমলতা। না না মেজরের চোখমুখ দেখে সে ভয় পেয়েছে কাঁপছে যেন ধিকিধিকি! পিতলের অক্ষর নকশা ঝক্ ঝক্ করছে হাতের কাছে একটা পিস্তল। বুঝতে পারলো সহজেই এর পরে কি করবে লোকটা এবং সত্যই যখন হাত বাড়ালো বাধা দিলো না বরং নিজেই কাপড় খুলে ফেলে দিতে থাকে প্রথম উপর থেকে তারপর পেটের কাছ থেকে গিট আলগা করে। বহুৎ আচ্ছা লেড়কি বহুৎ আচ্ছা—দিশেহারা মেজর।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে উত্তেজনায় এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ওৎ পাতলে তুফানী কোমলভাবে গালে চুলে আদর করতে লাগলো। হ্যাঁ তাইতো যেমন করে আদর করেছিলো একরাত্রে ওনি ভূপাতিত গাছের শিকড়ে মামাতো ভাই সুন্দরকে টাউনের কাছে মিলে নাম লিখিয়ে যে ফিরে এলা না প্রায় সেই রকম। তাকে আগলে বাড়িয়ে দিলো মুখ এবং সেনাপতি থতমত খেলো নিজেই।

তাকে জাবড়ে ধরে চিতিয়ে পড়লো আর তখন মোচড় খেতে খেতে মাঝের ধারায় এসে পড়েছে ডিঙিখান। কিছু হেলছে দুলছে। মাঝিরা তৎপর খুবই ঝপাঝপ দাড় ফেলছে তুলছে, বেশ পেছনে পড়েছে পাহারা অস্ত্রের নল গ্রামের দিকে। অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু লাল ছিদ্র, ওরা বিড়ি ফুঁকছে কিন্তু ফেলছে না টর্চের আলো, বিড়ির আগুনও তেমন নয় তেমনি ধূসর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি তারা, বিশেষ মেঘার বাপের চিকন বুদ্ধি ফিরে এসেছিলো। তাই ডিঙি ছাড়বার সময় যখন গুঁতো মারলো ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে আমার মাঝে গিয়ে গা ডুবিয়েছিলো এবং ডিঙি চলতে শুরু করলে বাইরে বেরিয়ে থাকা গুড়ার একটি মাথা ধরে থাকে। এই তো চলেছে। ডিঙির সঙ্গে কেটে কেটে পড়ছে পানি। জেলে নৌকা যেমন বড় মাছ বিঁধিয়ে নিয়ে চলে তেমনি পুরনো গাছের মতো শুকিয়ে যাওয়া শরীরের মধ্যে টের পাই ধুক্‌ধুক্ করছে হৃৎপিণ্ড এবং সেইটুকু এত কাছে তবু বুঝিনা কি তার মতলব। এখানে এই মাঝের ধারায় ধারালো আমার গতি আর তারই ছোঁয়ায় নাকি জোয়ানকি ফিরে এল তার ঠিক আগের আঠারো বছরের চাইতেও যেন বেশি। মেয়ে তুফানীর কোমল হাত যেন মুটোর মধ্যে ধরে রেখেছে। টেনে আনবে ওকে আনবে ছিনিয়ে এই তো কাত হচ্ছে ডিঙি আরো।

কাত হোলো, কোত্থেকে এলো। এত জোর কঠিন কঠিন ফাঁসের মতো তুফানী মেজরের গলা বেষ্টন করেছে এবং ওর ওপরে মোচড়াতে থাকা তার জবরদস্ত দেহটাকে পাছার নিচে উরুর পিছনে দুই ঠ্যাংয়ের কাউরিতে চেপে ধরেছে। সাঁড়াশির মতো কাত হচ্ছে ডিঙি আরো কাত হলো। ভড়কে গিয়ে বৈঠা থামিয়েছে মাঝিরা।

কাত হচ্ছে ডিঙি আরো কাত হোলো। নিজের থেকে বুক ইস্তক উপরে তুলে দুই হাতে বাতা আঁকড়ে ডিঙিটাকে ওল্টোবার চেষ্টা করছে আরো একজন বৌতিক অভ্যুত্থান, কিন্তু ডিঙি ওল্টোবার আগেই হুড় মুড় গড়াতে গড়াতে এসে এক ছটকায় ঝপাৎ করে নিচে পড়লো ভীষণ ল্যাপটানো জটপাকানো জীবন্ত ভারী একটি পদার্থ বেশ আলোড়ন তবু নেই কণ্ঠস্বর।

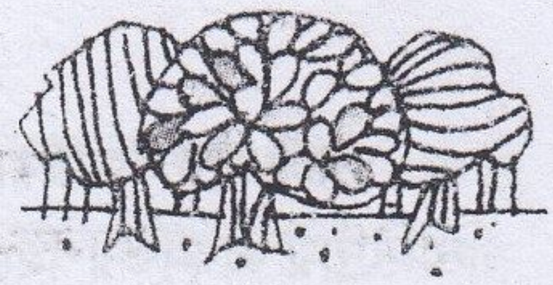
আমি নদী অবিরাম বয়ে চলি। এই আমার জীবন, এই মৃত্যু এই স্বপ্ন এই জাগরণ এই চিরনিদ্রায় প্রকৃতির হিসেবে কিছু ভুল হয়েছিলো কিনা জানি না। মগজে কিঞ্চিৎ বাড়তি বুদ্ধি পেয়ে গেল মানুষ আর তাই খাটিয়ে খাটিয়ে সে দখল করেছে পৃথিবীটাকে যাকে সে চষে অহরহ নিপীড়ন করে এবং সব রস নিঙড়ে গিয়ে যা খাদ ছোবড়া আবর্জনা তাই ফেলে জড়ো করে আমাদের বুকে কখনো ইচ্ছেয় কখনো এমনি। তারা জানে এই ভালো নদী কীর্তিনাশা সর্বগ্রাসী এবং এটা তো ঠিকই যদিও আয়নার মতো যদিও নরম নমীয় আমাদের হৃদয়ে কোন কিছুই দাগ কাটে না। তুফানী কি আর এমন একটি গ্রাম্য বালিকা এমন শত শত রোজ স্নান করে আমার নানা ঘাটে নানা জায়গায়। তুফানী ওর কাঁচা খেয়ালে যা করলো তারও সব মুছে যেতে দেরি লাগবে না যদিও সন্দেহবশত তক্ষুণি ওরা টর্চ ফেললো পিছন থেকে এবং যখন দেখলো ঘুরছে খালি ডিঙিটা আর তার আশেপাশে ঢেউয়ের আথালি-পাথালি নিঝঝুম নীরবতাকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে একসঙ্গে গর্জে উঠলো অস্ত্রগুলো আকস্মিক সেই শব্দে দূরে কাঁপছে গ্রাম। ধড় মড় করে উঠে বসলো নরনারী। কাচ্চাবাচ্চাদের তুললো টেনে কিন্তু এও কিছুক্ষণ ডিঙির কাছে এসে যখন জনমানবের চিহ্নও দেখলো না আবার ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে দ্রুত বেগে চলে চাউনির ঘাটের দিকে, তারপর আবার নীরবতা। এবার যেন আরো একাগ্র গাঢ় বিন্দু বিন্দু করে নামে আর তার মাঝে মৃদু ছলাৎছল ধ্বনি।

জোয়ানকালে গভীর পানিতে চিংড়ির চাঁই পেতে অভ্যস্ত।

মেঘার বাপ বুর দেয় আরো কয়েকবার কিন্তু কতটুকুই যেতে পারে যখন এখানে আমি প্রায় অতল সেইখানে মাটির কাছাকাছি এখনো আসনবদ্ধ দু'টিদেহ কিন্তু আমার ধারালো স্রোতে তুফানীকে ছাড়িয়ে নেবো কিছুক্ষণেই যেন ওর অভিমানী ফোলা ঠোঁটজোড়া চুলগুলো এবং ডাগর ডাগর সারাটা শরীর আমার হৃদয়ের পরতে পরতে দল মেলতে পারে তরতাজা গোলাপের মতো, আমি জানি কেউ বলবে না তুফানীর কথা, উচ্চারণ করবে না নাম ওর, ছবি ছাপা হবে না তরুণ সাংবাদিকের রোমাঞ্চকর গল্পের সংবাদপত্রের শেষের পাতায়। স্মরণ করবে না জিভে জিভে প্রশংসিত আধুনিক কবি ; কিন্তু তার জন্য থোড়াই কেয়ার, সভ্যতার থেকে বহু দূরে শস্য গাছগাছালি পাখির ডানার হলুদে সুজে এবং সাগরের টানে অনিঃশেষ নিরিবিলি স্রোতে যে নীরবতা, তাই ওর অমর জীবনচরিত।

আগস্ট, ১৯৭১।

সংক্ষিপ্ত শব্দ



আচমকা একটি শব্দ টররর। তারপর নীরবতা। ফাল্গুনী দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ঝিম ধরে থাকে অনেকক্ষণ। কেবল একটি চিল গোত্তা মেরে জলদি অদৃশ্য হয়ে যায় আসমানের নীলের ভিতরে।

তুফানে কাতহয়ে পড়া মাথাভাঙা আমগাছটার আড়ালে থেকে ছোটভাই নয়নের কাঁধটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছিল কাজল কিঞ্চিৎ ভয়ে ও চাপা উত্তেজনায়। সে কান পেতে থাকে। কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না। অবশ্য কিছুক্ষণেই দু'একটা ছোট পাখি ডাকলো ঝিক্‌ঝিক্ এবং আরো কিছুক্ষণ পরে ওর চিকনচাকন উৎসুক মুখটা সাবধানে একটু বাড়ালে দেখলো ধোঁয়াটে রঙের জীপটা বিশ্বরোড দিয়ে অতি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। ওরা বেরিয়ে এল, তারপর পা টিপে টিপে কাঁটাবন এড়িয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগুতে লাগল।

কি হয়েছে কাজলবু! ভেবাচাকা খেয়েছিলো, বোনের মাঘেভেজা মুখের উপরে কোমলতার ছাপ দেখে শুধাল নয়ন।

চুপ! রহস্যের ভঙ্গিতে, ডানহাতের তর্জনিটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে কাজল ফিস্ ফিস্ করে বললো, কথা বলিসনে।

আর কিছু বললো না কেউ। দু'জনেই চুপ। কখনো সোজা হয়ে হাঁটে উঁচু হয়ে চলে কখনো। তর্‌তর্ করে উপরে উঠে গেল একটি কাঠবেড়ালী জামগাছের ডালা বেয়ে ; ওদের নজরে পড়লো না। আধ-মাইল দূরে পলাশগাঁও থেকে কিছুটা মাঠ পেরিয়ে আসতে হয় উঁচু-নিচু মাটির উপরে জমকালো এই জঙ্গলে, এক লাইন গাছগাছড়া দিয়ে মহাসড়কের সঙ্গে যার যোগ। এদিকে একটি লোকও নেই, এখনও ওদিকে কেউ আছে কিনা দেখা যাচ্ছে না। থোকা থোকা আমের বোল ঝুঁকে আছে গাছে গাছে, হাওয়ায় তাদের মনমাতানো গন্ধ, আড়ালের অন্য ডালে মনে হয়, ফুটেছে কিছু বুনোফুল। রং তাদের হলদে শাদা কি লাল, কে জানে। অন্য সময় হলে আতিপাতি করে খুঁজতো, কোঁচড় ভরে তুলতো কিন্তু এখন বেখেয়াল। বনের কিনারে একটা ফাঁকা জায়গা থেকে কিছুক্ষণ আগে জীপটাকে যখন ক্ষিপ্রবেগে এদিকে আসতে দেখেছিলো তখন থেকে প্রায় দিশেহারা এবং তারপর ওই সংক্ষিপ্ত শব্দে বুকের ভিতরটা যে ঢিব্‌ঢিব্ করে উঠেছিলো তেমনি চলছে। যুদ্ধের সময়ে গ্রামের গাছ-গাছড়ার আড়াল থেকে কিংবা আরো এগিয়ে পাড়ার প্রান্তে এসে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখতো জীপ আসছে কিনা, যার মানেই মিলিটারী। আসতে দেখলে সাবধান হয়ে যেতো, দৌড়াতো কখনো। বড় ভাইয়া স্বপন তো, এই জঙ্গলে এম্‌বুশে হারিয়ে গেল। গ্রাম আক্রমণ করে খানসেনারা, সকলের সঙ্গে ওরাও পালিয়েছিলো। দু'সপ্তাহ পরে ফিরে এসে শুনলো সব, কয়েকজন বললো, জঙ্গলের ভিতরে যে দু'টো পুকুর তার পারের কাছাকাছি বেলী ঝোপে ও শহীদ হয়েছিলো। সঙ্গীরা ওকে কবর দিয়েছে ওখানেই। চোখে ছানি পড়ে মা তো দেখতে পান না বহুদিন, তবু মাঝে মাঝে এসে এই কবর তিনি হাতড়ে হাতড়ে দেখেন। এর ভিতরেই যে তার যাদু ঘুমিয়ে আছে। গ্রামবাসীরা মিলে কবরটা বাঁধিয়েছে এবং লাগিয়েছে একটা পাথরের স্মৃতিফলক। ওদিকেই যাচ্ছে ওরা, কেবল একটু দক্ষিণে পাশ একটি। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

একটা শেয়াল বেরিয়ে আসচিলো বাঁ-দিক থেকে, ওদের দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর লেজ নেড়ে ছুটে পালালো।

নয়নকে আগলে ধরে একটা ভাঙা ইটের টুকরো খপ্ করে হাতে তুলে নিয়েছিল, সেটা ফেলে দিল। সামনের দিকে ঝুঁকেছিল। কাজল সজোরে টান দিয়ে একটা শুকনো ডাল ভাঙলো। এবার আরেকটু শব্দ। তারপর আবার নীরবতা। টিপ্‌টিপ্ ঝিপ্‌ঝিপ্ পোকা মাকড়ের নড়াচড়া এবং কিছু কিচির মিচির।

চুল ছেড়ে কাজল বাতাসের আগে উড়ে বেড়াত বনে বাদাড়ে, ছুটতো খরগোশীর মতো, কিন্তু এখন ষোড়শী। কত মানা, বাড়ির ভিতর থেকে আসতেই পারে না, আর যখন ও আসে, হাঁটে ধীর পায়ে। ভাইয়ার মৃত্যুর পর থেকে সকল গতি যেন থেমে গেছে। চারপাশের সবকিছু আস্তে আস্তে চলে। ইস কত দেরিতে ধরে আমের গুটি ফুল, কত দেরি। বিচি পুঁতলে মাস গড়িয়ে যায়, চারা গজায় না। চোখে না দেখলেও মা আগে চলাফেরা করতেন, বসে বসে কাজ করতেন, কিন্তু তখন থেকে যেন পাথরের মূর্তি, বিছানায়ই বসে থাকেন। শুধু মাঝে মাঝে তার ঠোঁটে বিড়বিড় ধ্বনি, কখনো বা ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠেন। বাপজানেরই হয়েছে যত ঠ্যাকা। শরীর দুর্বল তবু ধান্দায় ঘোরেন। প্রাইমারীর হেডটিচার, কিন্তু কত আর মাইনে পান। সংসার চালাবার জন্য সারাক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করেন। বুদ্ধি করে গত মরশুমে সবজি ক্ষেতটি না করলে কি যে দশা হত!

ছনের ছাওয়া ঘর, তার এক কোণে, জাবারের পিছনে অন্ধকারে, বাঁশ কেটে ব্যাংক বানিয়েছে। বাপ মাঝে মাঝে আদর করে যে পয়সা-কড়ি দেন, ওর মধ্যে জমিয়েছে।

ছমিরন বড় ভালো কামলী, অনেকদিন ধরে আছে, ওকে পান খাওয়ার পয়সা দিয়েছিল তাই না উচ্চবাচ্য করে না। অনেক মিছে কথাও বলে ওর জন্য, কাছে না থাকলেও বলে আছে, রান্নাঘরে কিংবা কুয়োতলায়। জঙ্গলে এলে বলে, ছাগলীটা বাঁধতে গেছে ঘাসক্ষেতে।

কেমন করে জানি কলজেটা বড় হয়ে গেছে ওর, সহজে ভয় পায় না। কখনো কখনো একলাও চলে আসে।

কিন্তু এখন ওর বড্ড ডর লাগছে কেন জানি দূর থেকে দেখেছিল জীপটা, থামলো, নামলো কয়েকজন লোক, কাকে যেন ধরে এনেছে। ওকে ঠেলে নিয়ে এল এদিকে, পর পর গাছের আড়াল পড়ায় আর দেখতে পায়নি। টরর একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ। তারপর, তারপর? চুপ, হঠাৎ থামলো ওরা দু'জন।

এদিকে কিছু ঝোপঝাড়, তারপর বহু প্রাচীন বটগাছটি। তার গোড়া থেকে একটি শব্দ ভেসে আসছে, গোঙানির মতো।

পা টিপে টিপি এগুতে থাকে কাজল।

নয়ন ওর বাঁ-হাতটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

একটু থেমে কাজল এলোচুল বাঁধলো এবং সস্তা চেকশাড়ির আঁচলটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল।

গোঙানির শব্দটা আরো স্পষ্ট হলে নয়না দাঁড়িয়ে বাধা দিল, বললো, যেয়ো না বুবু।

কাজল বললো, চুপ। আয়।

ওকে বাঁ হাতে ধরে এগিয়ে গেল। বটগাছের কাছে এসে, পিছনে, বড় বড় শিকড় ঘুরে ওদিকে যেতেই চক্ষুস্থির, রক্তাক্ত জামা-কাপড় নিয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে একটি যুবক।

নয়ন চিৎকার করে উঠলো। ওর মুখ চেপে ধরলো কাজল।

পিছমোড়া দিয়ে যুবকটির হাত বাঁধা, সে কাত হয়ে পড়েছে একটি শিকড়ের কাছে, লম্বা লম্বা এলোমেলো চুল। পরনে ট্রাউজার, গায়ে বড় কলার দামী চেকশার্ট, পায়ে সুমুখ থ্যাবড়া হাইহিল ব্রাউন জুতো। একেকবার থর থর করে কাঁপচিলো কাজলের পা জোড়া, কিন্তু সে ভেঙে পড়লো না, অতি কষ্টে শক্ত থাকলো।

ওই যে একটু নড়লো যেন, এখনো প্রাণ আছে ওর। আস্তে করে দু'পা এগিয়ে গেল কাজল। স্থির তাকিয়ে রইলো। স্বপন কেমন করে মরেছিলো জানে না, ওরা কেউ দেখতে পায়নি। এ যেন এক অদৃশ্য চম্বুকের আকর্ষণ। টানছে, টানছে। সে আরো দুই পা এগুলো। এবারে যুবকের পা-জোড়া সোজা হচ্ছে, মাটির উপরে কাত হয়ে থাকা মাথাটাও সোজা হলো। আর কিছু নয়, এরপর বেশি নড়তে পারছে না। ওর বুকের দিকটা একরাশ গুলী খেয়ে ঝাঁঝরা লাল, রক্তজমাট। যেন ঝাপসা চোখ, ভিতরে ঢুকে গেছে পুতুলি, তবু ওদিকে তাকিয়ে দেখছে। সামনে কারা দাঁড়িয়ে? হ্যাঁ সত্যিই যেন দেখছে, ও নইলে অমন স্থির কেন চাহনি।

দুই কোটরের ভিতর থেকে একরাশ অশ্রু গড়িয়ে এসে ঝরে পড়লো। ঠোঁটজোড়া নড়ছে ওর। যেন চেষ্টা করছে, কিন্তু শব্দ বেরুচ্ছে না। তারপর অনেক কষ্টে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ উচ্চারণ করলো, পা-নি!

সঙ্গে সঙ্গে নিচে পড়ে-থাকা বাঁ হাতটা অনেক কষ্টে তুললো, বাড়িয়ে দিল একটুখানি। সোনালী ব্যান্ডে একটি দামী নতুন ঘড়ি। এবং একটি সোনার আংটি, নীলপাথর বসানো।

কিন্তু সে এক মুহূর্তমাত্র, কি ভাবলো কাজল, তারপর একটানে শাড়ির আঁচল থেকে কাপড় ছিড়ে নিলো। ভাইকে বলল, দৌড়ে যা, পুকুর থেকে ভিজিয়ে নিয়ে আয় ওটা!

ভয়ডরের কিছু মনে নেই, কাপড়টা পেয়েই নয়ন ছুট দিল। বারো বছরের ছেলে, কিন্তু বুদ্ধি আরো পাকা।

কথা বলতে পারছে না যুবক, একটা হাত নেড়ে ইশারা করলো। ও এখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাছে গিয়ে উঁচু হয়ে বসতেই বাঁ-হাতটা তুলে দিল ওর কোলের উপরে। ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো আংটি, সোনালি ঘড়ি।

ঘড়ি ধরলো, আংটি ছুঁলো না কাজল। একটু ঘুরে মাটি লেপটে বসলো এবং কোলের উপরে যুবকের মাথাটা তুলে নিলো।

ঝুঁকে দেখছে তার রক্তহীন, বিবর্ণ মুখটা, সে যেন নিচের থেকে অপলক তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

নাকের কাছে হাতের পাতা ধরে পরখ করলো, নিঃশ্বাস যেন পড়ছে না। ঘড়ির কাছে নাড়ি ধরে দেখে তাও স্থির।

দারুণ হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে এসে দাঁড়ালো নয়ন। হাতের ভেজা গুটানো কাপড়ের পুটুলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে টপ্‌টপ্।

কাজল জলদি করে ওর হাত থেকে টেনে নিল পুটুলিটা, তারপর কাপড়টা চিপে পানির ধারা ফেললো মুখের উপর। মুখ বুজানো ছিলো, দু'ধার দিয়ে পানি পড়ে যায় গড়িয়ে গড়িয়ে।

হেই! কাজল ওর উরু নাড়া দিয়ে বললো, একটু কথা বলুন।

কিন্তু নড়লো না যুবকের ঠোঁট, চোখজোড়া তেমনি স্থির হয়ে আছে। নয়ন কাছে এসে কেন যেন ডাকলো, বুবু।

মনে গেছে! কাজল বললো—ক্ষীণ স্বরে, সে কেঁদে উঠবে কিনা বুঝতে পারছে না!

নয়ন ওর পেটের কাছে খোঁচা মারলো আঙুলে, ও তাকালে আস্তে করে বললো, বুবু। ল্যাংড়া আসছে!

ল্যাংড়া! ঝট্ করে কোলের উপর থেকে কাজল নাবিয়ে দিল যুবকের মাথাটা, পাংশুমুখে বলল কই?

ভাইয়ার কবরের কাছে বসে বিড়ি ফুঁকছিলো, আমাকে দেখেই উঠে পড়লো। নয়ন বললো, দেখলাম এদিকে আসছে।

লোকটা বিচ্ছিরি সরীসৃপের মতো। চোখজোড়া ওর আগুনের মতো জ্বলে। হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, হাতে ঝক্‌ঝকে ধারালো দা, জঙ্গলে লাকড়ি কাটে, সাধারণত শুকনো ডালপালা। প্রায়ই আসে, এখানে এলে কোথাও কোথাও ওর কোপানোর ঠক্‌ঠক্ শব্দ শোনা যায়। মাগো, কেমন করে তাকায়, যেন কচ্‌কচ্ করে চিবিয়ে খাবে। মুলোর মতো লালচে দাঁত বার করে প্যাক্‌প্যাক্ হাসে অনর্থক। একদিন একলা পেয়ে ওর পিছু নিয়েছিল, ও দৌড়ে পালিয়ে আসে, একদমে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি।

জলদি, যুবকের হাতটা ঝুলছিল বুকের কাছে দিয়ে, আঙুল থেকে আংটিটা খুলতে দেরি হলো না, কিন্তু ঘড়ির বাঁধন কঠিন!

তবু শেষের একটি চাপে খুলে গেল, বাঁ হাতের মুঠোর ভিতরে ধরে আঁচলের আড়াল দিয়ে ছুটবার ভাও করলো। এক-পা বাড়িয়েছে, এমনি কাছে চাপা জান্তব হাসি। কখন এসে পড়েছে, একটা শিকড়ের উপর থেকে ল্যাংড়া ঝাঁপিয়ে পড়লো কাজলের উপর। একটা অস্ফুট চিৎকার।

কাজল অনেক বেশি চঞ্চল, গতিময়।

তবু ওর একটা হাত ধরে ফেলল! নয়ন তৎপর হয়ে উঠেছে, যে শুকনো ডালটা এনেছিল তাই দিয়ে একটা বাড়ি মারলো তার ঘাড়ের উপর।

কাজলও কামড়ে দিল হাত।

ল্যাংড়ার আক্রমণ বানচাল করে দিয়ে দু'জনেই ছুট দিল আবার। ল্যাংড়াও উঠলো, সে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াচ্ছে ওদের পিছু-পিছু। একটা গাছের আড়ালে দুইজন, ল্যাংড়া ধাও মারে, সে দিক থেকে ওরা চলে যায় বিপরীত দিকে। এমনি সময় একটা শিকড়ে উসটা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ল্যাংড়া, তাই না দেখে ওরা দু'জন দ্বিগুণ বেগে ছুট দিল।

কিন্তু ল্যাংড়া উঠতে দেরি করলো না, সেও ছুটছে। যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো।

ছুটছে, ওরাও ছুটছে, এবার দেখলো সামনে রাস্তা নেই, ঘন জঙ্গলে দেওয়াল। কাজল দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর বাঁ-হাত থেকে নিয়ে ডান হাতে সজোরে ছুঁড়ে মারলো হাতঘড়িটা কিছু দূরে তার মুখ লক্ষ্য করে।

ঢিল লাগলো, গালটা চেপে ধরে বসে পড়লো ল্যাংড়া এবং পরক্ষণেই বালুর উপরে ঘড়িটা খুঁজতে লাগলো।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ওরা দেখছে, ঘড়িটা হঠাৎ দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে খাবলে তুলে নিল। বুকের কাছে ওটা দু'হাতে চেপে ধরে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। রোদে ঘামে জবজবে তামাটে শরীর, ওর চোখে-মুখে খুশির ছাপ। নয়ন থুথু ফেললো। প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে চললো কাজল ওকে আগলে ধরে।

এখন জঙ্গলের পথে ছুটোছুটি, দাপাদাপি নেই, এবং আরো একটু বেশি নীরবতা। ছোট ছোট পাখি উড়ছে। কিচিমিচি, সংক্ষিপ্ত শব্দ। সোনালী ঘড়িটা লুঙির গাঁটের ভিতরে কোমরে লুকিয়ে ভালোমতো গুঁজে নিয়েছে। এদিকে ওদিক তাকাবার পর গাছের নিচে একটু জিরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার এল যুবকের কাছে।

হঠাৎ কি মনে করে তৎপর হয়ে উঠলো ল্যাংড়া, বটগাছের শিকড়ের কাছ থেকে ঝকঝকে দা'টা বার করে আনলো। তারপর তাড়াতাড়ি, আশেপাশের গাছগাছড়া থেকে কেটে জড়ো করলো কাঁচা ডালপালা। দুটি লতা জোগাড় করে এনে আঁটি বাঁধবার জন্য জাঁক দিয়ে রাখলো সব। সে চাপা নিঃশ্বাস ফেলছে, এবং ঘামছে খুবই।

দা হাতে নিয়েই গেল যুবকের লাশটির কাছে, উঁচু হয়ে কিছুক্ষণ পরখ করলো।

গায়ের শার্টটা দামী বটে কিন্তু ঝাঁজরা হয়ে গেছে গুলীতে এবং রক্ত ভরে জাবড়া হয়ে আছে।

ফুল ট্রাউজারটা কিন্তু অটুট, মনে হয় ভাঁজও ভাঙেনি। এদিক-ওদিক তাকালো ল্যাংড়া, দাঁড়িয়ে দেখলো দূরে ফাঁক-ফোকড়া দিয়ে। ও দুটি পাজির পা ঝাড়া, ফিরে আসতে পারে ক'জন সঙ্গে নিয়ে। সুতরাং সময় নষ্ট করলে চলবে না।

সে কাজে লেগে গেল! মোটা সাইজের চামড়ার বেল্ট ছিলো, ওটা খুললো, এবং বোতামগুলো। কিন্তু খেয়াল করে দেখে, আগে হাতা খোলা দরকার। তাই করলো।

তারপর শিগগির ট্রাউজারটা টেনে খোলবার পর জুতোজোড়াটা পেঁচিয়ে নিল তা দিয়ে, এবং পোটলাটা মাঝখানে রেখে লাকড়ির মোটা মোটা একটি আঁটি বেঁধে ফেললো।

এতবড় বোঝাটা একলা তুলতে খুব কষ্ট তবু দমলো না। মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে প্রাণপণে সেটা টেনে তুললো মাথায়, এবং একবার মাত্র পিছন তাকিয়ে চলতে শুরু করলো। সে যাবে বিপথে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে। পিছন-পিছন যদি কেউ আসেও বুঝতে পারবে না গেছে কোন্ দিকে। বিপরীত দিক থেকে শেয়ালটা এগুতে লাগলো চুপি-চুপি।

ওরা দৌড়েই চলে গিয়েছিলো, গ্রামের ভিতরে, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে জলদি ফিরে এলো। টের পেয়ে পালিয়েছে শেয়াল, কিছু মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে।

শার্ট আছে গায়ে কিন্তু পরনে প্যান্ট নেই। একটি শাদা ভাঙিয়া, প্রশ্ন জাগলো, কিন্তু কিছু বললো না।

স্বপন! হেডটিচার নাসির আলী কাছে নিচু হয়ে যুবকের মুখটা দেখতে লাগলেন, বললেন, নাহ্, স্বপন আসবে কোত্থেকে?

স্বপন নয়, কিন্তু একদম স্বপনের মত চেহারা স্যার! ছাত্র মানিক বললো কাছে দাঁড়িয়ে।

হায়, কেমন মায়ের কলজের টুক্‌রো না জানি!

একটা সোনার বাতি নিভিয়ে দিল ওরা কারা!

আলী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সটান দাঁড়িয়ে বললেন, তাজা ফুলের মতো জোয়ান ছেলেরা সব মরে যাচ্ছে আয় খোদা, এ তোমার কি বিচার।

এইটুকু সংক্ষিপ্ত সংলাপ বাকি সবাই নীরব, একটা কালোছায়া নেমে এসেছে। সকলের মুখের উপরে। কাজলও দেখছে কাছে দাঁড়িয়ে, ওর চোখজোড়া ছল্‌ছল্।

এ লাশ নিয়ে কি করবে ওরা। এতক্ষণ ভাবেনি, কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। বেওয়ারিশ লাশ, পুলিশে খবর না দিলে হবে বেআইনী কাজ। বিরাট দায়িত্ব। কে তা বহন করবে, মৃত্যুর সময় স্বপনকে দেখতে পায়নি, কারা কবর দিয়েছিল তাও সঠিক জানেন না। আলী ভাবলেন, যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে একে দাফন করবেন। কিছু টাকা লাগবে, লাগুক। তবু একটু সান্ত্বনা পাবেন। আবার মনে হল, খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠানো যায় না? কেমন জানি ওর মা-বাপ, নিশ্চয় খোঁজ করবেন। বিকৃত ছবি থেকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবু প্রশ্ন তো জাগবে। যাদের ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি, খোঁজ করতে আসবে হয়তো তাদের কেউ কেউ। কিন্তু না, এ তো কল্পনা। দশ মাইল দূরে শহর, সেখানে যাওয়া এবং ফিরে আসা যে ঝক্‌কি হবে। কখন আসে কখন যায়, বাসের তো কোন নিয়ম নেই। বেবীট্যাক্সিও পাওয়া যাবে না এদিক থেকে। তার চেয়ে থানায় লোক পাঠালেই ভালো—মাইল পাঁচেকের দূরত্ব, তবু, হেঁটে গেলেও যে-কেউ ফিরতে পারবে বিকেল-বিকেল।

মানিক ও তার সঙ্গীদের গাঁয়ে পাঠিয়েছিল, ওরা একটা মই নিয়ে এলো। চারজনে চারদিকে ধরেছে, যুবকের লাশটিকে মইয়ের উপরে শুইয়ে দিয়ে ওরা নিয়ে এল পুকুরের ধারে।

আলী দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। একটা লাশ দাফন করার ঝামেলা অনেক। কাফন কিনতে হবে, গোসল করাতে হবে। তারপর কাফন পরানো, জানাজা। কবর খোঁড়া, মাটি দেওয়া।

উনিই আবার মুখ খুললেন, মানিক তোরা থানায় যা-সঙ্গে করে পুলিশ নিয়ে আসবি।

গলায় রুমাল বাঁধতে বাঁধতে মানিক ওব সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে গেল। ওরা বসে থাকে। ততক্ষণে খবর হয়ে গেছে, দলে দলে লোক আসছে গ্রাম থেকে। ছেলেবুড়ো, নারীপুরুষ, একনজর দেখবার জন্য। আহা! ছেলেটা কি সুন্দর ছিলো!

পুকুরের পাড় ঘেঁষে জনতা, দু'চারজন করে এসে দেখছে, দু'একটি অনুচ্চ কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণে এক জায়গায় একটা জটলা পাকিয়ে উঠল। চোখে চশমা, পাঞ্জাবী-পায়জামা-পরা একজন লোককে ঘিরে ধরেছে অনেকজন।

শহরের ওয়াপদা অফিসের মাহতাব সরকার, দু'দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছেন।

রুমালে গলার ঘাম মুছে ছোট করে উনি বললেন, কি কারণে কারা মেরে ফেলে গেছে আমরা তার কিছু জানি না।

এইটুকু কথা, আর কেউ কিছু বললো না। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, একটা আতংক নীরব ছায়ার মতো ছড়িয়ে পড়ল। যারা এখনো দ্যাখেনি, তাদের অনেকে কাছে এল না। একজন দু'জন করে সরে পড়তে লাগল। প্রত্যেকেরই কাজ আছে, গ্রামে ফিরছে ওরা। খালি হতে লাগল, ক্রমে জায়গাটা খালি হয়ে গেল।

সূর্য ডুবছে, গ্রামের উপরের আসমান জুড়ে লাল আবির ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। মৃত যুবকের কাছে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন আলী, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস। তন্ময় হয়েছিলেন। কাছ ঘেঁষে বসল কাজল, আস্তে করে বলল, বাবা। সবাই চলে গেছে।

হ্যাঁ কি বলছিস? তন্দ্রার ভিতর থেকে যেন জেগে উঠলেন আলী, ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তাইতো মানিকরা ফিরে আসেনি?

না। আস্তে করে বললো কাজল-এক্ষুণি আঁধার হয়ে আসবে যে চারিদিকট।

চল বাড়ি যাই বাবা।

তাইতো, উঠে দাঁড়ালেন আলী, বললেন, আমরা আর বসে থেকে কি করবো।

মেয়ের কাঁধ ধরে, ছাতাটি বগলদাবা করে চলতে লাগলেন। একটু দাঁড়ালেন স্বপনের কবরের কাছে। আবার চললেন। পশ্চিমমুখো ওরা, কাজলের চোখে মুখে গোধূলির রং। চাঁপাকলির মত হাতের আঙুলে চিক্‌চিক্ করে উঠল কি একটা। চোখে পড়লে আলী মেয়ের হাতটি তুলে ধরলেন, দেখবার চেষ্টা করে শুধালেন, এটা কিরে কাজল?

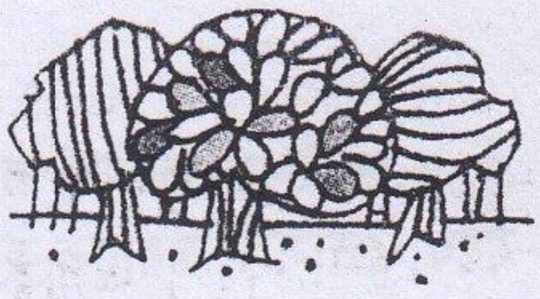
কাজল হাতের আঙুলটা বাপের চোখের কাছে তুলে ধরলো এবং দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, সোনার আংটি-ছেলেটির হাতে ছিল।

চুপ মেরে গেলেন আলী, মেয়ের হাতটা ছেড়ে দিলেন। তারপর আবার চলতে লাগলেন মাথা গুঁজে। কিছুদূর যেতেই দাঁড়ালেন হঠাৎ । চাপা আবেগের সঙ্গে বললেন, চল্ ওকে নিয়ে আসি কাজল। ওকে কাঁধে বইবার মত জোর আছে আমার।

চল না! উচ্চারণ করল কাজল, কিন্তু কেউ এগুলো না। স্থির দণ্ডায়মান দু'জনে কেবল তাকিয়ে রইল জঙ্গলের দিকে। তখন একপাল শেয়ালের মত্ত রবে ওই জায়গাটা মুখর হয়ে উঠেছে।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।

নাকফুল



অঘটন তো কতই ঘটে রোজ রোজ রাস্তাঘাটে গলিঘুপচিতে ঘরের ভিতরে এবং মারাত্মক দুর্ঘটনাও, যার একটা রূপ আছে, প্রতিকারও আছে, কিন্তু যা অঘটন নয় কোনো দুর্ঘটনাও নয় তাকে নিয়ে কি করা যায়।

হ্যাঁ, তাকে নিয়ে শুধু জ্বালা, শুধু যন্ত্রণা। কেবল এইতো, দেখা যাচ্ছে। একগাদা লোহালক্কড়ের মাঝখানে ঠেকিয়ে রাখা হাতলভাঙা চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে মুখ উঁচিয়ে দূরে থুথু ফেলল। এতরাত হয়ে গেল, চোখের ধারে কাছেও ঘুম আসছে না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, একি উৎপাত। বিশেষত, নাকফুলটা যত গন্ডগোলের মূল।

হয়তো নসিবেরই ফের, নইলে মনে প্রাণে যা সে চায় না তাই এসে ঝপ্ করে চেপে বসবে কেন ঘাড়ের ওপরে।

ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ, দিনটা ভালোই শুরু হয়েছিল। নিকটবর্তী গাছগুলোতে পাখির কিচিরমিচির কলকাকলি শুনতে শুনতে, তারপর সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে, সন্ধ্যেটাও, পশ্চিম আসমানে সোনার লেখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেমে এসেছিল। কিছুক্ষণেই অরণ্যশীর্ষে হালকা মেঘের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ এবং আবছায়া অন্ধকার।

ঝাপসা লালচে হেডলাইটে আলো ফেলে, মাঝে মাঝে হর্ন বাজিয়ে ঝকর্ ঝকর্ করতে করতে এগিয়ে চলছিল ভাঙাচোরা কারখানার যত আদ্দিকালের পুরাতন শেভরোলেটটা, ঝাউবনের কাছে আসতেই ওধারে একটা নারী কণ্ঠস্বর। পরক্ষণে, আচমকা চিৎকার। গাড়ির গতি কমালো, কিন্তু গাড়ি থামালো না।

বেরেক কষো ওস্তাদ বেরেক। ওদিকে হনুতাছ না? কিয়ের যেন আলামত ওই যেন হুনো—'

কাজ করার তেলচিটচিটে ভারি পোশাক পরনে, রুছমতের চোখা চোখ-জোড়া জ্বলে উঠলো মিটারের আভায়, কপালটা কুঁচকে গেল। কিন্তু মনের ভাবটা চেপে গিয়ে বলল, হুনতাছি তো—

আহ, থামাও না সঙ্গী মেকানিক ফেরদৌস ওর জামার হাতায় ধরে ফেলে, বলল মনে অয় ঐ হানে কিছু একটা ঘটতাছে সাঙাৎ।

রাস্তার এক পাশে নিয়ে থামালে ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা। চ্যাংড়া সাথীর চোখে চোখ রেখে বলল রুছমত, বুঝলাম তো। আমরা কি করুম? তর কাছে অস্ত্র আছে?

নেই তো সত্য। না পিস্তল, না বন্দুক, না স্টেনগান। সুতরাং দু'জনে নীরব। ওদিকে আবারো শব্দ। ঘন নিঃশ্বাস ও গোঙানি।

পার্কিং লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে, বাইরে নেমে দরোজা ধরে দাঁড়ালো ব্যাপারটা ঠিকমত ঠাওড়াবার জন্যে।

নামবার সময় হাতের পাঁচ হিশেবে জাগটা খুলে এনেছে ফেরদৌস, আর রুছমতের হাতে একটি লম্বা টর্চ, রাতে ওর সব সময়ের সাথী।

তৃতীয়ার খন্ডচাঁদ মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে, ঝিম্ ধরে জ্বলছে, এখন সময় সোয়া সাতটার মত। কিন্তু খুব একটা ট্রাফিক নেই; এখনো, সূর্যডোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, যদিও মৌচাকের মত জ্বলে দূরে এয়ারপোর্টের

আলোকমালা এবং প্যাসেঞ্জার বাস ঠিক সময়ে ছুটে চলে।

জঙ্গলের মত গাছগাছড়ার সারি রাস্তার কাছাকাছি, তার নিচে আবছা আঁধারের ঝিকিমিকি। এধার থেকে ওদিকে একটু এগিয়ে যেতেই দেখল একটা বেবী ট্যাক্সি উল্টে পড়ে আছে।

টর্চ মেরে দেখল ওটা রুছমত, লোক এসেছে দেখতে পেয়ে একটা মেয়ে ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে এদিকে ছুটে আসতে লাগল।

ওরা দাঁড়িয়ে থেকে। দূরে থাকতেই কাতরে উঠল মেয়েটা, বলতে থাকে এক নিঃশ্বাসে, ক্যাডা আপনেরা? আমারে বাঁচান। গুন্ডারা আমারে লইয়া যাইতাছে—

তার উপরে আলো ফেলে দেখবার আগেই একটানা দৌড়ে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, সামনাসামনি।

আহাহা—। রুছমত অপ্রস্তুত বলল, বলল কি কর—

কি আর করুম, কিছু না। মেয়েটা ওকে ছেড়ে দিয়ে বলর, ওই তোমার গাড়ি না? জলদি আও, আমি যাই।

এক মিনিটে আপনি থেকে তুমি আর এমন ব্যবহার, ওর তাজ্জব হয়ে দেখল একটানে গাড়ির দরোজাটা খুলে সিটে গিয়ে বসে পড়েছে। অর্ধেক নামানো পাশ-আয়নার উপরে মুখটা বাড়িয়ে ডাকল, জলদি আও। গুন্ডারা মারামারি করতাছে। আও, আমরা পালাই—

বেশ দূরে দেখা যাচ্ছে গাঁয়ের কাছাকাছি বিশাল খামার যার দক্ষিণ দিকে শুকনো খড়ে আগুন দিয়ে একদল লোক হৈ-চৈ করছে। অনেকটা জায়গা ফরসা, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে ফুলকি আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। জলদি পা চালিয়ে ওরা ফিরে এল, গাড়িতে মেয়েটা বিজয়িনীর মতো ফিক্ ফিক্ হাসছে, আর করছে বকর বকর। মনে হয়, লজ্জাশরম বলতে কোন জিনিশ জানা নেই ওর, বেগানা মরদ, তাদের সঙ্গে কিনা নির্বিবাদে ঢলাঢলি। মেজাজটা বিগড়ে যায় রুছমতের, তেছরা চোখে তাকায়। স্টার্ট দিতেই একবার থামাল, তাও ঘাড়ে হাত দিয়ে, কি দুঃসাহস। ফেরদৌসকে নেমে গিয়ে ওল্টানো বেবীর ভিতর থেকে তুলে আনতে হলো গোলাপ-আঁকা টিনের ছোট সুটকেসটি, যার ভিতরে ওর জিনিশপত্তর শাড়ি তেল সাবান নানা প্রসাধনী। ফাটা কপাল জোড়া লাগে না। এটাই বোধ হয় ঠিক। নইলে এই গাড়িটা কিনবার পর থেকে ভোগান্তির আর শষ হল না। ছোট্ট গ্যারেজ, দশ-দশটি বছরে বুকের রক্ত দিয়ে গড়া। মেহনত করতে করতে চেহারাটাই বদলে গেছে। পুরাতন যন্ত্রপাতির মত। টাকাপয়সা নয়, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য গ্রাহকদের অগাধ বিশ্বাসই পুঁজি, কিন্তু শুধু মেরামতের কাজ দিয়ে কি বড়ো হওয়া যায়? তাই কিনেছিলো এই শেভটা, যার জন্য রীতিমত মগজ খাটাতো হয়েছে, করতে হয়েছে নিপুণ পরিকল্পনা। খান এ্যাণ্ড কোম্পানির মাইক্রোবাসটা পেরত দিতে গিয়ে নজরে পড়ে, আটান্নর ডিলাক্স মডেল, অনেক জায়গায় তুবড়ে গেছে। তবু দেখলে মনে হয় ট্রাঙ্ক রোডে ছুটে যাওয়ার জন্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে। ভিতরে ইঞ্জিনের পুরোটাই আছে, তার বেশি আর কি দরকার। ওর ভালো লাগল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, দরদস্তুর করার সময় সাহেবকে বলল লোহা লক্কড়ের বাতিল আর্বজনাস্তূপটা বখশিস হিশেবেই নিয়ে যাচ্ছে। তবু দিয়েছিল একেবারে কম না— সাড়ে চার হাজার টাকা। চালাতে না পারলে সবটাই গচ্চা, তবু এটাকে চ্যালেঞ্জ হিশেবে নিয়েছে। তার কারিগরী দক্ষতার পরীক্ষা হোক। দিনরাত খাটাখুটি করে হাজার দুয়েক টাকার পার্টস লাগিয়ে এতদিনে রাস্তায় নামাতে পেরেছে এটা কম বড় সাফল্য নয়। ভালো ডেনটিং-এর পরে রং করলে মনে হবে ঝকঝকে নতুন গাড়ি। তারপর নয়ারহাটের রাস্তায় ছেড়ে দেবে

ট্যাক্সি করে তখন সুদিন আসতে কতক্ষণ।

কিন্তু বিপদ যেন কেটেও কাটছে না; শহরে গাড়ির পার্টস চুরিচামারির ব্যাপারে তার গ্যারেজের ওপরে নজর আছে পুলিশের। —আজকে এমন একটা মেয়েমানুষ এসে চড়ে বসল, এটাও দুর্লক্ষণ নিশ্চয়ই।

বিজলি চমকের মত হিহি করে হেসে উঠল মেয়েটা, রুহুমতের চুলে নাড়া দিয়ে বলল, কি মজা! মারামারি কইরা মরুক বদমাইশরা কিন্তুক ফুলজানরে আর পাইব না।

হঠাৎ চমকে ওঠে রুহুমত, একসিলেটরে থেমে যায় পা, মনে হল স্টিয়ারিং হুইলটা মোচড় খেয়ে উঠেছে। ফুলজান, ফুলজান! কেন এ নাম।

কি ভাবছিল ফেরদৌস, কথাটা কানে যেতেই শুধাল, তুমার নাম বুঝি ফুলজান?

হ ফুলজানই তো? মুসাম্মৎ ফুলজান বানু। ডান হাতের দুই আঙুলে নাক টিপে ধরে তার, একটু ঘরিয়ে বলল, ক্যারে খুব খারাপ নাম নিহি?

না না। খারাপ অইবো ক্যান। খোব সোন্দর নাম। কি কও উস্তাদ, খোব সোন্দর না?

রুহুমত গম্ভীর ও নিরুত্তর। তার বুকের ভিতরে তোলপাড় হৃৎপিন্ডটা দ্রুত ঢিব্‌ঢিব্ করছে। একই নামে অনেক মানুষই তো থাকে দুনিয়াতে এ ক্ষেত্রে তা সত্য হবে নাকি? না, না। এ ফুলজান কি সেই ফুলজান? সেই ফুলজান সবুজ পল্লীতে যে ছিল তার কৈশোর সাথী, প্রথম যৌবনের স্বপ্ন। এক মুহূর্তে স্মৃতির জোয়ারে ভেসে যায় হাজারো ছবি, সিনেমার মতো কখনো শাদাকালো কখনো রঙিন। সচেতনভাবে, সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে। একটু দেখতেও ইচ্ছে হয় না। ঘাড় ফিরিয়ে। অন্ধের মত চোখ বুঁজে থেকে যদি মুক্তি পেত তাই হোত সবচেয়ে ভালো।

একটি হাসির সংসার। এই ফুলজান বলল, হ কাম করবার আগে হগলতেই তোয়াজ করে। কাম সারা অইয়া গেলে প্যাডে লাথথি। এই তো পুরুষলোক। যতসব বেঈমান—

তারপর আবোলতাবোল বকতে থাকে এই ফুলজান, অনর্গল এবড়োখেবড়ো শব্দমালা। ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ। একটা ডাহা পাগলী বৈকি। নিঃশব্দে ড্রাইভ করছে রুহুমত, তার মনের পর্দায় এখন কত ছবি, জাগছে ভাসছে আবার যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে। হ্যাঁ মাকাল। সুন্দরী মেয়েমাত্রই মাকাল ফল। বাইরে লোভনীয়, স্কিু ভিতরটা বেজায় খারাপ। দিনে দিনে কতই দেখেছে একটির পর একটি ঘটনা, সহজে ভোরা যায় না ভাবতে গেলে শির্‌শির্ করে গা, মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করে। আচানক, আচানক। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরিবিলি সংসার ছিল, রঙ্গার বৌ চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গেল, কেউ জানলো না। আর কুদরতের বেটি সরবতী? নটি, নটি। চার পোলার বাপ রাজ্জাক, তাকেই না হল ওর পছন্দ। এখানে জুটেছে আর একটা বলে কিনা বেঈমানী করেছিল, সেই আগের কাঁচা বয়সে। সে হতো যদি অন্য কেউ আর একজন!

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক থেকে গাছগাছড়ার বিতর দিয়ে গেলে কিছুদূরে পুরনো শাপলা পুকুর, পালেরা ফেলে গেছে; তার মধ্যে দুপুরের রৌদ্রে ডুব দিয়ে ওঠে কলসী কাঁখে নিলে মন্দ লাগছিলো না। দালাল খবির মিঞার সমঝদার দৃষ্টি এড়ালো না। দুধে-আলতা রং, হাঁটবার সময় ভারী সুগোল পাছার দোলন। কিন্তু আসল, সম্মুখে, টইটম্বুর সুগোল জোড়া জাম্বুরা যেন, খাটো শাড়ির আঁচলে ঢাকা পড়ছিলো না। তার ওপর, তেরছা চাউনি কালো পুতুলি থেকে যেন চোখাচোখা বান ছুটে গেল। এমনি হবে একটা কিছু নইলে সেই রাতেই এমন একটা আয়োজন হোত না, রাতের আঁধারে গুটি-গুটি এসে বলক দিল। টের পেয়েছিলো হাহাকার, চিৎকার। দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি। নীরবতার বুক চিরে ফটাফট গুলীর

আওয়াজ, ভোরবেলায় পাওয়া যায় অনেক রক্তাক্ত লোক। উঁচানো বেয়নেটের সামনে দিয়ে ছাউনিতে যেতে বাধ্য হয়, বাড়াবাড়ি করলে গ্রামকে গ্রাম দিত পুড়িয়ে। হু, ভালো অজুহাত। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আর কারে বলে। যদি তাই না হবে তবে বোন্দা বোন্দা কড়কড়ে নোট পেল কি করে। মেজর খুশি হয়েই দিয়েছি। আরেক ভাঁওতা, নাকি বিবি করে নিয়েছিল। যদি তাই হবে, শেষে ছুঁড়ে দিল কেন সেপাইদের কাছে? ওরা লুফে নিয়েছিল। জোয়ান জোয়ান শক্ত শক্ত মরদ। সারেন্ডারের সময় গেরিলারাও কিছু করলো না, তবু তো চাঙারি দিয়ে আনতে হয়েছিল। ঠোঁটগাল ছেঁড়া ছেঁড়া, চাকলা চাকলা বুক। তলপেটে রক্তজমাট। তবু নাকি নির্দোষ। বেহেশতের মেওয়া আর কি, ফেরেশতারা খেয়েছে। এমন কঠিন জান। মরলো না। শুয়ে শুয়ে তাজা হয়ে উঠল।

জোয়ানকীর জোয়ার বড় তেজী, মাগীদের গতরে বলৎকারের চিহ্ন মুছে ফেলে। তাতে কি। ফুলজান কি পবিত্র হয়ে গেছে?

হেই ড্রাইভার। আবার চমকে উঠল রুছমত, ভূত দেখছে নাতো? এই ফুলজান হাত বাড়িয়ে বলল সিগারেট।

দেশলাই বাক্সের ওপরে আঙুলে টিপে ধরা একটা শাদাশলা, স্টিয়ারিং সামলাতে সামলাতে খেঁকিয়ে উঠল রুছমত, শাটআপ।

বড় বড় সাযেবদের কাজ করতে করতে কিছু শিখে ফেরেছে ইংরাজি, ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসে।

বাব্‌বাহ। তেজ কত! ওর হাত থেকে সিগারেটটা টেনে নিল ফেরদৌস, খচ করে কাঠি জ্বেলে ধরালো। মুখভার করে বসে থাকে মেয়েটা, তারপর বলল, দুই আজার ট্যাহা দিয়া আমারে কিনছিল লোকটা, আমারে অত ফ্যালনা মনে কইরো না।

একি কণ্ঠস্বর! এখনো কিছু রেশ আছে যেন পুরাতন। রীতিমত সর্বনাশ! সর্বনাশ, যদি এই ফুলজান তার ফুরজান হয়। এখনই সময়। হঠাৎ ব্রেক কষে থামালো গাড়িটা রুছমত। তারপর স্টিয়ারিং হুইলে আলতোভাবে হাত রেখে আদেশ করল নামো!

অপ্রস্তুত মেয়েটা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল— বাঁ পাশ দিয়ে একটা পথ চলে গেছে পল্লীর দিকে এবং সামনে কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে, একসারি বাঁশের ছাপরা। নেভাস্বরে বলল, এইহানে নাইম্যা কই যাইবাম আমি—

বুঝবার পারতাছ না? যাইবা জাহান্নামে। রুছমত ঝাপসা উইন্ড স্ক্রীন দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে, আবার হুকুম করল, নাইম্যা পড় জলদি। আমার অনেক কাম আছে।

হঠাৎ যেন রক্ত চড়ে গেছে, মাথা নাড়া দিয়ে বলল মেয়েটি, আমি নামতাম না। তোমার লগে যাইবাম—। ক্যারে আমারে পছন্দ অয়নাগো? দ্যাহ, চাইয়া দ্যাহ একবার। না, ভুক লাগছে খুব, লও যাই ঘরে গিয়া প্যাড ভইরা খাওয়ামনে—

আশ্চর্য ধৃষ্টতা ছোঁট কাঁপল শুধু, কোন কথাই বেরুল না মুখে। গালভরা চাপদাঁড়ি, রুছমতকে দেখাচ্ছে ঠিক একজন মুক্তিযোদ্ধার মত। অথচ মুক্তিযেদ্ধের সময়ে তার মুখটা পরিষ্কার ছিল। এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না, কানে ভোঁ ভোঁ করছিল। বিশেষত বেহায়া আওরতের ছিনালি হাসিটা অসহ্য। আড়চোখে একটু দেখেছে, নাকে একটা নাকফুলও আছে!

তখন পা'য়ের একটা জোর চাপে টপ গিয়ারে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালাতে লাগল, যেন তাকে নিশিতে পেয়েছে। এখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে মন্দ হয় না, রাস্তার ধারের খাদে হুড়মুড় করে উল্টে পড়ে এক নিমেষে খতম।

কিন্তু আস্তে আস্তে গতি কমে গেল, এবং অবশেষে ঝকর ঝকর করতে করতে কাঁচা পথে গ্যারেজরে ভিতরে ঢুকলে তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে নেমে পড়ে এই ফুলজান, সে নিচু হয়ে জুতো পায়ে দিল। সিটে বসে রুছমত হাঁপাচ্ছিল। এইবার সে তাকালো ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে। ওপর থেকে আলো এসে পড়েছে। হ্যাঁ, তার ফুলজানের মতোই তো লাগছে, এখন যা একটু মোটাতাজা, এত বছরে তা স্বাভাবিক বৈকি। কিন্তু তেমনি সুন্দর মুখ, কাটা চেহারা, কোমর ইস্তক নেমে এসেছে ঝাঁকড়া কালো চুল। আগের চেয়েও ভরপুর ওঁচানো বুক। সবচেয়ে মারাত্মক নাকফুল। সে থ মেরে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মোছে, দেশলাইটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকে সিগারেট ধরাবার জন্যে।

অদ্ভুত কান্ড, যেন নিজের আস্তানা, চ্যাংড়াকে শুধিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল ফুলজান। ঘর মানে একচালা, উপরে টিন। চারপাশে তরজার বেড়া। তার কাছে একটা বড় শেড; তাতে পাঁচ ছ'টি গাড়ি এখনো মওজুদ। লোহালক্কর ফেলে রাখা— পুরাতন ইঞ্জিন, মাডগার্ড, একটা দুমড়ানো বডিও রয়েছে। একশ' পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে, একটা ঠুনির মধো আটকানো। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় ছুটি আর তক্ষুণি বেরিয়ে যায় সব কারিগর। থাকে শুধু চ্যাংড়া ফেরদৌস, চব্বিশ ঘন্টার হেলপার। একটি কড়াই আর ডেগচি, পাতিলের মধ্যে সেই রান্না করে, সস্তা কাঠের ছোটো একটা মিটসেফ আছে, তার ভিতরে কয়েকটি বাসনবাটি কাগজের পোটলা পুটলি।

অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল, ঘরের ভিতরে; গোলাপ আঁকা টিনের সুটকেস হাতে নিয়ে ফেরদৌস ওকে ভিতরে আনতেই, ফুলজান চৌকির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

নিজের উপরে রীতিমত ঘেন্না ধরে গেছে, রুছমত গাড়ির ভিতরে বসে থেকে সিগারেট টানছে চুপচাপ।

শুয়ে থেকে চোখ বুঁজে ফুলজান বিড়বিড় করে কি বলল আর তক্ষুণি ফেরদৌস বাক্সটা খুলে এগিয়ে দিল নীল রঙের একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ। সত্যিই বেজায় ক্লান্ত; ফুলজান বলল, নাহ আর পারতাছি না।

কি অইছে? ফেরদৌস জিগগেস করল।

পায়ের গোছাডা কামড়াইতাছে, ক্যাডা আর টিইপ্যা দিব।

ফেরদৌস সাগ্রহে বলল, আমি দেই?

না থাক্। ফুলজান বলল, ডেরাইভার সাব রাগ করবো যে। যা চামার লোকটা। তুই বাইরে যা, আমি কাপড় বদলাইয়াম।

এক পা দু'পা করে ফিরে যেতে যেতে ফেরদৌস দরজার কাছে হঠাৎ থামল, চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে কৌতূহল।

চৌকি থেকে নেমে তখন নিচে দাঁড়িয়েছে ফুরজান, পরনের কাপড়টা খুলে রেখেছে। ব্যবহারী শাড়িটা চৌকির উপর থেকে তুলে নেয়ার আগে বুকের কাছে জামার টিপবোতাম খোলে পটাপট।

ফেরদৌস এক নজর তাকিয়ে দেখল, চোখ আঁধার হয়ে এল। দুনিয়াটা যেন ঘুরতে লাগল মাথার ভিতরে, বাঁশের খুঁটিতে ধরে টাল সামলে সে বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক দিলে ফেরদৌস আবার ভেতরে যায়, হুকুম পেয়ে জ্বালায় কেরোসিনের চুলোটা এবং রান্নার জিনিশপত্রও এগিয়ে দিতে লাগলো।

এহেবারে চাষা। গজ্‌গজ্ করে বলল ফুলজান, জিমুন ব্যবহার তেমন আয়োজন। বইচাবীরান আর মইচপুড়া। পুরুষ মাইনয়ের জান বাঁচব ক্যামনে। বাজার করে না বুঝি।

ব্যস্ত হয়ে ফেরদৌস বলল, না, না করে। করে রোজই। আমি বাজার করি, আজগা যাইতাম পারি নাই। কাম আছিল বেশি।

আচ্ছা তুই ক তো আমি তারে কি করছি? ফুলজান ভাতের পাতিলটা চাপিয়ে বলল, জিমুন গাল ফুলাইয়া বইয়া রইচে! ঘরে আইয়ুকনা দেহাইমুনে।

কি দেহাইবো? কিট্‌কিট্‌ হেসে ওঠে ফেরদৌস। জিগগেস করল, ভালাজিনিশ না দেহাইলে আরো রাগ করবো।

ফেরদৌস যে একটা কারাপ ইংগিত করেছে, তা বুঝলেও ফুরজান চুপ হয়ে কাজ করছে, কি উত্তর দিবে বুঝতে পারলো না.। কেমন করে ওস্তাদ এই ঘরে আসবে তা সাঙাতের মাথায়ও ঢুকছিলো না। এযে ভীষণ তাজ্জব, স্বাভাবিক মানুষের চিন্তারও বাইরে। ওদিকে ভাঙা চেয়ারটায় জান ছেড়ে বসে রুছমত আকাশ-পাতাল ভাবছিল। বিচ্ছিরি অবস্থা। সব লক্ষণই মিলে গেছে, বিশেষ কে রবিয়ের আগেই উপহার দেওয়া নাকফুলটা যখন চিনতে পারল তখন বুঝছে এ তার ফুলজান ছাড়া আর কেউ নয়। মনের পোড়ামাটির তলে সব পুঁতে ফেলেছিল, এখন মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে সব দৃশ্য, সব বেদনা। রূপবান ফুরজান হয়ে গেল বীরাঙ্গনা ফুরজান। শাদীর তারিখ পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল, পৌষালি ফসল তোলার অপেক্ষায় না থেকে যদি শুভকাজটা শেষ করে ফেলত তাহলে হয়তো এমন গোরমালে জড়িয়ে পড়তে হত না। গুলীর মুখে দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করত ঠিকই কিন্তু দূরবর্তী নিরাপদ পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার ইচ্ছেও জাগত। চতুর্দশী ফুলজান, তবু কি আর অসুবিধে হতো। তল্লাটের কত পরিবারই তো ওদিকে গেছে, হাঁড়িপাতিল কাঁথার বোচকা গরুছাগল নিয়ে আড়িয়াল খাঁ পেরিয়ে। কপালের লিখন কেউ মুছতে পারে না। একথাই ঠিক। ফুলজানকে ধরে নিয়েছল। ফুলজানকে হত্যা করেনি, সে ওদের দয়া। হত্যা করলেই ভালো ছিল। যখন ফিরে এল ময়লা রক্তাক্ত কাপড়ে টলতে টলতে তখন তাকে একবার দেখতেও ইচ্ছে হয়নি, বরং গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেকি ছিল কাপুরুষতা? না, তা কেন। কয়েকটা দুশমনকে খতম করতে পারে, কিংবা নিজেও হতে পারে তাদের শিকার, কিন্তু, একটা ধর্ষিতা ময়েকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে নাতো। কোনো মায়েদের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সমাজের চোখে হবে ঘৃণ্য, জীবনের কাচে লাঞ্ছিত। আর বিয়ে-শাদীর মানে কি। বংশধর, আওলাদ। নষ্টা মেয়ের পরিচয়ে কেমন করে বেড়ে উঠবে ছেলেমেয়েরা, কেমন করে বাঁচবে। দূরে গেলেও ওখানে গিয়ে কেউ কেউ বুঝিয়েছিল কিন্তু চেচিয়ে উঠে প্রতিবাদ করেছে। ভালোই হয়েছিল যে, ফুলজানের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে গেল।

নিজের মধ্যে ডুবে ছিল, হঠাৎ চোখ খুলতে দেখে মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ির কাছে, হাত নাড়ালে রেশমী চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ।

কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, ডেরাইভার সাব ঘুমাইয়া গ্যাছেন? রান্না হইয়া গ্যাছে গা, উডেন না একটু। খাইবেন না? আইয়েন জলদি।

মাথাটা একটু সোজা, তবু চুপ মেরে থাকে রুছমত ঃ তার মনে হয়, এই মেয়েটার শরীরে ফুলজান আছে। গলার আওয়াজে সেই কিশোরী -যৌবনা কণ্ঠস্বরের দূরবর্তী রেশ। আড়চোখে একবার তাকিয়ে চুপ হয়ে থাকে রুছমত। সে বোবা হয়ে গেছে। ও চলে গেলে আপন মনে বিড়বিড় করে, আচ্ছা গ্যাড়াকল—

এই শব্দটা শিখেছিল কলকাতা ফেরত ইসমাইল মিস্ত্রির কাছ থেকে, যে চটকল মজদুর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন স্পেয়ার পার্টসের দোকান দিয়েছে রামপুরার রাস্তায়, ভালো ব্যবসা করছে।

গরম ভাত আর মামলেট, চৌকির উপর তিনটে বাসন রেডি করে এল আবার। গাড়ির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাথার চুলে নাড়া দেয়। তারপর হাত দরে টানে। আশ্চর্য বাড়াবাড়ি। প্রথম কথা বললে না, তারপর ধমকে উঠল রুহুমত, আহ ভাগ এহান থে, বেহায়া মাগী—

এবার কাঁদো কাঁদো ফুলজান বলল, আমি কি করছি তোমার যে চেৎ দেহাইতাছ? আমার কেউ নাই, ভাইছাব আমারে বেইচ্যা দিছে দুই আজার ট্যাহা লইয়া। তুমিও আমারে চাওনা—

তরে চাইয়াম আমি! রুহুমত সটান বসে কথা ছুঁড়ে মারল, তুই আমার ক্যাডা?

আমি তোমার কেউ না। তবে আমারে বাঁচাইলা ক্যারে। গুন্ডারা লইয়া যাইত। ভাবছিলাম তোমার দিলে দয়া-মায়া আছে। একটু থেমে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলল ফুরজান, পুরুষ মানুষ সব একরকম স্বার্থপর। ঠিক আছে আমি যাইয়াম গা। আমার রহারে আপনে বাইর কইরা দ্যান। চিনেন না? কইতাছি, আমাগো রতনপুরেই বাড়ি মুহাম্মদ রুহুমত আলি—

একটু শিউরে ওঠে রুহুমত, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে করুণ স্বরে বলল, আমি তোমার রহাবহা কাউরে চিনি না। রানছস যহন খাওয়া-দাওযা কইরা ভাগ জলদি। নাইলে পুলিশে খবর দিয়াম—

ফুঁপিয়ে উঠল, তারপর ঘরের কাছে গিয়ে বাঁশের খুঁটি ধরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। রুহুমত খেতে এল না, সেও খেলো না। নিজের খাওয়া শেষে পাতিলে ভাত ঢেলে ফেরদৌস তাতে পানি ঢেলে রাখল।

বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছে, মনের ভিতরে নানা কথার তোরপাড় চোখে এখনো দরদর পানির ধারা উথলে ওঠে অভিমান, স্মৃতির প্রবাহ। এখানে এরা তো সব অচেনা তবু আঘাত করেছে। সে আঘাতে অতীতটা জেগে উঠেছে ঝরাপাতার বনতলের মতো। মিলিটারীর জুলুমই তো শেস ছিলো না, মনে পড়ে। বন্যার সময়। দশজনের পরিবার, সাতদিন ধরে উপাস। একটু দানাপানি নেই, আড়াইসের গেঁও পেয়েছিল আগের হপ্তায়, তা কখনও শেষ। ছনের ঘরের ভিতরে থইথই করছে পানি, মাচায় গিয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। রাত নিঝঝুম, বাইরে ছপছপ আওয়াজ। ঝাপ খুলে দাঁড়াতেই দেখল একটি ডিঙি। পাটাতনের ওপরে হারিকেন এবং দু'টি লোক। কি আলাপ করছে ওরা। তারপর সাড়া দিলে চিনতে পারল ভাইসাব, মানে ভগ্নিপতি, ময়নাবুবুর জামাই। যুদ্ধের ঘটনার পরেও একমাত্র যে বেশ আদর করত, তার পেটেও না এমন কুমতলব ছিল। বাজানকে ডেকে নিয়ে। কি বলল ফিসফিস করে এবং আধাবস্তা চাল দিয়ে গেল যাওয়ার সময়। তখন বুঝতে পারেনি, আরো কিছু দিয়েছিল একজোড়া শাড়ি। তার মধ্যে দামী চটি, তা পরিয়ে এক সন্ধ্যায় বুবুর বাড়িতে নিযে গেল বেড়াতে। চারদিকে থইথই পানি, আঁধার হয়েছে। বাতি জ্বলে না। ভয়ে-ডরে বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছিল মরাগাঙের পুলের থেকে কিছুদূরে যেখানে আমগাছগুলো অর্ধেক ডুবে আছে তার কাছে একটি বড় পাটের নৌকা, তাতে নিয়ে তোরে। সেখানে বসেছিল রিলিফের সবুজ মিঞা ঝাপের আড়ালে বিছানা পেতে।বং সিগারেট ফুঁকছিল। সাদরে গ্রহণ করল, তারপর মিষ্টি দিল খেতে, রস গোল্লা, সন্দেশ। কিছুক্ষণ পর সব পরিষ্কার, কান্নাকাটি সব মিছে। কোমর থেকে পিস্তল খুলে দেখাল। সেই সবে শুরু। কতবড় পশুটা, একেবারে নাস্তানাবুদ করেছিল। শয়তান, বেঈমান। অর্ধেক খেয়েছে রিলিফের মাল। বাপ তো চাষী কিন্তু পেটের জালায় যখন খারাপকে মেনে নিল মরতে দেরি হলো না। মা বলত কবীরা গুনাহ করেছে তাই কাফনও পায়নি। কলাপাতা জড়িয়েই ভেসে যেতে হযেছে।

নিসপিস করছে মগজের ভিতরটা। ফুলজান পরিষ্কার তাকিয়ে ছিল চোখ মেলে।

হঠাৎ বাইরের দপদপে বাতিটা নিভে গেল, কি ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে চেয়ে যায়, ঘরের ভিতরটাও।

শহরে মাঝে মাঝে কারেন্ট চলে যায় সে জানত; কিন্তু; এত রাতে, মনে হল অন্যরকম। এতা শহরের বাইরেই প্রায় নির্জন এলাকা।

গুন্ডারা ফিরে এলো না তো? ড্রাইভার আর চ্যাংড়া সাঙাৎ বেজায় ক্লান্ত ছিল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে।

ফুলজান পড়ে থাকে চুপচাপ। তারপর এক সময় শুনল, কে যেন সাবধানে টানছে দরোজার কপাট। ভাবল চিৎকার করবে কিন্তু গলা থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না। ঠান্ডা ঠান্ডা হাতপা ক্রমে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, দ্রত চলছে হৃৎপিন্ড।

ও দেখছে, ঝাপটা সত্যই সরে গেল, এবং পা টিপেটিপে ঢুকছে একটা লোক। দাঁড়ালো দরজার কাছ থেকে এসে, অন্ধকারে এদিকে সব একাকার। টের পায় আসছে সে, কাছে এল। চৌকির ধারটায় বসলো না। যেন শ্বাসপ্রশ্বাস পরখ করে নেয় কান পেতে। গভীর ঘুমে রয়েছে কিনা, তারপর হাত দিল শরীরে। হাত চলেছে, ও ঝিম ধরে থাকে। প্রথম আলতোভাবে, একটু ধরে ধরে দেখে, নানা জায়গা, বুকের উপরে থামল কিছুক্ষণ। ইচ্ছে করলে এখন খপ্ করে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু তা করলো না। কি জানি, কি বিপদ আসে। চোরের মত এসেছে, নিরস্ত্র নিশ্চয় নয়। অতিকষ্টে চেপে চেপে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এখন পায়ের কাছে হাত, পিছলা গাছের বাকল খোলার মত আস্তে আস্তে টেনে তোলে পেটস্তিক সব কাপড়চোপড়। তলপেটের কাছে থর্থর্ করে কাঁপছে একরাশ আঙুল।

না, না আর না। যেন ঘুমেই আছে এমন ভান করে পাশ ফিরল এবং পা ইস্তক টেনে দিল সারা শাড়ি। অন্ধকারে সায়াটা সরে যায় ঝট্ করে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলজান প্রশ্ন করল, ক্যাডা, ক্যাডা তুমি?

বুকটা একদম উদোম হয়ে ছিল, চৈকিতে উঠে বসে কাপড় টানে। যেন গায়ের গন্ধ পায়, এ যে সাঙাৎ। অন্য কেউ এসব করবে না। অভিজ্ঞতা কম, কৌতূহল বেশি।

আমি, আমি ফের—। চট করে সুইচ টিপে দেয় কিন্তু বাতি জ্বললো না। মেইন সুইচ বন্ধ করে রেখেছে নিশ্চয়ই। তবু বুঝতে পারলো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে ওর পা জোড়া। সে বলল, ভুখ লাগছে, রুডি খাইতে আইছিলাম।

হে, বুঝি। তা আমারে ডাক দিলেই পারতা। কিছুই যেন বুঝতে পারেনি। এমনিভাব দেখিয়ে ফুলজান বললে, তুমি কাঁপতাছ ক্যান।

তুমার চোখে বিলাইয়ের জ্যোতি? দ্যাখতাছ ক্যামনে?

হে, আন্ধাইরে আমি সব দেহি। ফুলজান হাত বাড়িয়ে বলল, আও কাছে আও না। বাইরে তোমার কষ্ট অইতাছে। চৌহিডা তো বড়ই, এইহানে থাহ।

পাগল নিহি? উস্তাদ আমারে মাইরা ফালাইব। আমারে বাইরেই থাকতে অইব। মালপত্তর আছে না?

ফুলজান রহস্য করে বলল, আমি বুঝছি ক্যারে আইছিলা। ভালাই তো। কিন্তুক অত ডরাইলে কাম করবা ক্যামনে। মাইয়া মাইন্ষেরে খুশি করা অত সোজা না। সাহস লাগে, শক্তি লাগে।

কোনো উত্তর দিলো না ফেরদৌস, মাথা নিচু করে চলে গেলে ফুলজান দরোজাটা ভালোমত বন্ধ করে এল। এখন বেশ অন্ধকার, ঠান্ডাও আছে কিছু, কিন্তু আবার শুতে যেতে ইচ্ছে হলে না। চুল ছেড়ে দিয়ে চৌকির ধারে বসে থাকে, এখন রাত কত? কেমন ঝিম্-ঝিম্

করছে শরীরটা, সরু সাপের মত কি একটা বেরাচ্ছে শিরার ভিতর দিয়ে। সে উঠল, ধীর পায়ে হেঁটে এল, দরোজার কাছে। দরোজা খুলে বাইরে বেরুল। আসমানে তারা ফুটে আছে খইয়ের মতই। বাইরের বাতিটা জ্বালেনি, ওরা ঘুমিয়ে আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ও আর ঘরে যাবে না, শোবে না, চৌকিতে বিছানায়। কেমন ডর-ডরর লাগছিল, যেন ওখানে মিশে আচে অনেক ছায়া, ছায়ামূর্তি। সে ঘুমুলেই ধরবে চেপে, তখন কথাও বলতে পারবে না।

এখন বাইরে তত অন্ধকার নয়, আকাশের জ্যোতির আভায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—শেভরোলেটটার পিছনের সিটে ঘাড়ের নিচে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছে ড্রাইভার, অঘোর ঘুমে নাক ডাকছে তার। সন্তর্পণে দরোজাটা ফাঁক করে ফুলজান, এক চিলতে জায়গা, তার মধ্যই শুয়ে পড়ল।

সাতজন কারিগর কাজ করে, সকাল সাতটা থেকেই শুরু হয়ে যায় ওদের আওয়াদানি, একটানা ধম্‌ধম্‌ ঝন্‌ঝন্‌। হাতুড়ি পেটা ডেনটিং। উচ্চ কথাবার্তা রসিকতা। শিস, হাততালি, মাঝে মাঝে ডিওসকো নয় লোকগীতির ছেঁড়া কলি।

ভোরবেলা ওঠাই অভ্যেস রুছমতের। কিন্তু আজকে আরো সকালে ঘুম পাতলা হয়ে এলে টের পায় শরীরে কি একটা চেপে আছে। চট করে চোখ খুলল। কি সর্বনাশ! এক ঝাঁকুনিতে উঠে বসল। ইচ্ছে হয় একটা ধাক্কায় গাড়িসমেত উল্টে ফেলে দেয় কিন্তু তার ঘুম-ঘুম চোখে পড়ল গভীর ঘুমের শান্তিতে ডোবানো সেই মুখ, যাকে সে একদা পুষেছে রক্তের ভিতরে। সেই মুখে এখন অনেক অনেক দাগ তবু চিনতে ভুল হলো না। আর নাকফুলটা, এখনো সেই দৃশ্য চোখে ভাসছে। কলাক্ষেতের আড়ালে গিয়ে দিয়েছিল, হাতে তুলে। টসটসে রসে ভরা সিঁদুর আমের মত ফুলজানের সে কি লজ্জা! কিন্তু নিয়েছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পিতলের চুঙিটা খুলে ফেলে পরেও ছিল! থাক থাক থাক। ও সময় চলে গেছে। সে আর ফিরে আসবে না। মোচড় খেয়ে ওঠে কলজেটা ওর, এখন এত কাছে। কতকাল, কত যুগ পরে দেখছে, তবু মনে হয় যেন সেদিনই ছিল। সেদিন বেহেশতের ফুল, দুনিয়া তাকে দুমড়ে-মুচড়ে ছোবড়ার মত ফেলে দিয়েছে। না, না। তবু দুর্বল হলে চলবে না। চিনতে পারেনি ভালোই হলো। যা গোপন আছে গোপনই থাক। অচেনার ভস্মস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে থাক, সমস্ত আগুন।

সাবধানে ওর একটা হাত নামিয়ে রেখে গাড়ির ভিতর হতে বেরিয়ে আসে, তারপর জাঁতাকলের কাছে গেল। এবং পানি, ফেলতে ফেলতে ভাবল, কেলেংকারি। লোকজন আসার আগে ওকে জাগাবে সাঙাৎকে দিয়ে, এখন যত তাড়াতাড়ি তাড়ানো যায় সেই ভালো।

দুজনে মিলে চুলো জ্বালিয়ে নাশতা তৈরি করে। কিন্তু রুছমত বড় রাস্তার ধারে চায়ের দোকান চলে গেল।

ফেরদৌসকে হুকুম করে গিয়েছিল মেয়েটাকে তেরাস্তার মোড়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে দিয়ে আসতে, কিন্তু ফিরে এসে দেখে রোদে দাঁড়িয়ে ওরা চা পান করছে।

গোমড়ামুখো ড্রাইভারকে দেখে মধুর হাসলো ফুলজান, চায়ের পাতাডা খুব ভালো, যা গেরান! আপনেরে দিবাম নি এক কাপ?

রুছমত হাসলো না, কঠিনস্বরে বলল, তুরে না কইছি এহানথে বাইর অইযা যাইতে। ওয়ার্কাররা আইলে বিপদ ইব, কইলাম।

আপনে থাকতে কি আবার বিপদ। তাছাড়া আমি ডরাই না। ফুলজান রেশমী চুড়ির হাত নেড়ে, কইলেই অইলো। কই যাইয়াম আমি। আমার সোয়ামীরে তো বাইর কইরা দিতে পারলেন না!

সোয়ামী! রুছমত বুঝতে পারে, সমূহ বিপদ। এখন আর ঘাঁটানো ঠিক নয়।

হারকিউলিস অটোমোবাইলস থেকে কিছু খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার জন্য মতিঝিল গিয়েছিল, দুপুর বারোটায় ফিরে বাঁশের তৈরি গেটের কাছে থাকতেই শোনে ভিতরে ঝিকমিক আওয়াজের সঙ্গে অনেক কণ্ঠস্বর। মাঝে মাঝে মন্তব্য আর ফুলজানের খিল্ খিল্ হাসি। পাগলী হয়েছিল, এখনো তাই। পাগলী যে পাগলীই। কিন্তু জমিয়েছে বেশ। তরজার বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখল, দেখে একটা টিনের পাতকে ট্রে হিশেবে সাজিয়ে ওদের সামনে ধরছে। সারারাত ঘুম হয়নি সাঙাৎ-এর, সে একটু চুপচাপ, অন্যেরা বেশ সরগরম। সিনেমার নায়কের মত স্টাইলে চুলরাখা এই কারখানার হিরো জুলহাস। সে নাকি বাচ্চন। কোমর বাঁকিয়ে নাচতে নাচতে গাইছে,-ও ভাবী জিয়ো হাজার সাল'—

তাহলে, এত বাড়িয়েছে! ভাবল রুছমত। নিঃশব্দে গ্যারেজে ঢুকে জিনিশের প্যাকেটটা ছুঁড়ে মারল টেবিলের উপর। মেজাজটা আবার ভীষণ বিগড়ে গেছে।

ওস্তাদ ডুইব্যা ডুইব্যা পানি খাইতাছে। এইবার আমরা ছাড় ম না। জোড়াখাসি আনুম—একটা শানদার ফিস্টি চাই—

হেই, হেই। আমরা রঙিন বাল্ভ লাগাইয়াম, সারারাইত ঝলমল করব আমাগো গরিবের রঙমহল।

মহব্বত বলল, গরিব আবার ক্যাডারে। আমরা হগলতেই শাহানশাহ। তেহে হেহে।

না, না, সব ভেস্তে গেল, ভাবে রুছমত, এই যখন কপাল তখন কেনইবা পালিয়ে এল গ্রাম থেকে আর কেনইবা ভাগ্যকে গড়বার জন্য এত পরিশ্রম। চেহারাটা ওর পানসে হয়ে যায়, কপালে দেখা দেয় ফোঁটাফোঁটা চিকন ঘাম। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তার সাধের গ্যারেজটাকে, অসহয়ের মত। আনমনা হাতের খসখসে তালুটা ঘসে গোবদাগাবদা টেবিলের কোণে।

বোধ হয় সাড়া পেয়েছিল, চায়ের একটা কাপ হাতে দ্রুত এল ফুলজান, বাড়িয়ে দিয়ে বলল, অত দেরি ক্যান। জানো? ওরা সবাই ধরলো, আমি খিচুড়ি রানতাছি। অসুবিধা আয় নাই। আমার ট্যাহাপয়সা আছিল।

শাটআপ! তির্যক গলায় চিৎকার করে উঠল রুছমত, একটা ঠ্যালা মেরে ফেলে দিল চায়ের কাপটা, চোখমুখ লাল। একটানা বলে গেল, অহনো আমার গ্যারেজ ছাড়ছ নাই ক্যান্। ক্যান্, ক্যান্। তুই কি চাস! আমি আর সহ্য করুম না।

ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছে, কপোতীর মত কাঁপছিল ফুলজান কিন্তু এরই মধ্যে ছুটে গিয়ে দুহাতে সামনাসামনি জড়িয়ে ধরে, যখন সকরে দৌড়ে এসে ভিড় জমিয়েছে। মগজে রক্ত চড়ে যায় রুছমতের, একটা মোচড় দিয়ে ফেলে দিল, তারপর একটা কাটা টায়ারের অংশ তুলে সপাং সপাং মারতে থাকে ক্ষিপ্তের মতো। ফুলজান শব্দ করলো না। দৌড়ে কাছে যায় কয়েকজন। কিন্তু লোকটা জংলী ষাঁড়ের মত, তাকে থামানো মুশকিল।

মার খেতে খেতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুলজান ঃ খোলা চুল, আলুথালু বেশ। লোকটা কাঁপতে কাঁপতে থামলে চোখ বুজে বিড়বিড় করে, এবং এবার পাগলীর মতো নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বলল, আহ্ আরাম! রুছমইত্যা আস্ত বেকুপ, আমারে ফালাইয়া গাঁওয়ের পথে পলাইয়া আইছে। এই লোকটা আসল মরদ। রুছমইত্যা আমারে যুদি উমুন কইরা মারত। গায়ের পথে লোও বাইর করত।

উপস্থিত কেউ বুঝলো না, কেবল চোখ ঠারে কয়েকজন, শহরে পারা দিয়েই গাঁয়ের মেয়েটা কেমন কঠিন কঠিন বুলি ছাড়ছে! দিনকাল পাল্টে গেছে তো। রুছমত, মাথা নিচু

করে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

আবার রাত হয়ে গেলে, গ্যারেজটা আগের মতই নীরব নিষ্প্রাণ। বাইরে সাঁসাঁ করে জ্বলে অনেক পাওয়ারের বাল্‌ভটা, দূরে কুকুরের ডাক। আর কিছু শোনা যায়নি। চোখমুখ ফোলা, সন্ধ্যের সময় টিনের বাক্‌সোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ফুলজান। যখন শেডের নিচে টেবিলের কাছে বসেছিল রুহুমত এবং চ্যাংড়া, দরোজা ছাড়িয়ে গেলে মুখ তুলে ওরা দেখল। যাচ্ছে, চলে যাক। একটা বিরাট বোঝা নেমে যায়, যেন ফাড়া কেটে গেল। তবে মনের ভিতরে কেন জানি খুশির হাওয়া বইলো না, গুন্‌গুন্‌ করে গানও গাইতে পারলো না। মুখটা বরং বেজার, নিজের হাতে তৈরি চায়ের কাপে চুমুক দেয়, এবং চ্যাংড়া একটা পুরনো টুলে বসে টানছে বিড়ি, চুপচাপ। একসময় ঘরের ভিতরে এলে দেখে, সব পরিপাটি। জিনিশপত্তর সাজানো গুছানো। একটা চুলের কাঁটা পড়ে আছে বিছানাতে, বাঁশের খুঁটির কাছে আলতার শিশি। নিতে ভুলে গেছে।

মিটসেফের দরোজাটা খুলতে চোখে পড়ল একটা তস্তুরী, আরেকটা উপুড় করে ঢাকনা দেওয়া, হাতে নিল। দু'খিলি ডবল পান কাছে কিছু জর্দা ও চুন। সোডার বোতল খোলার মত পেটের ভিতর থেকে একটা দমক উঠল, হ্যাঁ হাসি ঠেলে উঠছে, আশ্চর্য একটা হাসি। কিন্তু একলা একলা, নিজের গলা চেপে সেটা থামিয়ে দেয়।

কি একটা মনে পড়েছে, প্যান্টশার্ট পরে চুল আঁচড়ালো। একটা ফোকসওয়াগেনের কাজ শেষ হয়েছিল, সেটা নিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল। দ্রুতবেগে চলবার সময়ে ও তাকায় এদিক ওদিক।

কত জায়গায় গেল, ইয়ত্তা নেই। সোয়ারী ঘাটে, নওয়াবপুরে রথখোলায় গাড়ি ভিড়িয়ে রেখে হেঁটে দেখল। গলিঘুপচি, টিমটিমে লালচে বাতির জায়গা। যেন নেশায় পেয়েছে, আর অদ্ভুত একটি তাড়না তাকে রমনার উদ্যানে, তারপর শেরেবাংলা নগর জাতীয় সংসদ ভবন সিঁড়িতে, ক্রিসেন্ট লেকের কাছাকাছি নিয়ে গেল। পুরাতন এয়ারপোর্টে একটা ঢুঁ মারতেও ছাড়লো না। হোটেল সোনারগাঁও এবং শেরাটনের কাছ দিয়ে আস্তে গাড়ি চালিয়ে গেল। যদি কাউকে নজরে পড়ে। ঘুমঘুম কটা চোখ, রুক্ষচুল খাকি শার্টের পিছনটা ভিজে গেছে এবং শেষ যখন জিয়া আর্ন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হয়ে ফিরছে পানসে চেহারা নিয়ে তখন দূরের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে ও ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে নানা রকম পাখি।

নির্ঘুম শ্রান্তক্লান্ত গাড়িটা যথাস্থানে ভিড়িয়ে রেখে রবারের জুতোপরা পা টেনে টেনে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই দেখে সারামুখে জড়ানো চুল, আলুথালু বেশে, বিছানায় পড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে জলজ্যান্ত একটা মেয়ে, কি অদ্ভুত! ফিরে এসেছে। এটা আসল ফুলজান তো? না অন্য কেউ? চোখ রগড়ে আস্তে হেঁটে কাছে যায়, একটু মুছে আবছায়ার মধ্যে ভালোমতন দেখার চেষ্টা করে তখন তার ভারী ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে অস্পষ্ট বিড়বিড় উচ্চারণ, যতসব গ্যাড়াকল!

চুম্বকের টানের মত তার মুখটা হঠাৎ আরো নিচে নেমে যায়, দেখতে পেল তার দেওয়া নাকফুলটাই ওর নাকের ডান পাশে ঝক্‌মক্‌ করছে। হঠাৎ মাথার ভিতরটা একটা চক্কর খেয়ে উঠল। চৌকির কাছে মাটি লেপটে বসে পড়ে রুহুমত, তার দুই চোখ ছেপে পানি নেমে আসে।

এপ্রিল, ১৯৭৩।



পুসকাট

এমন সুন্দর সকাল, কিন্তু তবু মুশকিল। খট্‌খট্‌ আওয়াজ হতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে দরোজায়, সাবান মাখানো গালে রেজারের টান দিতে গিয়ে আর সহ্য হয় না।

নিজের ঠোঁটের ওপর কলিম আওড়াল কয়েকটি অশালীন শব্দ, ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলে চোখজোড়া। অসম্ভব। অসম্ভব! আর টিকে থাকা যাবে না। সংসার চালাতে গিয়ে সারাক্ষণ লেগেই আছে খিটিমিটি—নুন আনতে পান্তা ফুরায় উপরন্তু এই উৎপাত। মনে হয় জোয়ার আসছে, ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ মানুষের জোয়ার, এ বুঝি তারই পূর্বলক্ষণ। সেই জোয়ারে ভদ্রলোক নামক অদ্ভুত সমাজ টিকে থাকতে পারবে না। নইলে এমনটা হচ্ছে কেন। সকালে নাড়ে, বিকালে নাড়ে এবং রাত বারোটা পর্যন্ত কখনো কখনো এমনকি তার পরেও অবিরাম এই হানা। ধমক দিলে গায়ে মাখে না, মাঝ করতে বললে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকে, দাঁত চেপেও এইসব হজম করা মুশকিল।

এদিক ওদিক বেআইনী দখল উৎখাত অভিযানের পর মাসখানেক অবস্থা কিছু ভালো ছিল। বর্ষার পরে আশ্বিন কার্তিকের দিকে অবস্থার আরো উন্নতি হয় এবং অগ্রহায়ণ পৌষে নতুন ধানের পরো মৌসুমে তখন কাজের লোকও পাওয়া যেত না। আবার পুরোদমেই শুরু হয়েছে। একটানা খট্‌খট্‌ শব্দ শুনতে মুনতে যেন রক্ত চড়ে গেল মাথায়, বাথরুমের কথাট একটু ফাঁক করে চেঁচিয়ে ডাকল নুরা ও নুরা!

রান্নাঘরে বিবিসাহেবাকে সাহায্য করছিল, সাহেবের চড়াগলা শুনতে পেয়ে নুরা ছুটে এল, বলল, জ্বি স্যার?

কি করছিস তুই হারামজাদা, কিছুই শুনতে পাচ্ছিস না?

মাথা চুলকালো নুরা, তারপর বলল, পাইতাছিতো স্যার—

ব্যস, আর কিচ্ছু করবার নেই, না? বাথরুমের ভিতর থেকেই আবার চিৎকার করে কলিম, আরো জোর দিয়ে বলল, যা যা লাঠি নিয়ে যাও।

এই যাইতাছি স্যার—

গালে রেজারের টান দিতে দিতে মনে পড়ল ছোকরা একদিন এক ভিখিরিকে গালমন্দ করতে থাকলে নিজেই ওকে নিষেধ করেছিল। সাড়া না দিলে কাহিল হয়ে ফিরে যাবে, মিছামিছি মুখ খারাপ করার প্রয়োজন হয় না।

একটা বুড়ি স্যার। কাঠের বারটা হাতে নিয়ে ফিরে এসে নুরা জানালো চোখ রাঙাইলাম কিন্তুক যায় না। আপনের লগে দ্যাহা করতে চায়।

ইহ, আমার আহলাদী! কলিম বলল, যা যা আরো জোরে ধমক দে।

দরোজার কাছে আবার কিছুক্ষণ গোলমাল। নুরা এসে বলল, কিছুতেই যায় না স্যার একটা পুসকাট দিছে। এই যে আমার হাতে—

ওটাতে আবার কি? বাথরুমের ভিতর থেকে জিগগেস করল। জানি না কি লেহা আছে। একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, ফাঁকদা আপনেরে দিয়াম স্যার?

আরে না, না, তোরও যা বুদ্ধি। পিঠে তোয়ালে ঘষতে ঘষতে কলিম বলল, বিবিসায়েবরে দেখাগে যা।

আইচ্ছা স্যার। পোস্টকার্ডটা নিয়ে ও কিচেনে চলে গেলে কলিম ভাবল জীবনের গতি

সত্যই বিচিত্র। দুঃসময়ে হুশিয়ার থাকতে হয়, নইলে পদে পদে ঠকবার পালা।

রুটি সেঁকছিল, তাওয়ার ওপর থেকে একটা নামিয়ে রেবেকা হাত বাড়াল। এক নজর দেখেই জিগগেস করল, কিরে কোত্থেকে পেলি এটা?

ওই যে কড়া নাড়তেছে বেডিডা, হেই দিছে।

হাতের আঙুলে আলগোছে ধরে দেখতে দেখতে বলল রেবেকা, এ যে তোর সায়েবের চিঠি। মা'কে লিখেছিলেন।

হাচাই? নুরা বলল, বুড়িডা তো সাংঘাতিক!

খরচুন হাতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হাউমাউ করে উঠল, বৌমা! কিমুন আছ বৌমা?

ময়লাকাপড় পরা বুড়িটার সাহস দেখে নাক সিটকায় রেবেকা, ধমকের সুরে বলল, এই চিঠি কোত্থেকে পেয়েছ তুমি, হ্যাহ্?

বৌমা, আমি—

হয়েছে। হয়েছে। তোমাদের লজ্জাশরমও নেই। এত করে বলছি গ্রাউন্ড ফ্লোরটা বদলাও, বদলাও। না, উনি শুনবেন না। দড়াম করে কপাট লাগিয়ে দিয়ে রেবেকা গজর গজর করে উঠল, যত্তসব, রাবিশ—

দ্রুত পা'য়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আসছিল কলিম, নুরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, দেখিয়ে কিসের পোস্টকার্ড। চুলার এক পাশে রেখেছিল, দৌড়ে গিয়ে ওটা আনল। হাত বড়িয়ে দিয়ে বলল, এই যে স্যার—

কলিম পোস্টকার্ডের উপর চোখ বুলিয়ে বলল, এযে দেখছি আমার মা'কে লিখেছিলাম। এই বুড়ি কোত্থেকে পেল?

কি জানি স্যার—জটাচুল, গালভাঙা ডাইনীর মতন দেখতে এরা সব করতে পারে। দরজার সামনে লেপটে বসে কাঁদছিল বিনিয়ে বিনিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে নুরা বলর,

হুনতাছেন?

হু, আচ্ছা ঘড়িয়াল দেখছি। সপাং করে কপাট খুলল কলিম, তারপর গাঁক্‌গাঁক্ করে উঠল, এই বুড়ি ওঠো এখান থেকে, ওঠো জল্‌দি। নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

মুখ নিচু হয়েছিল, ডানহাতটা সরা-বসানো একটা মাঝারি মাটির হাঁড়ি বাঁধা বোচকার উপরে, পিঠের কাছে ধরে রেখেছে আরেক হাত।

ক্যাডা বাবা তুই? কলিম না? হাত কাঁপছে, ছমিরণ বিবি মুখখানি তুলে বলল, তোর লাইগ্যা পুলিপিডা বানাইয়া লইয়া আইছি বাবা, আমি যে তোর মা।

মা? ঠোঁটে একটুখানি বিড়বিড় ধ্বনি, নিমেষে থ মেরে গিয়ে কলিম উচ্চারণ করল, মা-তুমি!

অয়ো আমিই তো। ছেলেকে ধরে আদর করার জন্য উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, এই দ্যাখ্। তুই যে কইছিলে পুলিপ্পিডা খাইবি? হেই যে আইলি, আর তো গেলি না।

বড় কান্নাকাডি করত তোমার লাইগ্যা। শহরবন্দর করে পাকা সঙ্গিনী আমিনার মা। বলল, আমিই লইয়া আইছি বাবা কোনো অসুবিধা অয় নাই। তা তোমরা ভালো আছ তো বাপজান?

খরচুন হাতে রেবেকা কখন এসে দাঁড়িয়েছিল ঘাড়ের কাছে, সম্বিৎ ফিরে এলে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, দাঁড়িয়ে দেখছ কি হাবার মত? জলদি টেনে ভিতরে আনো। আশেপাশে সব ভদ্রলোক, দেখলে কি ভাববে-ছি ছি।

সারাদিন থমথমে আবহাওয়া রাতে ঘুমোবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কাঁটা খুলতে খুলতে রেবেকা স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল, ছোটলোক।

বালিশে কাত হয়ে শেষবারের মতো কাগজ দেখছিল কলিম, ওদিকে তাকিয়ে জিগগেস করল, কি বললে?

শুনছে তো। কালো চুলের রাশ ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে বলল রেবেকা, যা বলেছি তাই—।

খাটের ধারে সোজা হয়ে বসল কলিম, ঠাণ্ডাস্বরে বলল, শোনো রেবু সবকিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত।

আয়নার ভিতরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রেবেকা বলল, হ্যাঁ আমিও তাই বলি।

তার মানে? তুমি কী বলতে চাও? হঠাৎ যেন একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, কলিম তেমনিভাবে বলর, আমি সীমা লংঘন করেছি?

এর জবাব সহজ এবং তা তৈরিও ছিল। কিন্তু তার গুরুতর কণ্ঠস্বরে চুপ হয়ে গেল। আয়নার ভিতরে তাকিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে ঘনঘন চিরুনি চালিয়ে। এমন দীনবেশে শাশুড়ি এসেছেন সেজন্য নয়, স্বামীকে যে কথা শোনাতে পারেনি তাতেই আসল রাগ। মাস দু'য়েক আগে ও চিঠিটা লিখেছিল, বাসার ঠিকানা দিতে মানা করেছিল।

চিঠিতে ঠিকানা দেবোনা, তা কেমন করে হয়! রেবেকা মুখ ভার করে বলেছিল, পরে আমাকে দোষ দিও না।

ওর আন্দাজটা মিথ্যে ছিল না। এমন সপ্তাহ খুব কমই যায় যখন গাঁও থেকে কেউ না আসে ; সব চাষাভূষো। এ মামা যে চাচা। এ ভাতিজা সে ভাগিনা। সবাই ইষ্টিকুটুম। যেন বাবার হোটেল। একজন না একজন লেগেই আছে। এসে গেলে তিনচার পট্টি চাল বেশি দিতেই হয় ; তা আবার কি খাওয়ার ঢং। হাপুস্ হুপুস্ নিমেষে বোল উজাড়। এবং খাওয়ার পরে শোওয়া। সামান্য অছিলায় এখানে রাত কাটিয়ে দিতে ছাড়ে না। অথচ ছোট ফ্ল্যাট ; নিজেদেরই নড়তে নড়তে অসুবিধে।

পোস্টকার্ডের ঠিকানাটাই যে এই সবের উৎস, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু যদি ভালো হতো নিদকাল। বেতনের টাকায় টেনেটুনে দিনপনেরো চলে ; তারপর শুরু হয় ফন্দিফিকির।

বাপের বাসা কলাবাগান। ওখান থেকে প্রায়ই আসে এটা সেটা। তাই কিছুটা রক্ষে।

অভিযোগের চিকন রূপ যাই হোক, কলিম বুঝতে পারে বাইরের কাউকে দেখলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বিশেষ করে, দেহাতী আদমী যেন দু'চোখের বিষ। একদম বরদাশত করতে পারে না।

কিন্তু সেও যে নিরুপায়। এই সেদিন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে গলাগলি করে চলেছে সামনে এসে পড়লে তাদেরকে তাড়ায় কেমন করে? পাশের গ্রামের ইস্কুল থেকে পাস করেছে ম্যাট্রিক ; শহরে উচ্চশিক্ষা নেয়ার সময়েও যোগাযোগের সুতোটা ছিঁড়ে ফেলেনি ; রেলে একটানা বিয়াল্লিশ মাইল এবং লাইনের কাছেই বাড়ি। প্রথমে যেত পনের দিনে, তার পর মাসে অন্ততঃ একবার।

একই থানার লোক, নাইনের ছাত্র রেবেকার ছোট ভাইকে পড়াতে গিয়ে ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ওদের কাঁচা বাড়ির গাছগাছালিতে সবুজ পাতার মত ছিল রেকেবার কোমল মধুর ব্যবহার ; এ-ই ওকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। অথচ এখন কেমন কঠিন। মাঝে

মাঝেই ফস্ করে জ্বলে ওঠে, এবং কখনো কখনো বেফাঁস টিপ্পনি কাটতেও ছাড়ে না।

রাত হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ ঃ কপাট ভিড়ানো। ওখানে একটু আওয়াজ। আস্তে টেনে মুখ বাড়ালো ছমিরণ, জিগগেস করল, কলিম গুমাইছস?

না না। ও উঠে দাঁড়াল বলল, এসো।

কইছিলাম কি দিনের বেলায় তো তোরে পাওয়া যায় না। খাটের এক ধারে বসে বলল, কত কথা জমা অইয়া আছে, কুমবালা কই।

তার ভাঙা কথার ভিতর থেকে নিজের গাঁয়ের যে ছবি ভেসে ওঠে তা কেবল করুণ নয়, শিউরে ওঠার মত। শুনতে মুনতে চোখের পুতুলিতে গভীর ছায়া পড়ে। সে বোবার মত তাকিয়ে থাকে, জানালার দিকে। পলাশপুর জমজমাট পল্লী ছিল, কিন্তু এখন দু'চার ঘর বাদ দিলে, এক বড় করুণ অবস্থা। জিনিশপত্রের দাম চড়া, চালের সেরও দ্বিগুণ ; লোকজন বলাবলি করছে, সামনে আরও খারাপ পরিস্থিতি। এখন অভাবটা বাইরে দেখা যায় না, কিন্তু তিলে তিলে মরছে। বেরিয়ে গিয়ে রেবেকা রান্নাঘর তদারক করে এলো এবং ও ভিতরে ঢুকলে বলল কলিম, রাত অনেক হল, তুমি ঘুমাওগে মা। পর আবার শুনবো।

আমার চোহে কি ঘুম আছেরে বাপ! চোখ বুন্‌জলে খালি দেহি মউত মউত। ছমিরণ কি স্মরণ করল, তারপর বলল, রজবরে তোর মনে আছে?

থাকবেনা ক্যান। কলিম বলল, ক্লাসফাইভ পর্যন্ত তো আমার সঙ্গেই পড়েছিল।

হ্যাঁ বাবা হেই রজব। আমারে বড় খালা বইল্যা ডাকত মনে আছে না?

আছে তো ওর কি হয়েছে মা।

কিছু না। ছমিরণ চোখ মুছে বলল, সাধিন সাধিন করতে হে অহন সাধিন পাইছে। শেষদিহে খালি আড্ডা জোড়াডা আছিল—কত কইতে পারত না। গলার ভিতর তৈ চিচি আওয়াজ বার অইত। মাইনষে কইত যক্ষ্মারোগ। হে খাইতে পাইত না—কামকাজের লাইগ্যা কত জায়গায় ঘুরতো।

উঠে দাঁড়িয়ে কলিম পায়চারী করছিল, দুই কানে আঙুল দিয়ে বলল, না, না বোলো না। আমি শুনতে পারছি না।

ঠিক, আর কইয়া কি অইব। ছমিরণ দাঁড়িয়ে ছেলের মুখের পানে তাকাল, তারপর ভেজাস্বরে বলল, কিন্তুক নিজের বইনডারে তো আর ফেলতে পারবি না।

কেন করবুলের কি হয়েছে?

কি জানি, কি অসুখ। খালি হুকাইয়া যাইতাছে গা। কবিরাজ কয় সূতিহা। ছেলের হাতটা খপ্ করে ধরল ছমিরণ, বলল, তোর এহানে লইয়া আয়না বাবা? হাসপাতালে ভর্তি করাইয়া দিবি।

শুতে শুতে বারোটা, পরদিন অফিস আছে, তবু সজাগ। দু'জনের মাঝখানে ছেলেটি, রেবেকা চুপচাপ। ধীর নিঃশ্বাস ফেলছে। মনে হল কলিমের, কিঞ্চিৎ অন্যায়ই করেছে রেকেবার প্রতি, যার প্রতিফল এখন ভোগ করছে। ওর দিব্যদৃষ্টি যেন খুলে গেল। সত্যই তো রেকেবার বুদ্ধিমত চললে এখন এসব বিশ্রি অবস্থায় পড়তে হত না। সব ধ্বংসের পথে চলেছে, তাতে ওর মত চুনোপুঁটি কর্মচারীর কতটুকু কি করবার আছে, এই দুঃসময়ে নিকট-আত্মীয়ের জন্য কিছু করা অসম্ভব। গ্রামে তো প্রশাসন গেছে, ওখানে ওরা যাক্। আবেদন-নিবেদন করুক। তার এই অক্ষমতা কি অপরাধ? না, মোটেই না। যেখানে নিজেই চলতে পারছে না, সেখানে অন্যের কথা ভাববে কি করে? জিনিশপত্রের দাম এমন চড়া, পিঠ দেয়ালে এসে ঠেকেছে। তবু যদি একটা কিছু সাইড বিজিনেস করতে পারত। সব কিছু

করার যোগ্যতাও নেই, বুঝতে পারে। সুতরাং চোখ বুঁজে থাকাটাই ভালো। নিরাপদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। রেবেকার প্রতি সমবেদনায় এখন সে স্থির, হাত বাড়িয়ে ওর চুলে আদর করে নিরিবিলি। ওর মনে হল, ছোটবেলার বন্ধু রজবের পরিণতি অনায়াসে ওরও হতে পারত। কষ্ট করে লেখাপড়াটা শেষ করেছিল বলেই কোন রকমে টিকে গেছে। করবুলনেসা পিঠেপিঠি বোন, সহোদরা, জান দিত ভাইয়ের জন্য। ওর অসুখে সাহায্য করা উচিত বৈকি। কিন্তু ; কিন্তু। দুপুর রাতের পর কখন ঘুমিয়ে পড়লে দেখল, গাঁয়ের সামনের দিকে ধলেশ্বরী তার প্রবাহে অগুনতি মৃতদেহ জড়াজড়ি করে বয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের উপরে মেঘের মত আকাশ—ছাওয়া হাজার হাজার শকুন উড়ছে, পড়ছে নিচে গুত্তা দিয়ে। এবং কি আশ্চর্য, একঝাঁক যে ওরই দিকে রোখ করছে। ওই যে আসছে। ও দৌড় দিল পিছন ফিরে, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ল, তার সঙ্গে সঙ্গে পাখনার দাবড়ানি। ধারালো ঠোকর। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। ঘুম ভেঙে গেলে দেখল মশারির ভিতরে আছে, এবং ঘামছে মশারির বাইরে হাজার মশার পুন্ পুন্ আওয়াজ।

ছোট্ট কামরার জানালার পাশে পরদিন সকালে দাঁড়ালে ছমিরণ দেখে তার আনা কুলিপিঠাগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে কিছু নর্দমায় আর কিছু ঘাসের উপরে। কি কাণ্ড! সজীবটা যা দুষ্ট, ও-ই বোধহয় ফেলেচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বল খেলার মত। রোদ উঠেছে কখন, এখনো ওরা উঠছে না কেন, নিশ্চয় শহরের রীতি। ডাকবার জন্য ওদের কপাটের কাছে গেল, শুনতে পেল দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা। একটু থেমে কান পাতলে বোঝা যায়, বেশ চোখা চোখা এবং মারাত্মক।

রেবেকা বলল, আমি চললাম। ভালোই হল তোমার। লঙ্গরখানাও ঠিকমত চলবে, খরচও লাগবে না বেশী।

ঠিক আছে কলিম বলল, বাপের বাসায় যেতে চাও বাধা দেবো না, কিন্তু অন্যায়ভাবে কথা বলছ ক্যান রেবু, তুমি না লেখাপড়া শিখেছ?

শিখেছিলাম, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

প্রায়শ্চিত্ত! কলিম যেন বিশ্বাস করতে চায় না এটা ওর মন্তব্য।

নয় তো কি? বড়বুবু কেবল আমপাড়া পড়েছিল, তাদের লাখ লাখ টাকা, বাড়ি গাড়ি।

তেমন একজন বাগালেই পারতে। কলিম পরিহাসের সুরে বলল, প্রভাবশালী দুলাভাই তো ছিলই। সহজেই মিলত।

মিলত বৈকি! রেবেকা নির্বিকার, বলল, না মিলে ছিল এমনও নয়। কিন্তু আমিই ভুল করলাম।

ভুল যখন করেই ফেলেছ-কলিম একটু থেমে বলল, এখন আর উপায় কি।

উপায় আছে নিশ্চয়—রেবেকা গোছগাছ করতে করতে বলল, জীবন কখনো শেষ হয় না।

হঠাৎ যেন টনক নড়ে, কিন্তু গম্ভীর। কলিম বলল, তার মানে? আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ?

শান্তস্বরে বলল রেবেকা, ভয় দেখাবো ক্যান। শুধু অনুরোধ করবো, আমাকে বাধা দিয়ো না।

তোমাকে আমি যেতে দেবো না। কঠিন, রূঢ়স্বরে বলল কলিম, আমার মা এসেছে—তার সেবাশুশ্রূষা করতে হবে তোমাকে। ইতোমধ্যেই অনেক অপরাধ করেছ, যা ক্ষমার অযোগ্য। পিঠাগুলি ফেলে দিলে ক্যান, ক্যান?

রেবেকার কাঁধে ধরে ঝাঁকুনি দেয়, উত্তেজিত। তখন রেবেকার ঠোঁটও কাঁপছিল সে বলল, ফেলবো না? একশ'বার ফেলবো—গ্রামের পিঠা একেকটা রোগজীবাণুর পিণ্ড! তোমার মায়ের পুলিপিঠা খেয়ে, কলেরায় তুমি মরতে পারো, কিন্তু আমার ছেলেটি পারে না। বুঝলে, কেন ফেলেছি! আমি যাবোই। আমি কারুর দাসী-বাঁদি নই। মুখের উপরে কথা বলে সাহস কত!

তারপর নীরবতা। কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসের উদ্দেশ্যে আরেকজন নিজের ঘোষণামত বেরিয়ে পড়ল।

খুব করে কাঁদতে ইচ্ছে হল ছমিরণ বিবির, কিন্তু এখন কাঁদলো না। কেবল টপ্‌টপ্ পানি পড়ছে চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে, এটা পুরাতন অভ্যাস। ফিরে আসে নিজের ছোটো কামরায়। বৌয়ের দেওয়া সাফ কাপড়টা পরনে ছিল, সেটা খুলে রাখল, এবং নিজের ময়লা কাপড়টা পরল আবার। আগের মত বোচকা বাঁধলো। ছোকরা নুরা ঘোরাফেরা করছে, ওর দিকে তাকাল একবার, তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে চঞ্চল হয়ে উঠল। গাঁটরী খুলে দেখল, পাওয়া গেল না খুঁজতে থাকে চৌকির উপরে, তোষকের নিচে। ও হ্যাঁ, এইতো সেই পোস্টকার্ড ঃ ড্রেসিং টেবিলের এক পার্শ্বে পড়েছিল, সেটা তুলে নিল।

বারবার উল্টেপাল্টে দেখে সেটা, তেমনি আছে। দু'মাস ধরে নিজের কলজের মত রেখেছে বালিশের নিচে, শিকের পাতিলের ভিতরে। ইস্কুলের ছাত্র, কিংবা শিক্ষিত অন্য কাউকে পেলে মিনতি করে ডেকে এনেছে বারান্দায়। তাকে দিয়ে পড়িয়েছে আগাগোড়া। কিনা লিখেছিল? গোটা গোটা অক্ষর। একটা লাইন মনে আছে—'মা, তোমাকে দেখিতে যাইতে সময় হইতেছে না, সুযোগ পাইলে কাহারও সঙ্গে আসিয়া কিছুদিন বেড়াইয়া যাইও।

ঝর্‌ঝর্ করে এক সঙ্গে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল এবার পোস্টকার্ডটির লেকার উপরে। তাড়াতাড়ি চলে এল। সেটা রাখল আবার যত্ন করে গাঁটরীর ভিতরে।

দরোজা ভেজানো ছিল, নুরা রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছে, হয়তো তারই জন্য। আস্তে আস্তে বেরুল ছমিরণ, নিঃশব্দে হেঁটে রাস্তায় চলে এল। আমিনার মা'কে এখন পাওয়া যাবে না, কাজ সেরে হয়তো গ্রামে ফিরে গেছে। কোথায় যাবে এখন? কোন্ দিকে চেনা রাস্তা? জানে না জানে না। তবু চলতে হবে, চলতে পারে যতক্ষণ। কোন রকমে পা টেনে টেনে যদি ইস্টিশন ইস্তক যেতে পারত তা হলে গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার আশা ছিল। একটা রেলগাড়িতে চড়ে বসলেই হতো তখন। কিন্তু যেতে পারবে এতদূর? আমিনার মা'কে পাওয়া গেলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না। ব্যবসা করে, রেশনের গম তেল নুন চিনি নিতে আসে—কোনো বস্তির গলিঘুপচিতে চেনা লোকের সঙ্গে থাকে, তার সম্পর্কে এখন ভেবে কি আর লাভ। ফুটপাথ ধরে হাঁটছে, বেশি কড়া নয় রোদ তবু গায়ে লাগে, ঘামে ভিজে গেছে শরীর।

সারাদিন হাঁটতে হাঁটতে ভুখে-তিয়াসায় বেচইন, সুরুজ ডুবছে এবং আঁধার যেন কেবল বাইরে নয় ভিতরেও। ডানদিকে কিছু পতিত জায়গা, রাস্তার ধার দিয়ে তার কাঁটাতারের বেড়া। ভিতরে কয়েকটি ছাপরা ডেরা এবং একদিকে কয়েকটি সিমেন্টের তৈরি বড় বড় পাইপ। কাঁটাতারের বেড়ায় একটি ফাঁক-একটা মেয়ে ভিতরে ঢুকছিল, তার পিছু নিল। ওদিকে ইঞ্জিনের হুঁস্‌হুঁস্ আওয়াজ শুনা যাচ্ছে, ইস্টিশন বোধ হয় দূরে নয়। কিন্তু বুকের ভিতরটা যে ধড়ফড়গ করছে, কোন রকমে একটা পাইপের কাছে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। একি, চোখজোড়া ঝাপসা হয়ে আসছে কেন—তেলের অভাবে টিম্ টিম্ করতে করতে কুপি নেভার মত। গাঁটরীটা মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাতের বেলায় বিছানায় বালিশে কাত হয়ে সিগারেট ফুঁকছিল, আর ভাবছিল কলিম ঃ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, মায়ের সন্ধান পায়নি। এক সময় টের পায় বেডরুমে ঢুকছে রেবেকা, হাতের চুড়িতে রিনিঝিনি আওয়াজ। বাপের বাসায় একরাত কাটিয়েছে, বিকেলে ফিরেছে। চাপাক্রোধে ও অভিমানে কলিম ওর দিকে তাকাচ্ছে না, দু'একবারে শুধু আড়দৃষ্টিতে দেখেছিল। একদিনেই যৌবন বেড়ে গেছে রেবেকার, বেশ হাসিখুশি। ব্যবহারে কৌতুকের উকিঝুকি। পা টিপে টিপে একেবারে কাছে এসে গেল, কলিমের চোখ নিচে, সে অবস্থায়ই দেখে রেবেকার হাতে একটা হাফপ্লেট আর তাতে কয়েকটি পুলিপিঠা।

নাও তোমার পুলিপিঠা। মা'য়ের হাতের জিনিশ আফসোস ছিল, মজা করে খাও। কলিশ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকালে রেবেকা মিষ্টি হাসল, তারপর বলল, বাব্বাহ্ সাহেবের রাগ এখনো পড়েনি দেখছি। সব তো আর ফেলে দিইনি? ঠিক দ্যাখ আমিই আগে খাচ্ছি। বাব্বাহ্ কি মজা। ভিতরের তিলের খিসা, সোঁদা সোঁদা গন্ধ। টেস্ট না করলে ভীষণ মিস করতাম—'

একটা পিঠার অর্ধেকটা নিজে খেয়ে বাকী অর্ধেকটা সহসা হাত বাড়িয়ে কলিমের মুখে ঠেসে দিল, তারপর খিল্খিল্, করে কানের দুল নাড়িয়ে হাসতে থাকে, কলিমের বিরক্তি উচ্চারণ, আহ্ কি করছ এসব?

এত ভাবছ কি, শুনি? কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্বামীর কাছে আসে রেবেকা, ওর নাকটা ধরে একটা ঘুরানি দিল, তারপর বলল, মায়ের চিন্তা করছ তো? তুমি একটা আস্ত বোকা! মা গ্রামে ফিরে গেছেন, তোমার সেই মাটির কোলে জানো! ভাবছি, আমরা বেড়াতে যাবো। যা ভাল লেগেছে খুব মজা করে পিঠা খাবো চলনা গো জল্দি।

পিছন থেকে গলায় কোমল বাহুবেষ্টনে কিঞ্চিৎ বিব্রত কিন্তু ভাবল স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম। সে আলতোভাবে ধরে রেবেকার হাতের আঙুলে গেঁথে তোলে নিজের হাতের আঙুল।

এখনো ফরসা আছে কিছুটা। কথা বলার শক্তি যেন হারিয়েছে। হাতের ইশারা করলে পাইপের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই আধন্যাংটা উলাঝুলা মেয়েটা—সে ওর মগের পানি খেতে দিল।

আবার ইঙ্গিত করলে বোচকা খুলল মেয়েটি, এবং ময়লা কাপড়-চোপড়ের ভিতর থেকে বের করল সেই পোস্টকার্ডটা-তক্ষুণি টেনে নিল ছমিরণ বিবি, হাত কাঁপছে, তবু টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল। অংশগুলি ছড়িয়ে দিল, কয়েকটি উড়ে গেল দমকা হাওয়ায়।

চাঁদ উঠেছে, রূপালি ধারায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লে নির্জীব শরীরের ভিতরে যেন একটু তেজ এল। উঠে বসে ছমিরণ। এবং দু'হাত বাড়িয়ে জড়ো করতে থাকে পোস্টকার্ডের টুকরোগুলো। যে কয়টি পেল তাই মুঠো করে মুখের কাছে ধরে ভেঙে পড়ল কান্নায়। কাঁদতে কাদতে আবার কাত হয়ে পড়ল।

পরদিন আঞ্জুমানের গাড়ি আসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। এটা কার লাশ? আশেপাশে গ্রামীণ কয়েকজন দু'পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বোবার মত। মেয়েটি দেখিয়ে দিলে কাছাকাছি ছড়িয়ে পড়ে থাকা টুকরো কাগজ সাজিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল শিক্ষিত কর্মচারীটি, কিন্তু ঠিকানাটা উদ্ধার করতে পারলো না।

জুলাই, ১৯৭৫

দূরযাত্রা



একটু আগে আরেক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ঘরবাড়ির পিছনেই অন্ধকার বনতল। টুপটাপ ফোঁটা পড়ছে। এখনো ঝোপঝাড়ে ঝিরঝিরে পানি পড়ছে গড়িয়ে গাছগাছালির গতর বেয়ে। উপরে টইটম্বুর মেঘরাশি, কোথাও কোথাও দুধেল গাইয়ের মোটা মোটা বারে মতো ঝুলছে।

ক'দিন ধরেই এমন অবস্থা, অবিরাম খেলা চলেছে। এই ঝর্‌ঝর্ ঝম্‌ঝম্, এই থমথমে। গাঙের বুক জুড়ে তোলপাড়।

কিন্তু শুদু এজন্য নয়, হাছুইন্যার আরো দুঃখ আছে। একটানা বাদলার সময়ে কাজ মেলে না, পাকালে পাতিল চড়ে না ঠিক, তবু পেটের ধান্দাটাই তো শেষ কথা নয়।

এই ভেজা তেঁতুল গাছটাকে এক হাতে ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে অন্য কিছুর জন্য। ভালো কামলা সে ; পেশীবহুল হাত পা, গলায় তাবিজ। বুক ভরা বড় কলজে আছে। তবু আজকাল ভয়ও পায়।

ঘনঘন বিজলি চমকের সঙ্গে গুড়গুড় ধ্বনি উঠতে থাকলে হুঁশিয়ার হয়ে যায়। এই তো, দিন পরনোর আগে, এমনি বর্ষনের রাতে মাছ ধরতে গিয়ে মরেছে সেকান্দর, লাল আগুনের ঠাটা মাথায় পড়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছলে গিয়েছিলো। যার যেভাবে মউত। সে ছিলো কোচের ওস্তাদ, কাছাকাছি এলে রুই কাতল গজার কোনো মাছই রেহাই পেতো না। একেবারে মোক্ষম নিক্ষেপ—বিঁধবেই। কিন্তু শয়তান ওস্তাদের ওস্তাদ —চক্ষের নিমেষে স্তব্ধ করে দিল। তখন সে কি বদ চিন্তা করছিল, কে জানে। ভালো সাজা পেয়ে গেছে।

তার মতো এত জলদি মরতে চায় না।

তাই শয়তানকে ডর লাগে, কিন্তু এখন, শয়তানকে পেতেও চায়।

টান হয়ে দাঁড়ালো তেঁতুল গাছটার গুঁড়িতে-পিঠ চাপড়িয়ে আদর না করুক, শয়তান যদিও একটু ফুঁও দিয়ে যায় তবু ভাগ্যি। তখন আর কেউ পারবে না তার সঙ্গে। না গায়ের জোরে, না খারাবীতে। তাবিজ দিয়েছেন জবু খন্দকার এবং এই গোপন এলেমাটিও, এক টাকার সালামী পেয়েই।

একটা লোককে সে খতম করতে চায়।

শয়তান থেকে দূরে ছিল কত দোয়া দরুদ নিয়ে, তাই চোর হতে পারলো না, ডাকাত হতে পারলো না। পারলো না, গুণ্ডা ষণ্ডা কিছুই হতে। কিন্তু আর নয়। কি কায়দা করেই না ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাজারের গুদাম ঘর পাহারা দেয়ার জন্য।

কিন্তু মতলব টিকলো না। খবর পেয়ে চুপি চুপি, জোরে হেঁটে ডিঙিতে চড়ে চলে এসেছে। এখন বুঝবে কত ধানে কত চাল। তাকে শেষ করতে চক্ষের নিমেষ, একটা কোপেই দু'ফাঁক হয়ে পড়ে যাবে কাঁধের পরে ফুসফুস ; হৃৎপিণ্ড। আঙুলে ছটকা মেরে মুঠো বানিয়ে হাতের জোর পরখ করে দেখলো। ঠিক আছে।

আরো ঠিক সে খুন করবে ঠাণ্ডা মাথায়, কিন্তু নূরবানুকে মারবে না। নূরবানু একেবারে নির্দোষ নয়, তবু ওর গায়ে হাত তুলবে না।

এটা দুর্বলতা অবশ্যই ; কিন্তু কোথায় মূল, বলতে পারবে না। মাঝে মাঝে টের

পেয়েছে নূরবানু বদলে যাচ্ছে। কেবল শরীরে নয়, মনেও। ভরা গাঙের বান ডেকেছে ওর মধ্যে, হাঁটলে পাছা দোলে।

ভিতরে থাকতে চায় না, শাড়ি কাপড়ের আড়াল থেকে সময়ে অসময়ে উঁকি ঝুঁকি মারে গোলগাল নরম মাংসপিণ্ড ; বোঁটার জায়গা ঘিরে কালো বৃত্ত। চোখের তারায় কিসের ঘোর। থাকে আনমনা—এবং হঠাৎ মাথা তুলে কড়া কথা বলতেও কসুর করে না। এই তো সেদিন। শ্রান্ত ক্লান্ত ; সারাদিনের শেষে ফেরার পর ছালাটা মাটিতে রেখে ভাত চাইতেই শঙ্খিনীর মতো ফোঁস করে উঠল। ঘরে কিচ্ছু নেই, রাঁধবে কি? অথচ নিজের দগরটা ঠিকই ভরে এসেছিল ওই বাড়ি থেকে সন্ধ্যার সময়। মেজাজটা বিগড়ে যায়। খেঁকিয়ে উঠে গাল দিল—চুৎমারানির ঝি—

নূরবানু বুঝলো মরদটা বেশ ভুখা কিন্তু তার ভাবসাব অন্যরকম। ক্রুদ্ধ চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল নূরবানু এবং খোলা চুলেই দৌড় দিল। ওর পিছু নিল হাছুইন্যা, তার মাথায় রক্ত চড়েছে।

ছুটছে নূরবানু, ছুটছে। পাড়া না ডুবলেও, অনেক জায়গায় বর্ষার পানি এসেছে। পূবদিকে তাকালে ব্রহ্মপুত্র, মাইল দেড়েক দূরে গিয়ে মিলেছে মেঘনার সঙ্গে। ছুটছে, ছুটছে ; কাঁধের উপর থেকে কাপড় সরে গেছে নূরবানুর, তালে তালে ঝাপট খাচ্ছে বুনি জোড়া খালি বুকের উপরে। জেলা বোর্ডের সড়কে এসে দৌড়াতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

একবার টাল সামলে, দু'তিনবার হোঁচট খেয়ে উঠে পিছুপিছু ছুটেছিল কম না, কিন্তু আর পারল না। গাছগাছালির ধারে এসে হাল ছেড়ে বসে পড়ল। দারুণ হাঁপাতে লাগল, ঠোঁটের ফাঁকে নানা কথার অস্পষ্ট বিড়বিড়। অন্তত সাত বছরের ছোটো তো, মেয়েলোক হলেও জোয়ানকির একটা দাম আছে।

নূরবানু, নূরবানু। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করেছিল, জঙ্গলের ভিতর তার প্রতিধ্বনি। সাপগোপ শেয়াল তো আছেই, আজকাল ডাকাতেরাও থাকে রাতের বেলায় সুযোগ বুঝে কারবার করবার জন্য। নূরবানু ভয় পেয়েছিলো, বেশি ভিতরে যায়নি। ফিরিয়ে আনতে কি ঝামেলা। এমনি ধরনের ঘটনা ঘটছে প্রায় রোজই কিন্তু কি করবে ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজেরই অক্ষমতা। জানটাই পুঁজি কিন্তু তা দিয়ে কি হয়? পয়সা আসে না। পুরুষের কাছে নারী কি চায়? সন্তান, সুখ শান্তি নিরাপত্তা। প্রেম না হলেও চলে। কিন্তু কপাল গুণে প্রেমও পেয়েছিল নূরবানুর কাছ থেকে, আসল মহব্বত। বাপ নায়ের মাঝি, লোকমান, তল্লাট জুড়ে ছিল তার খ্যাতি ; বিশেষ করে, নাইওর যাওয়ার সময় তাকে চাই-ই। কাজ শিখতে এসেছিল, লেগে থাকত ছায়ার মত। এক সানকিতে খাওয়া-দাওয়া করেছে কতদিন। পয়সা জমিয়ে একটা নোলক কিনে দিয়েছিল, যত্ন করে পরত নূরবানু। বিয়ের আগে কুঁড়েঘরের ভিতরে পাশাপাশি ঘুমিয়েছে। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা ; হাতে নিয়ে হাত ঠেকানো। কত স্মৃতি। সংগ্রাম শুরু হলে, লোকজন পার করবার সময় আশুগঞ্জের যুদ্ধের প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল, বাপজান ফিরলো না; কিন্তু মেঘনার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে ডুবে ফিরে এসেছিলো হাছুইন্যা—কেঁদেছিলো। দুইজনে জড়াজড়ি করে। নৌকাটা ভাসতে ভাসতে পাড়ে এসে ঠেকেছিল। নাওটা ফিরে পায়। কিন্তু নসিব মন্দ, সংগ্রাম শেষ হয়ে গেলে একরাতে কা'রা ঘাট থেকে চুরি করে নিয়ে গেল। সেই থেকে বেছে নিয়েছে

কুড়ালীর কাজ। কিন্তু গ্রাম-দেশে কয়জনে আর লাকড়ি কাটায়? গাছগাছড়াও কমে যাচ্ছে।

সব ভাগ্য! নইলে কেন এসব হবে? ভাগ্য যার ভালো ছাপ্পর ফুঁড়ে আসে তার কাছে ধন-দৌলত, মান-সম্মান। ওই তো মান্না, বিড়ি ব্যবসায়ী ছিল। গোলমালের সময় লুটপাটে অংশ নিয়েছিল, আর রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ। ভৈবর বাজারে গুদাম রেখেছে ভাড়া করে, নরসিংদিতে পেতেছে গদী। মান্না থেকে মান্না মিয়া, এমন হয়েছে মান্নান সাহেব। নামের আগে সৈয়দও লাগাবে শোনা যাচ্ছে। গোকুলনগরের সৈয়দ বাড়ির কাছে যে তার নানার বাড়ি। দানখয়রাতও করে, লোকে বলে বড় হাত। বড় হাত, একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোনে, হ্যাঁ, বড় হাত—মন্দ কিছু ছিলো না, কিন্তু সেই বড় হাত যে পরের বৌয়ের দিকে বাড়াচ্ছে এখানেই মুশকিল। তার বড় হাতটা একটু ছোটো করা দরকার।

কাছাকাছি বাড়ি। ওই যে জাম্বুরা গাছটা, তার পরেই দরোজার মতো ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে গেলে রান্নাঘর।

দুঃসময়ে রান্নাবাড়ার কাজে লেগেছিল নূরবানু, অনেকটা অনিচ্ছাতেই। কিন্তু এতে দোষেরও তো কিছু ছিলো না।

কাম-কাজের সময় নানা অছিলায় পাকালের কাছে কি শোওয়ার ঘরে আশেপাশে ঘুরঘুর করে ফুসলিয়েছে নিশ্চয়ই, নানা রকম লোভ দেখিয়েছে। ভালো হওয়া কঠিন কিন্তু সহজেই নষ্ট হওয়া যায়।

প্রত্যেক ঈদের সময় একটা শাড়ি একটা বেলাউজ, গতবার অতিরিক্ত একটা সায়া এবং দুই পাতা চুলের কাঁটাও উপহার পেয়েছে। ছোট-বৌ ছোট এক শিশির হাফ শিশি আলতা দিয়েছিলেন। ছনের ঘরে আবের তেলকি। এইটুকুতে সাজলেও চোখে পড়ে না ; কিন্তু যে লোক একটা ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি পরে থাকে আর গামছা কিনতে হিমসিম তার কাছে এটা বেমানান নয় কি!

বৃষ্টি বাদলের দিন, জরুথুবু ছনের কুঁড়েটা মেরামত করবার জন্য তিনশো টাকা ছুঁড়ে মেরে দিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল কি দিলদরিয়া আদমী। এখন বুঝতে পারছে আসল মতলব। নূরবানুকে নরসিংদি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে সায় দেয়নি। ওখানে নাকি খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে! হোটেল থাকলে অসুবিধে কি ; তা'ছাড়া পয়সা দিলে বাঘের চোখ মেলে, বাবুর্চি কোন্ ছার। শিগগিরই ওকে দারোয়ান করে নিয়ে যাবে এমন কথাও দিয়েছে। মাসিক আড়াইশো টাকা বেতন, ভালো চাকরি। আসলে পেটের ভিতরে অন্য প্যাঁচ ; পাঁচজনের কানাঘুষা শুনেছে, মান্নান নূরবানুকে নাকি চালান দেবে লিবিয়াতে।

নূরবানুর বাচ্চা-কাচ্চা নেই। একটা হয়েছিল কয়েক বছর আগে, পেট ফুলে মারা গেছে। নূরবানু জলজলা, তাতে নাকি আরো সুবিধে হয়েছে। শালা হারমাদ।

হঠাৎ এক পলক বাতাস এসে কাছের বাঁশ ঝাড়টাকে নাড়া দিল। ঝরঝর করে অনেক পানির ফোঁটা পড়ল এক সঙ্গে, তেঁতুল গাছের পাতা থেকেও পড়ল। শিরশির করে ওঠে গতরটা, লোম খাড়া হয়ে যায়। মাটির তলা থেকে যেন ফোয়ারার মতো অসম্ভব শক্তি ওরা শিরা বেয়ে উঠছে। হাত মুঠো করে ঝাড়া দেয় কুস্তি লড়বার আগে পালোয়ানের মতো। এত জোর। ইচ্ছে হয় গুঁতো মারে, ধাক্কা মেরে কাত করে ফেলে বড় বড় গাছ। তুড়ি মেরে দৌড়ে বেরিয়ে এল, পথে পড়ল। জোর পা চালিয়ে চলতে লাগল নদীর দিকে। চোরের উপরে বাটপাড়ি করতে হবে। সোনা মাঝির সঙ্গে সব পাকাপাকি আছে। কিছু সময়ের জন্য

সেই হবে সোনা মাঝি, তারপর—?

অন্ধকার মেঘলা আকাশের তলে থইথই করছে মেঘনা, চারদিকে আসন্ন দুর্যোগের ছায়া। কিছুক্ষণ লগি বেয়েছিলো। এখন মাঝগাঙে এসে পড়েছে, বৈঠা বেয়ে বেয়ে। পিছনে, বেশ দূরে আশুগঞ্জের আলোকমালা, তার মধ্যে দৈত্যাকার ব্রীজের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কোনদিকে খেয়াল করবার মতো মনের অবস্থা নেই, ধমনীতে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। ডিঙির পিছনের দিকটা ছই ধরে শাদা চাদর দিয়ে ঢাকা, সামনেও কাঠের দরোজা। ভিতরে বিছানাও আছে। তার উপরে ওরা দুইজন। একটা হারিকেন জ্বালানো আছে, কিন্তু সলতে কমানো। দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু অনুমান করছে। চিনচিন করে মগজের ভিতরটা, চোখে ঝাপসা দেখে। হাতের কাছেই তো আছে কুড়ালটা, পাটাতনের নিচে। তুলে নিতে পলকের ব্যাপার। কিন্তু না, ধৈর্য হারালে চলবে না। খুন করার জন্য উপযুক্ত জায়গা ও উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন।

গাঙের ধারে ধারে বাতি আছে, লোকজনের নড়াচড়া আছে। ফকিরার চর পেরিয়ে গেলে বেশ একটা ফাঁকা। সেখানে সুবিধা হবে।

বদমাশের সব চালাকি বোঝা যায়, অনেকক্ষণ কেটেছে, এখন কুকাজ শুরু করতে চায় নিশ্চয়ই।

চাদরটা ফাঁক করে মুখ বাড়ালো, সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। জিগগেস করলো, মাঝি! দিনের অবস্থা কিমুন?

ভেবেছে, সোনা মাঝি, কিন্তু আসলে তার আজরাইল যে তা জানে না। গিলাফে মাথা ঢাকা ছিল। ঠাণ্ডাস্বরে জবাব দিল, ভালাই।

মান্নান ধরতে পারলো না। হাত বার করে সিগারেটের শেষাংশটা পানিতে ছুঁড়ে মারলো।

এ সময় হঠাৎ বিজলি চমকালো, উত্তর দিকে গুড়গুড় ধ্বনি। ঝিরঝির হাওয়া বইছিল, তার গতিতে যেন জোর লাগল।

বাতাসের উল্টো স্রোতে বৈঠা বাইতে বাইতে হাঁপাচ্ছে, সারা গতর ভিজে গেছে। বৈঠা বাওয়া একটু থামিয়ে যান হাতের আঙুল বাঁকা করে কপালের গাম কাছলো। বিজন চর আর বেশি দূরে নয় তার কাছাকাছি যেতে পারলে বৈঠা বাওয়া ছেড়ে দেবে, আর তখন বাতাসই ঠেলে ঠেলে নেবে চরের দিকে।

সারাদিনের ক্লান্তিতে বালিশের আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কি নূরবানু? না, তা হতেই পারে না। জানোয়ারটা ওকে চোখ বুঁজতেও দেবে না। জানোয়ারটা ওকে চায়।

অনুভব করে হাছুইন্যা পটপট করে কাঠের মধ্য দিয়ে নদীর ভিতর থেকে তার শরীরে শক্তি বেয়ে উঠছে, বাঘের মত জ্বলতে লাগল চোখজোড়া। নৌকোর ভিতরে পাটাতনে ঝকর ঝকর শব্দ, সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বৈঠা রেখে দিয়েছে। ইচ্ছে হল, এক লাফে গিয়ে চাদরটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে। কিন্তু তার বদলে পাটাতন উল্টিয়ে কুড়ালটা টেনে নিল।

দমকা বাতাসের ঠেলায় নৌকোটা হেলতে দুলতে থাকলে তার ভিতর থেকে কড়া হুকুম, কি করস সোনা! পারের দিকে বাইয়া যা।

আর সহ্য হলো না। লম্বা পায়ে ছইয়ে যায় কাছাকাছি, হেঁচকা টানে খুলে ফেললো চাদর। নূরবানুকে জাপটে ধরে আছে, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে নূরবানু। কিন্তু

নিঃশব্দ। পাটাতনে জোরে পদাঘাত করলো হাছুইন্যা, চিৎকার করে বললো, সোনা না, তর মরা বাপ। বাইর অইয়া আয় বান্দির পুৎ। তরে আমি জাহান্নামে পাডামু।

ও, এই ব্যাপার! নূরবানুকে ছেড়ে দিল। নূরবানু সোজা হয়ে বসলো, সে কাঁপছে। মান্নান বলল, তর অত বুদ্ধি হাছুইন্যা? কই আগে তো দেহি নাই?

ঝকঝক করছে কুড়ালটা হাছুইন্যার হাতে, সে ঝুঁকে পড়ে ছইয়ের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে নিল। কিন্তু মান্নান শান্ত। সে হেসে উঠল। হঠাৎ টেনে নিয়ে নূরবানুকে সামনে ধরল। আবার তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠল হাছুইন্যা, দুইড্যারেই খতম করুম—

ভিতরে জুঁকে থেকেই কাঠের বাটটা মজবুত করে ধরে, কিন্তু নাওয়ের ছই এত নিচু, খাড়া হতে না পারলে কোপ দিবে কি করে? তবু ক্ষিপ্র, মারমুখী। এদিক-ওদিক সরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ওরা, তার ফলে একেকবার কাত হয়ে যাচ্ছে সারা নৌকো।

মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে নূরবানু বলে উঠল, ইমুন করতাছ ক্যান? বেশি ভালা অইবোনা কইতাছি। মাথা ঠাণ্ডা কর।

উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে হাছুইন্যা, তার মুখ থেকে রা সরছে না। আরেক পা এগুতে চায়। এমনি সময়ে সজোরে নূরবানুকে তার উপরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মান্নান তৈরি হয়ে যায়। পাঞ্জাবীর নিচে কোমরে গোপন জায়গা থেকে পিস্তল বার করে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে তাক করলো। দাঁত কড়মড় করে বলল, আর এক পাও আগাইছস তো—

হাছুইন্যা পিস্তল দেখলো এবং ভড়কে গিয়ে পিছনে হটতে থাকে। ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পিছনে দাঁড়াল! নূরবানু বলল, কুড়াল ফালাও। এক লাফে এগিয়ে যায় মান্নান, ডান হাতে উঁচিয়ে পিস্তল ধরলো, আবার বলল, হারিকেনডা বাড়াইয়া দে নূরবানু, আমি হের কইলজার মইধ্যে গুলি করুম। না-না, দুহাতে জাপটে ধরলো তাকে নূরবানু, বলল, আপনের পায়ে পড়ি। হেরে মাইরেন না। মাইনষে তার মাথা খারাপ কইরা দিছে।

ছাড় তুই নূরবানু। থুথু ফেলে বলল মান্নান, পাতি উন্দার সাহস কত দ্যাখছসনি? হের গোশত ঘাউড়া মাছে খাইব।

অবারিত হাওয়ার চাপে হালছাড়া নৌকোটা হেলতে দুলতে চরে এসে ঠেকেছিলো, বিজলি চমকাচ্ছে। মেঘের গম্ভীর শব্দও উঠছে। দূরে-দূরে নদীর এপারে ওপারে গ্রাম, কালির পোচের মত, ঘাপটি মেরে আছে। এদিকটা খোলামেলা। বাতাসের বেগ বাড়ছে ক্রমেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আবার বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে এবং কখন শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। ঘড়ি দেখল। এখন বাজে বারোটা সতেরো মিনিট। গন্তব্যে পৌঁছতে, যেরকম আবহাওয়া, কমপক্ষে দুই ঘন্টা লাগবে আরো অন্তত। দাঁড় বেয়ে ওপারে যেতে হবে। তারপর পার ঘেঁষে লগি ঠেলা। পিছনে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না।

তিনজনেই চুপ হয়েছিল, যে-যার জায়গায়। পিস্তল ধরে আছে ঠায় দাঁড়িয়ে, সে অবস্থায়ই হুকুম করলে নূরবানু জেবের ভিতর থেকে সিগারেটের প্যাক বার করল, একটা ধরিয়ে গুঁজে দিল তার মোটা দুই ঠোঁটের ফাঁকে। সিগারেট টানে কিছুক্ষণ, তারপর ছেড়ে দিলে নিচে পড়ে যায়। নূরবানু পাটাতন থেকে তুলে নদীতে ফেলল।

মান্নান কথা বলতে থাকে একতরফা না, ঠিক কথা নয়, অশ্লীল মন্তব্য!

মাথা নিচু করে হাছুইন্যা ধারালো হাতিয়ারটা ছুঁড়ে ফেলল পানির মধ্যে ঝপ্‌ করে। বৈঠা তুলে নিল। পাকা মাঝি ছিল, বৈঠা বাইতে লাগল এক ধাক্কায় নৌকোটাকে ভাসিয়ে দিয়ে। সে

এখন বন্দী ; লোহার বেড়া নেই, শেকল নেই যদিও। উঁচোনো অস্ত্রের সামনে নিরুপায়। এভাবেই ওদেরকে নিয়ে যেতে হবে তাকে গন্তব্যে, বেশ তাড়াতাড়ি করে। ওকে মেরে না ফেলার এই শর্ত। মাঝ গাঙ ইস্তক আসতেই মুখের দুই কশে ফেনা দেখা দিল।

জিনের আছর-পাওয়া লোকের মত একটানা বৈঠা বেয়ে, লগি ঠেলে ঘাটে গিয়ে পৌছল বেশ আগেই। গ্রামের গাছপালার মধ্যে সাঁ সাঁ শব্দ, ঝম্‌ঝম্ করে আবারো বৃষ্টি এসেছিল, সে থামেনি। ভিজতে ভিজতে চালিয়ে গেছে।

নৌকো ঘাটে লাগা মাত্র একহাতে হারিকেন, অন্যহাতে নূরবানুকে ধরে নিয়ে ঝটপট নেড়ে পড়ল মান্নান, পিছনে তাকালো না।

ঘঠাং করে বৈঠাটা ফেলল পাটাতনে, হাছুইন্যা দেখল নূরবানু চলে যাচ্ছে। কি একটা উঠছে গলা ঠেলে, সেকি বেদনা না উত্তাপ? বাঁ হাতে গলা ধরে, কিন্তু সেটা থামে না। চিৎকার করতে চাইলো, বেরুল না চিৎকার। অনেক চেষ্টায় সে কাঁদতে পারল। পরে হুঁ হুঁ করে কাঁদতে লাগল, হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে। হাছুইন্যা কাঁদছে, কেবলি কাঁদছে। ঘামের পানি, বৃষ্টির পানি ধুয়ে নিচ্ছে তার দরদর ধারায় বেরিয়ে আসা চোখের পানি। কাঁদছে হাছুইন্যা। কেঁদে চলেছে।

কতক্ষণ হয়ে গেল, জানে না ; পাখি ডাকলো কি? রাত পোহালো কি? না, চারদিকটা নিঝঝুম, মেঘে ছাওয়া আসমান ; কিন্তু বৃষ্টি নেই, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

হঠাৎ গলুইয়ের দিকে একটা ঝাঁকুনি, কে যেন উঠল। দরোজা পেরিয়ে ছইয়ের ভিতর দিকে এগিয়ে এলে বেসামাল নূরবানু, পাগলীর মতো বলছে, জলদি নাও ভাসাও ; জলদি। হয়তানডারে মাইর দিয়া আইছি ; গেয়ান আরাইছে। জলদি নাও ভাসাও।

প্রথমে থতমত খেয়ে যায়, কিন্তু সজাগ হতেও দেরি লাগলো না। নূরবানু বৈঠা ধরলো। লগি ঠেলতে লাগল হাছুইন্যা, পরে লগি ছেড়ে দাঁড় টেনে নিল। মাঝগাঙে এলে হাওয়ার জোর। ছইয়ের উপরে বাঁধা মাস্তুলটা খুলতে লাগল।

অনুকূল বাতাসে যখন পালের টানে তরতর করে ছুটে চলেছে নৌকো ভাটির দিকে, কোলের কাছে বসে নূরবানু হাত মেলে ধরলো। হাছুইন্যা দেখে বড় সাইজের টাকার খুতি এবং পিস্তল। থমকে উঠল। বলল, একি করছস তুই নূরবানু—

উত্তরের অপেক্ষা করলো না, খপ করে নিজের হাতে নিয়ে তক্ষুণি সেগুলো ছুঁড়ে মারলো।

এমনটা হবে মনের মধ্যে জানত যেন নূরবানু, সে ক্ষেপে উঠলো না। শান্তস্বরেই বলল, খুব ব্যাডাগিরি তো করলা, আমারে খাওয়াইবা কি—তোমার লগে গিয়া প্যাডের জ্বালা দূর অইবোনা—

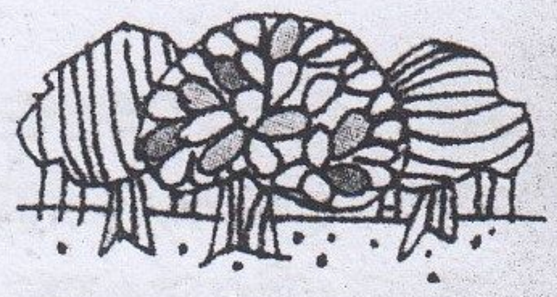
কি জবাব দেবে খুঁজে পেলো না, কেবল বগলের মধ্যে বৈঠা চেপে দৃঢ় কব্জিতে ধরে নূরবানুকে টেনে নিল কোলের উপরে। ওর চুলে মুখে ঠোঁটে আদর করতে লাগল। কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দেয় নূরবানু, নীরবে কাঁদতে থাকে গাল ভাসিয়ে।

নৌকো এগিয়ে চলেছে, নদীর পানিতে ফেনা তুলে সরসর শব্দে আধো অন্ধকারে।

ওরা যাচ্ছে উত্তরে যেখানে পাহাড় আছে, হাওর আছে, গাঙের ধার ঘেঁষে বড় জঙ্গল আছে।

জুলাই, ১৯৮০।

রত্না আমি ও একটি কুকুর



হঠাৎ করে রত্নাকে আমি এমন ভালোবেসে ফেলবো তা আমার ধারণার মধ্যেও ছিল না। অথচ তা ঘটে গেছে।

এখন রত্না ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। রত্না আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে, হাঁটছে ভাসছে। আমার প্রাণে রত্না, আমার ধ্যানে রত্না। রত্না আমার শয়নে, স্বপ্নে রত্না আমার। আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা একটি তির্যক বিন্দুতে ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ, সজ্ঞানে চেষ্টা করেও তার থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। যখন-তখন বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করি একি যন্ত্রণা, একি বেদনা। অন্ধকারে তার দেহবল্লরী রক্তিম আভা ছড়িয়ে জ্বলে এবং যখন অন্ধকার থাকে না, আলোর মধ্যেও তার লীলাময় আনাগোনা। এক অস্বস্তিকর তন্দ্রার ভিতরে ওলট পালট হতে হতে নিবিড় স্রোতের টানে বহু দূরে চলে যাই। কি মুশকিলেই পড়েছি, বাইরে থেকে কেউ জানে না। আন্দাজও করতে পারে না। এই এখনো যখন ভর দুপুরে রিকশায় বসে যাচ্ছি ওদের বাড়ির দিকে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমার পাশে সেও বসে আছে এবং তার চুলের গোছা আমার গায়ে এসে লাগছে বাতাসে উড়ে উড়ে।

সেদিন আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ ছিল, আর ছিল হাওয়ায় কিছু ঠাণ্ডার আমেজ। কিন্তু সন্ধ্যার পরে ঝমঝম বৃষ্টি এসে গেল। আমি তাড়াতাড়ি গেট খুলে এক দৌড়ে ওদের বারান্দায় গিয়ে উঠেছিলাম। তবু একটা ঝাপটায় আমার মাথা এবং কাপড় জামা ভিজে গিয়েছিল।

কি কাজে এদিকে এসেছিল। দেয়ালের কোণ থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে জলদি জিগগেস করল, কে ওখানে?

তার দিকে ঘুরে আবছায়ায় হেসে বললাম, আমি—আমি আনিস। আনিসুল হক।

ও মাস্টার সায়েব। এক পা সামনে এগিয়ে রত্না বলল, আপনি এসে গেছেন?

হ্যাঁ, দিনটা খারাপ, ভাবলাম একটু আগেভাগেই যাই। আমি বললাম, তাছাড়া সোয়া ৯ টায় আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

মেঘের গুড়গুড় আওয়াজে ভূমিতল কাঁপল আর বিজলি চমকে রত্নার পূর্ণ অবয়ব ক্ষণিকের জন্য আমার নজরে পড়ল। অপূর্ব লাগল তাকে। মনে হল, একটু আগে প্রসাধন করেছে। কাজলে টানা চোখজোড়া, কপালে লাল টিপ। মসৃণ গলায় নবরত্নহারটা ঝিকমিক করে উঠল। কানে সোনার ঝুমকা। পরনের জামদানিটা সত্যই মনোরম, সুন্দর করে পরেছে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক সিঁথির কাছে থেকে পাট করে আঁচড়ানো কালো চুল, যা পিঠের ওপর দিয়ে কোমরের নিচে গিয়ে পড়েছে।

মুহূর্তে আমি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম, মুখের পাশ থেকে চুলের গোছা সরিয়ে রত্না মিষ্টি করে বলল, ঘরে আসুন। ওদের ডেকে দিচ্ছি।

দেয়ালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে পটপট সুইচ টিপল। ড্রয়িংরুমে বালব জ্বলল এবং বারান্দার নিওন টিউবটা ক্রমে শাদাটে আলোয় ভরে যেতে লাগল।

আলোর মধ্যে, একটু লজ্জা পেয়েই যেন দ্রুত চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেমন করে জানি না, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটি শব্দ, একটু দাঁড়াও রত্না।

রত্না ঘুরে দাঁড়ায়, কিন্তু আমার দিকে সম্পূর্ণ তাকাতে পারলো না। আস্তে উচ্চারণ করল কি—বলুন।

তোমাকে অপূর্ব লাগছে রত্না। সত্যি তুমি সুন্দর। তুমি অতুলনীয়। যেন আমি নই অন্য কেউ—এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম। বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছিল, যদি কেঁপে যায় কণ্ঠস্বর। কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে জিগগেস করলাম, কোথাও যাচ্ছ বোধ হয়?

ঠোঁট জোড়ায় লাল রঙের হালকা ছোঁয়া লাগিয়েছে, শান্ত চেহারায় ও জবাব দিল—হ্যাঁ রানাকে চেনেন তো? ওর বোন আমার বান্ধবী আইভির বিয়ে। সারাদিন ওখানেই ছিলাম, এখন যাচ্ছি আবার। বাবা চেম্বারে আছেন তো ড্রাইভারের জন্য ওয়েট করছি।

এমন স্বপ্নময় রাত আমার বাইশ বছরের জীবনে এই প্রথম। থেকে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল, মেঘে মেঘে মন্দ্রধ্বনি আর হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তারও চেয়ে বড় আলোড়ন চলছিল। একি বলে ফেললাম আমি! বলা কি উচিত হয়েছে? কত সুন্দর জিনিশই দেখি আমরা চারদিকে, কিন্তু সবকিছু সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ তো নয়। প্রতম ভেবেছিলাম, একটি সরল প্রশংসা বাক্য, আচমকা বেরিয়ে গেছে কিন্তু সে প্রশংসার নিচে গভীর সমুদ্রের একটি অতল উৎস আবিষ্কার করে আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। রত্নার ছোট ভাইবোন আমার ছাত্রছাত্রী এসেছিল। বসেও ছিলাম ওদের নিয়ে। কিন্তু গাড়ি এলে, বারান্দা পেরিয়ে ওর চলে যাওয়ার শব্দ শুনলাম এবং সেই শব্দ যেন জেগে রইল আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে। আমার শিরা-উপশিরায় সমগ্র সত্তায়। আমার মন্তব্যে হঠাৎ লাজনম্র-কালোচোখের তারায় তার নিবিড় চাউনি বারবার ভাসতে লাগল আমার মনের মুকুরে। ওদের ছুটি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং তিনটা বাস ফেল করে, তারপর কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে খিলগাঁও-এর ঘুপচিতে আমাদের দক্ষিণ ভিটির ছোট টিনের ঘরের ততোধিক ছোট কামরায় তেল চিটচিটে ময়লা বালিশে শুয়েও ভুলতে পারি না। বরং যেন আরো স্পষ্ট হয় দৃশ্যাবলী।

ওদের বাড়িতে কোচিংয়ের ফাঁকে যথারীতি খেয়েছিলাম মোবারক টি এবং তক্তা বিস্কুট। এখন বৃষ্টি একটু ছ্যাক দিলে মা ভিতরে ডাকলেন। পাতে গরম ভাত এবং মাছের তোলা সালুন। বাজান রিটায়ার করেছেন, এখন বলতে গেলে বড় ভাইয়ের সংসার। মাশাল্লা তার পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র, আরো একজন পেটে আছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষায়। ওরা দু'জনেই খুব খুশি। বিশেষত ভাবী নূরজাহান বেগম। বরাবর একটা কোলে না থাকলে তার ভালো লাগে না, তার সইকে বলেছিলেন যা আমরাও জানি।

প্রথমে মুদি দোকান করেছিলেন শান্তিনগরের চৌরাস্তার মোড়ে, এখন সেটা কমিয়ে ফেলেছেন। দু'ভাগ করে বড় ভাগে করেছেন মেডিক্যাল স্টোর। সমস্ত খরচ চালিয়েও দু'পয়সা আয় হচ্ছে।

প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান পাস করলেও আমি ইউনিভারসিটিতে এডমিশন নিইনি তার কারণ ফিসের অভাব নয়। শুধু ভর্তি হওয়ার মতো টাকার অভাব ছিল না। কিন্তু একবার নাম লিখিয়ে আমি অবিচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই। মাঝখানে ভঙ্গ দিলে আমার স্বপ্ন সফল হবে না। আমি একজন আণবিক বিজ্ঞানী হবো, এই আমার সংকল্প। জিনিশটা আমার মাথায় ঢুকেছে গল্পের বই পড়তে পড়তে প্রবেশিকার সময়েই আমি উপলব্ধি করেছি, যে যুগটা বেরিয়ে আসছে তা হবে আণবিক যুগ, তাতো বটেই, কিন্তু আমাদের বেলায় তার আরো বেশি তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের জায়গা কম ; মানুষ বেশি। শক্তির উৎসও সীমিত। সুতরাং আণবিক শক্তির উন্নয়ন ও তার ব্যাপক ব্যবহার ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই হবে মুশকিল। একমাত্র মা'ই জানেন আমার মনের গূঢ় তথ্য, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি না হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু বুঝিয়ে বললে, মেনে নিয়েছেন। তবু আমি লাইনচ্যুত না হয়ে যাই সেদিকে কড়া নজর। আমার চেহারা নমুনা ও

স্বাস্থ্যটা যাতে ঠিক থাকে সম্ভবত সেই কারণেই কিলিবিলি বাচ্চাদের গোগ্রাস থেকে বাঁচিয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য শিকেয় তুলে রাখেন আমার জন্য। এটা আমার পছন্দ নয়। তবু মেনে নিয়েছি, কারণ আমার ফেরাটা অনিশ্চিত।

আমিই একমাত্র জীবিত চাচা সুতরাং ভাতিজা-ভাতিজি যে কয়টা এখনো ঘুমায়নি, আমাকে ছেকে ধরে নানা প্রশ্ন করে। এরই মধ্যে মা দেখলেন আমি মুখ গোমড়া করে আছি। কাছে এসে বসলেন জলচৌকিতে এবং শুধালেন—কিরে আনিস তোর হয়েছে কি? কর্থাবার্তা বলছিস না যে?

না মা, কিছু না। আমি বললাম, বাসে যা ভিড়! আজকে ঝুলতে ঝুলতে এসেছি। ক্লান্ত লাগছে।

বিশ্বাস করলেন মা, বললেন্য—জলদি শুয়ে পড়গে যা। সারাদিন তো খাটুনি ; ভালো ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাসন-কোসনের আওয়াজে ছোট ভাতিজা হিন্দোলের ঘুম ভেঙে গেলে সে বর্ণমালা হাতে আমার কোলে উঠে বসল। ভালোই ভক্ত ; আমার কাছে ছাড়া সে পড়ে না। কোনরকম গোঁজামিল দিয়ে যখন ওকে শুইয়ে দিলাম, তখন আবার বৃষ্টি এসে গেছে।

টিনের চালে অবিশ্রান্ত বর্ষণ অনন্ত শব্দের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘনিয়ে তোলে। এই আষাঢ় দেখছি শ্রাবণের বাড়া। বাতি নিবিয়ে গায়ে কম্বল টেনে নিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে যাই।

কতক্ষণ পরে বলতে পারবো না কাঁধে একটা ধাক্কা। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বাইরে প্রবল বারিপাত ছিলো না, বিজলি চমকাচ্ছিল। সেই আলোকে, আশ্চর্য দেখলাম কে দাঁড়িয়ে আছে শিয়রের কাছে? আমি উচ্চারণ করলাম,—একি রত্না! তুমি!

তেমনি তার দীর্ঘ কালো চুল কোমরের নিচে গিয়ে পড়েছে, গ্রীবাভঙ্গি করে বলল, উঠুন জলদি।

কোথায় যাবো? বেজায় অপ্রস্তুত আমি, বোকার মতো তাকিয়ে আছি।

আহ, চলুন না। আমার হাত ধরে টানতে টানতে রত্না বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, আমি কিছছু বুঝতে পারছি না।

রত্না বললো, কিছছু বুঝতে হবে না। আমরা নৌকা ভাসিয়ে দূর প্রবাল দ্বীপে চলে যাবো, বেশ হলো তো?

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল, আলোড়িত মেঘরাশির আড়াল থেকে বেরিয়ে নিচে শহরের ওপরে ছড়িয়ে পড়ছে খণ্ড চাঁদের ম্লান আলো। এবং তাজ্জব, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম, চারদিকে কেবল পানি আর পানি। পানি থইথই করছে। আমাদের ঘরের দরোজার কাছে একটি ছিমছাম ঈষৎ গোলাপী রং ডিঙি, যেন শিরশির কাঁপছে। হেলছে দুলছে। প্রথমে উঠল রত্না, আমার হাতে বৈঠাটা এগিয়ে দিল। রত্না, হাঁটু উঠিয়ে আরাম করে বসেছে। আমার দিকে ওর প্রস্ফুটিত মুখ, সূর্যমুখীর মতো। হঠাৎ কি জানি হল, ভিতরে একটা দারুণ প্রেরণা—একটা জোর ঠেলা দিয়ে ভাসিয়ে দিলাম। ডিঙির দোলার সঙ্গে দুলছে রত্না, রত্নার রক্তিমাভ সারা চেহারা। সিনেমা জুম শটের মতো ক্রমে কাছে, আরো কাছে ওর ঠোঁটজোড়া। কপালে গালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

এদিকে মতিঝিলের খালটার কাছে আসতেই দেখি তাতে প্রবল ফেনিল স্রোতধারা ; আমি যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম! আচমকা ডিঙিটা একটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে উল্টে যায়। রত্না হারিয়ে যাচ্ছে—হ্যাঁ হারিয়ে যাচ্ছে জলোচ্ছ্বাসের ভিতরে, প্রাণপণে আমি সাঁতরে

তাকে ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ধরতে পারছি না। হারিয়ে যাচ্ছে, রত্না হারিয়ে যাচ্ছে। এই তো ওর উত্তোলিত হাত একবার দেখলাম, আমি চিৎকার করে উঠলাম, রত্না—!

আশ্চর্য নয়, এ একটা স্বপ্নমাত্র এবং সেটা যখন ভেঙে গেল তখনো আমি কাঁপছিলাম। বিছানায় উঠে হাঁপাতে লাগলাম।

পরদিন সারাক্ষণ এই স্বপ্নের মায়াজাল থেকে আমি মুক্ত হতে পারলাম না। নাশতার পর যথারীতি ভাইযের মেডিক্যাল স্টোরে সাহায্য করতে গেলাম। কিন্তু প্রেসক্রিপশন ঝাপসা ঠেকছে, হিজিবিজি ওষুধের নাম। ওষুধ দেয়া বিপজ্জনক হতে পারে। অগত্যা এক ছুতায় বেরিয়ে পড়লাম। আমার উপরে যেন জিনের আছর হয়েছে, দিনে দুপুরে যত অজায়গায় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শেষ ইস্তক নিউ মার্কেট। অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে নতুন কবিতার একটা বই কিনলাম। একি অদ্ভুত! যাকে ইচ্ছে করে ছেড়েছি, আবার তার খপ্পরে পড়তেও দেরি হলো না! শুনেছিলাম স্বপ্ন অবাস্তব ব্যাপার, ঘুমের ঘোরে উষ্ণ মস্তিষ্কের আজগুবি ক্রিয়াকাণ্ড কিন্তু এখন যে স্বপ্ন আমাকে পরিচালনা করছে তা কি সম্পূর্ণ নিরর্থক? আমার দু'চোখ ভরা একি বিহ্বলতা!

সন্ধ্যার একটু আগেই ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সামনের দিকে কেউ ছিলো না। কিন্তু ভিতরের বারান্দায় পরিচিত কণ্ঠস্বর।

পা টিপে টিপে এগিয়ে দেয়ালের কোণে দাঁড়াতে দেখি, হ্যাঁ রত্নাই। তেমনি খোলা চুলে তার আদরের টেগরাকে খাবার দিচ্ছে। টেগরা তার পালিত কুকুর। আপন মনে বলছে, যখন-তখন খিদে পেলে আমি কোত্থেকে এত খাবার দেবো, হ্যা? এক্কেবারে দুর্ভিক্ষের কাঙাল হয়ে গেছিস না?

নিঃশব্দে হেঁটে কাছাকাছি গেলে প্রায় চমকে উঠল। আমি হেসে বললাম, দুষ্টুমি করছে বুঝি?

তা আর বলবেন না। আঁচলটা একটু টেনে রত্না বলল, বয়েস বাড়ছে আর ভীষণ হাভাতে হয়ে যাচ্ছে। কেবল খাই খাই। যখন-তখন এসে পায়ে মুখ ঘষে, কুৎকুৎ শব্দ করে।

আমি জানি আসলে কি চায়। আমার কথায় কৌতুকের রেশ। রত্না বেশ মজা পেল। মধুর স্বরে শুধাল, কি চায় বলুন তো?

চায়—হ্যাঁ ও চায় সুন্দর হাতের সেবাযত্ন! টেগরা সত্যি ভাগ্যবান।

ও আপনিও দুষ্টুমি করছেন। বাটিটা উপুড় করে ঢেলে দিয়ে চটপট বলল, আপনাকে বুঝি খাওয়াই না?

নিশ্চয় খাওয়াও। আমি মুখটিপে হেসে জবাব দিই, মোবারক টি'য়ের সঙ্গে যখন দেখি দু'তিনটা রসগোল্লা আর নিমকি তখন বুঝতে কষ্ট হয় না—

কিঞ্চিৎ লজ্জিত রত্না, প্রসঙ্গ বদলাতে আমার হাতের দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করল, ওটা কি বই আপনার হাতে?

একটু উপরে তুলে ধরে বললাম, নতুন কবিতার। তুমি পড়তে চাও?

ওরে বাবা। কবিতা! আধুনিক কবিতা এক ডাহা জগাখিচুড়ি, একদম অখাদ্য। সোজা হয়ে দাঁড়াল রত্না, বলতে লাগল—কি যে ছাইপাশ মাথামুণ্ডু লেখে কবিরা কিছু বুঝতে পারি না। সেদিন এক আসরে এক কবি প্রবর নাকি বলেছেন : আমি একজন দাসী চাই। কি আব্দার! সোনার চান, আমরা মেয়েরা পুরুষের দাসী হওয়ার জন্য জন্মেছি, না? ওই কবির মাথা ন্যাড়া করে হাতে ঘোল ঢেলে দেয়া উচিত—

ওহহো, তাতে ওর কপাল ফিরে যাবে বরং! আমি বললাম, রীতিমত শাপে বর!

জাগতে লাগল তার কারণ ছিল অন্য। সে রাতে যথাসময়ে উপরতলার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমার ছাত্রছাত্রী। নিজের তলার বৈঠকখানা দামী আসবাবপত্রে সজ্জিত সন্দেহ নেই, কিন্তু সিঁড়ি মাড়িয়ে প্রথমে উপরে তারপর করিডোর দিয়ে এগুতে এগুতে দুচোখ ধাঁধিয়ে গেল। জিনিশপত্রে নানা উপকরণে মাঝে মাঝে বৈদগ্ধ্যের ছাপ রয়েছে বটে কিন্তু প্রধানত সম্পদের উৎকট প্রদর্শনী। এখানেও একটি রং-বেরং সোফাসেট। দেয়ালে বাঘের চামড় হরিণের শিং। একদিকে টেলিফোন, ঝকমকে শোকেস, অন্যদিকে বড়সড় একটা ডাইনিং টেবিল। সবুজ গদি আঁটা এক ডজন চেয়ার। ক্রমে চুপসে যেতে থাকে আমার চেহারা যদিও তার কোনো মানে ছিলো না। একবিঘা জমিতে বাগানওয়ালা যাদের নিজস্ব বাড়ি এবং ডাটসান গাড়িও আছে তাদের জন্য এইতো স্বাভাবিক? কিন্তু মানুষের ভাবনা চিন্তা অনেক সময়ই যুক্তির পথ বেয়ে চলে না, অনেক সময়েই সে হয় অতিরিক্ত ভাবাবেগের শিকার। খেতে বসে উসখুস করছিলাম, আমার কাপড় চোপড় অত্যন্ত দীন মনে হচ্ছিল, যদিও সবাই আন্তরিকভাবেই আপ্যায়ন করছিলেন। ওরা আমাদের এলাকার লোক, এবং শুনেছি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে তাই বোধ হয়?

তার আগের আরও কিছু কথা আছে, একফালি বোকার হাসি ঠোঁটে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম করিডোরে এসে, লাল কাচের চুড়ি পরা হাতটা বাড়িয়ে রত্না আহ্বান করেছিল আসুন।

কোথায় যাবো? আমি ওর চোখে চোখ রেখে জিগগেস করলাম।

রত্না হেসে বলল, এখানেই। উপরে তো এই প্রথম এলেন, একটু দেখে টেখে যান।

আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম ওর কাছাকাচি থেকে, যে দরোজার কাছে দাঁড়াল তা ওর নিজের কক্ষ। ঝাঁজরিওয়ালা জানালার কাছে সিঙ্গল খাট। উপরের কাঠের ফ্রেমে নেটের মশারি গুটিয়ে রাখা হয়েছে। একটা মাঝারি আকারের টেবিল। তাতে বইপত্র এবং দেশী বিদেশী ম্যাগাজিন। সিনেমা পত্রিকা সাপ্তাহিকী। দেয়ালে লটকানো ক্যালেন্ডারে বর্ণাঢ্য একটি বিয়ের দৃশ্য। বিপরীত দিকে ওয়ারড্রব। তার পাশে আলমারির তাকে পাট-পাট করে রং বেরঙের শাড়ি কামিজ সাজানো। শিয়রের কাছে একটা উঁচু তেপায়ার উপরে নতুন রেডিও ক্যাসেট ঝকমক করছে। ভদ্রতা করে বললাম, চমৎকার ঘর। আমার লোভ হচ্ছে—

কি? মনোরম ভঙ্গিতে একটু ঘুরে রত্না বলল, আপনার কথা আমি বুঝি না।

বললাম, কিছু-কিছু কথা না বোঝাই ভালো।

ওখান থেকে বেরিয়ে বড় কক্ষের কাছে আসতেই কথাবার্তা ও হাসি শুনতে পেলাম। দরোজা খোলাই ছিল। ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে রত্না ফিসফিস করে বলল, —চুপ—

আমরা উঁকি মেরে দেখলাম পালঙ্কের কাছাকাছি একটা বড় ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় জোপড় বার করছেন রত্নার আব্বা জনাব মফিজুর রহমান এবং রত্নার আম্মা হামিদা বেগম কাছে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

কপাটের ফাঁকে ফাঁকে দেখছি আমরা। ট্রাঙ্কের একবারে তলার দিক থেকে একটা ভারি টুপি তুলে এনে সামনে ধরলেন এবং সোৎসাহে বললেন, দেখেছ এখনো আনকোরা আছে! তুমি তো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলে—'

ভুরু কোচকালেন হামিদা, বললেন, তাই—। পুড়িয়ে ফেললেই ভালো ছিল।

মফিজুর রহমান টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বললেন, তুমি জানোনা বেগম কখন কি হবে। হাওয়া যেদিকে বইছে এটা আবার কাজে লেগে যেতে পারে।

বুড়ো হয়েছ ভীমরতিও বাড়ছে দিনদিন। কালো রঙের টুপিটা ছোঁ মেরে নিয়ে বললেন এক্ষুণি আমি—

আমার মুখের দিকে।

আমি বললাম, ভাই হোলে তোমাদের আপা তার নাম রাখত—নিশ্চয়ই রান্না!

তিনজনে যখন হেলেদুলে হাসছিলাম মোবারক খাঞ্চা নিয়ে হাজির। তার মাথায় কদমছাঁট চুল এবং গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। ওকে দেখতে পেয়েই মান্না আবার তৎপর হয়ে ওঠে। বাঁ হাতের তালুতে মুখটা মুছে বলল, জানেন স্যার? মোবারক ভাইয়া বাসকে বলে বাঁশ আস্তকে আশতা। আপনি জিগগেস করে দেখুন—বলবে আমি নিওমারকট থন বাঁশে কইরা বাশাৎ আইছি আশতা একখানা খাশতা বিশকুট খাইতে খাইতে—

কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম—মোবারক দন্ড বিকশিত করে বলল, হষাঁড়—ছোডো বেলাৎ থন আমার জিব্রাডা খশখইশ্যা—সব জাগায় খালি শ কইয়া ফালাই।

বেশ, বেশ। আমি একটু রসিকতা করলাম, বাংলা ভাষা থেকে দুইদুইটা স কমিয়ে ফেলেছে তোমাকে পুরস্কার দেয়া উচিত।

তমিজ সহকারে মোবারক বলল, না ষাঁড়—আমরা অইলাম গিয়া গরিব গোবরা মানুষ, আমাগো ওশবের দরহার নাই। ন্যান চা খাওহাইন। আফা কইছুইন সব ফিনিশ করণ লাগব, নাইলে—

শুনেছেন স্যার? কি রকম ভাষা? মান্না ফোঁড়ন কাটে, খাওহাইন যাওহাইর বওহাইন কথা না যেন রসমালাই। আবার দুবাই যাওয়ার তদবির করছেন—। তখন খাবার আমাদের সামনে, দুটো হাফপ্লেটে যথাক্রমে ডালমুট ও পাঁপর ভাজা, দুহাতে এগিয়ে দিয়ে মোবারক বলল, আফা নিজের আতে তয়ের করছুইন—

তা চেহারাতেই প্রকাশ! এতক্ষণ, মনে-মনে, প্রতিশোধ হিসাবে রত্নাকে আঘাত করার মওকা খুঁজছিলাম, হঠাৎ তা পেয়ে গেলাম। শার্টের কলার ঠক করে ভারিক্কিচালে বললাম, নিয়ে যা এসব। আমি খাবো না।

ও মাইগ গো, কি কইছুইন ষাঁড়—! আমারে ডাণ্ডা মাইরা ঠাণ্ডা কইরা ফালাইবেন আফা—।

বললাম, ভাঙলে আর কি করবো, বড়জোর কারখানায় নিয়ে গিয়ে জোড়া লাগিয়ে দেবো।

একটা জুৎসই উওর দিয়েছি, ভাবছিলাম কিন্তু সামনে তাকাতেই আমার মুখ চুন হয়ে গেল। খোলাচুল, কোমরে আঁচল প্যাঁচানো, রণরঙ্গিণী মূর্তিতে রত্না!

গুরুতর ভঙ্গিসঙ্গি। চোখ পাকিয়ে বলল, আপনার সাহস তো কম নয়। খোদ নিতনম্বর রোডের স্বয়ং রত্নাদেবীকে অপমান!

প্রথমে ভেবেছিলাম রসিকতা কিন্তু অনেকক্ষণ তেমনি ভাব-সাব, প্রায় শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমতা আমতা করে জবাব দিই—না মানে। অপমান করতে যাবো ক্যান। আমার এখন—মানে খিদেটিদে নেই তো!

মিথ্যে কথা, কবিদের মন্দ বলেছি তাই রাগ করেছেন। খাঞ্চার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলল, এক্ষুণি এইসব শেষ করতে হবে। আর শুধু তাই নয়, আমাদের সঙ্গে আজকে ডিনার খেয়ে যেতে হবে—মাকে বলেছি, বুঝেছেন?

এ সত্যই অদ্ভুত, আমার গোপন কামনার সঙ্গে ঘটনাধারার টুকিটাকি এমন মিলে যেতে থাকবে তা আগে বুঝতে পারিনি। সূত্র অনুসারে পটাপট অঙ্ক মিলে যাওয়ার মতো। এক পা এগিয়েছি। এখন দুই পা পিছিয়ে যাওয়া ভালো। কারণ শুনেছিলাম অতি আগ্রহে আকর্ষণ কমে যায়। কিন্তু সচেতন নিস্পৃহতা নয়, আমার অস্তিত্বের বিরুদ্ধচেতনা যে পাথরের মতো

জাগতে লাগল তার কারণ ছিল অন্য। সে রাতে যথাসময়ে উপরতলার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমার ছাত্রছাত্রী। নিজের তলার বৈঠকখানা দামী আসবাবপত্রে সজ্জিত সন্দেহ নেই, কিন্তু সিঁড়ি মাড়িয়ে প্রথমে উপরে তারপর করিডোর দিয়ে এগুতে এগুতে দুচোখ ধাঁধিয়ে গেল। জিনিশপত্রে নানা উপকরণে মাঝে মাঝে বৈদগ্ধ্যের ছাপ রয়েছে বটে কিন্তু প্রধানত সম্পদের উৎকট প্রদর্শনী। এখানেও একটি রং-বেরং সোফাসেট। দেয়ালে বাঘের চামড় হরিণের শিং। একদিকে টেলিফোন, ঝকমকে শোকেস, অন্যদিকে বড়সড় একটা ডাইনিং টেবিল। সবুজ গদি আঁটা এক ডজন চেয়ার। ক্রমে চুপসে যেতে থাকে আমার চেহারা যদিও তার কোনো মানে ছিলো না। একবিঘা জমিতে বাগানওয়ালা যাদের নিজস্ব বাড়ি এবং ডাটসান গাড়িও আছে তাদের জন্য এইতো স্বাভাবিক? কিন্তু মানুষের ভাবনা চিন্তা অনেক সময়ই যুক্তির পথ বেয়ে চলে না, অনেক সময়েই সে হয় অতিরিক্ত ভাবাবেগের শিকার। খেতে বসে উসখুস করছিলাম, আমার কাপড় চোপড় অত্যন্ত দীন মনে হচ্ছিল, যদিও সবাই আন্তরিকভাবেই আপ্যায়ন করছিলেন। ওরা আমাদের এলাকার লোক, এবং শুনেছি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে তাই বোধ হয়?

তার আগের আরও কিছু কথা আছে, একফালি বোকার হাসি ঠোঁটে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম করিডোরে এসে, লাল কাচের চুড়ি পরা হাতটা বাড়িয়ে রত্না আহ্বান করেছিল আসুন।

কোথায় যাবো? আমি ওর চোখে চোখ রেখে জিগগেস করলাম।

রত্না হেসে বলল, এখানেই। উপরে তো এই প্রথম এলেন, একটু দেখে টেখে যান।

আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম ওর কাছাকাচি থেকে, যে দরোজার কাছে দাঁড়াল তা ওর নিজের কক্ষ। ঝাঁজরিওয়ালা জানালার কাছে সিঙ্গল খাট। উপরের কাঠের ফ্রেমে নেটের মশারি গুটিয়ে রাখা হয়েছে। একটা মাঝারি আকারের টেবিল। তাতে বইপত্র এবং দেশী বিদেশী ম্যাগাজিন। সিনেমা পত্রিকা সাপ্তাহিকী। দেয়ালে লটকানো ক্যালেন্ডারে বর্ণাঢ্য একটি বিয়ের দৃশ্য। বিপরীত দিকে ওয়ারড্রব। তার পাশে আলমারির তাকে পাট-পাট করে রং বেরঙের শাড়ি কামিজ সাজানো। শিয়রের কাছে একটা উঁচু তেপায়ার উপরে নতুন রেডিও ক্যাসেট ঝকমক করছে। ভদ্রতা করে বললাম, চমৎকার ঘর। আমার লোভ হচ্ছে—

কি? মনোরম ভঙ্গিতে একটু ঘুরে রত্না বলল, আপনার কথা আমি বুঝি না।

বললাম, কিছু-কিছু কথা না বোঝাই ভালো।

ওখান থেকে বেরিয়ে বড় কক্ষের কাছে আসতেই কথাবার্তা ও হাসি শুনতে পেলাম। দরোজা খোলাই ছিল। ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে রত্না ফিসফিস করে বলল, —চুপ—

আমরা উঁকি মেরে দেখলাম পালঙ্কের কাছাকাছি একটা বড় ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় জোপড় বার করছেন রত্নার আব্বা জনাব মফিজুর রহমান এবং রত্নার আম্মা হামিদা বেগম কাছে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

কপাটের ফাঁকে ফাঁকে দেখছি আমরা। ট্রাঙ্কের একবারে তলার দিক থেকে একটা ভারি টুপি তুলে এনে সামনে ধরলেন এবং সোৎসাহে বললেন, দেখেছ এখনো আনকোরা আছে! তুমি তো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলে—'

ভুরু কোচকালেন হামিদা, বললেন, তাই—। পুড়িয়ে ফেললেই ভালো ছিল।

মফিজুর রহমান টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বললেন, তুমি জানোনা বেগম কখন কি হবে। হাওয়া যেদিকে বইছে এটা আবার কাজে লেগে যেতে পারে।

বুড়ো হয়েছ ভীমরতিও বাড়ছে দিনদিন। কালো রঙের টুপিটা ছোঁ মেরে নিয়ে বললেন এক্ষুণি আমি—

আহ-হা, করছো কি। এটুপি তো এখন কোথাও কিনতে পাবো না। মুশকিলে পড়োব।

রাখ তোমার মুশকিল। হামিদা ঝামটা মেরে বললেন, পোলাপানে জানতে পারলে তোমার কল্লা ছিঁড়ে ফেলবে।

এবার হেসে ফেললেন মফিজুর রহমান, বললেন, পারবেনা বেগম পারবেনা। আমার কাছে যে দাওয়াই আছে তার নাম কুওঅতে হালুয়া—চক্ষের নিমেষে সব কলকব্জা ঠিক করে ফেলে। দেশে ইজমটিজম এলেও আমার ট্রেড আমি ঠিক চালিয়ে যাবো। দ্যাখ তো এটা কি?

উহ, আবার এটাও বার করেছ! চোখের সামনে তুলে—ধরা পাঞ্জাবীর উপরে চাপাবার মতো হাফ কোটটা দেখে বললেন, হোলটা কি? মাথা বিগড়ে গেছে?

বিগড়ায়নি বেগম, বিগড়ায়নি। আমাব ব্রেন পরিষ্কার খেলা করছে। এটাকেও হাতের কাছে রাখতে হবে। বলা যায় না কখন কি হয়।

এই নেপথ্য নাটক শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আরও কতক্ষণ চলত তাও জানি না, মাঝখানে রত্না ওদের সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিতে এগিয়ে যেতে ইশারা করলে অনিচ্ছা প্রকাশ করি। একটা হাত ধরে ফেলে বললাম, না এখন থাক।

তেমন কিছুই ছিলো না অথচ ওর মুখমণ্ডল নিমেষে রক্তিমাভ হয়ে গেল এবং একটা চাপা আবেগে যেন কাঁপছে। আমিও শিহরিত, এমন কোমল মসৃণ হাত! সারা অস্তিত্বে প্রথম স্পর্শের এক অনির্বচনীয় স্বাদ অনুভব করে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র, একটা নিবিড় গ্লানিবোধ ক্রমে আমার আবেগ-অনুভূতিকে গ্রহণের মতো গ্রাস করতে লাগল।

খাওয়ার সময়েও অনেক কথা বলছিল, আর আমি ক্ষত-বিক্ষত আত্মজিজ্ঞাসায়। কে আমি, এই পরিবারে আমার কিসের প্রয়োজন? আমার ব্যক্তিগত জীবনকে গঠন করতে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমি কি এদের কাছে বাঁধা পড়িনি, যেজন্য সঠিক বিচার বিশ্লেষণও করতে পারছি না? স্বাধীনতার জন্য যারা রক্ত ঢেলে দিয়েছে, এবং এখনো কারা আত্মত্যাগ করছে আর কারা করছে তার ফলভোগ? দুহাতে মজা লুটছে? আমি মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদ করতে পারছি না কিন্তু একটা ঘৃণাও তো পোষণ করতে পারতাম? আমি কি এভাবেই পুরো কাপুরুষ হয়ে যাবো?

চুপচাপ ছিলাম, মফিজুর রহমান একটানা গালগল্প করে যাচ্ছিলেন। কি একটা প্রসঙ্গে হাহা করে হেসে উঠলেন এবং পরে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, কোন্‌দিকে আমরা যাচ্ছি আল্লাহ মালুম। তরুণরাই দেশের আশা-ভরসা অথচ তাদের অবস্থাটা কি? কেউ গুণ্ডা, কেই ছিনতাইকারী কেউবা মাস্তান। এবং কেউ-কেউ নেতাও বটে। পলিটিকসের নেশায় মেতে কতজন যে প্রাণ দিল তার কি কিছু হিসাব আছে? স্বাধীনতার পর-পরই আমি আওয়াজ তুলেছিলাম—ক্ষমতাসীনদের কতজনকে বলেছি ছেলেপেলেদে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে নিন। কেউ শুনলো না। তোমার লেখাপড়া করার ইচ্ছে আছে, উচ্চাশা আছে রত্না আমাকে বলেছে। আমি খুব খুশি হয়েছি। দেরিতে হলেও এখন এই আমাদের চাই—।

আমার মনে হচ্ছিল সব ফাঁপা বক্তব্য তবু মন্দ লাগছিলো না। বিশেষত নিজের প্রশংসা শুনতে। আস্তে আস্তে আমার বিষণ্নতা কেটে গেল। তাই ফেরার সময় রত্না যখন একটা এনভেলাপ হাতে আমার অনুরোধ করল আগামীকাল আসার পথে সিদ্ধেশ্বরীর গলিত গিয়ে অধ্যাপক আবু সাঈদের কাছ থেকে তার লজিকের নোট নিয়ে আসতে তখন আপত্তির কিছু দেখলাম না।

তবে একদিন মনে হল, অনুরোধের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। খেটেখুটে গৃহশিক্ষকতা করি,

পারিশ্রমিক নিই আমার সঙ্গে এইটুকুই তো সম্পর্ক, ফুটফরমাশটা যখন নিয়মিত হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ করার কারণ আছে বৈকি। স রাতেও আরেকটা অনুরোধ শোনার জন্য তৈরি ছিলাম।

হা করে কি গিলছিস? ছুটি হয়েছে উপরে যা না। ও মাগগো কারুর সঙ্গে একটু কথা বলারও জো নেই, চারচোখে তাকিয়ে থাকে। ধমক খেয়ে অনিচ্ছায় বেরিয়ে গেল পান্না-মান্না, রত্না টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, আপনি তো ইউনিভারসিটির কাছ দিয়েই আসেন, রানাভাইকে এই চিঠিটা দেবেন? উনি মহসিন হলে থাকেন। রুম নম্বর লেখা আছে। উনি একটা প্যাকেট দেবেন—ম্যাগাজিনের প্যাকেট। আপনি যদি কাইন্ডলি—

আমার চিবুক দৃঢ় হয়ে উঠেছিল; বললাম, সরি, আমি পারবো না।

এতটা আশা করেনি, অপ্রস্তুত রত্না। কিন্তু পরক্ষণেই গলায় হালকা সুর এনে বলল, বাহবা রাগ এখনো পড়েনি দেখছি।

কিসের রাগ? আমি মুখ নিচু করেই বললাম, আমি তো রাগ করিনি।

না, করেননি। সেই যে কবিদের গালমন্দ করেছিলাম, আমার বুঝি মনে নেই?

এমন আহলাদী ভাবসাব, আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ও তাই বলো। আমি কিন্তু তা ভুলে গেছি।

বেশ, এটা আমি ম্যানেজ করবো। ওর হাতে একটা বই ছিল, সেটা খুলল। ভিতর থেকে একটা রঙিন ঠটো বার করে সামনে ধরে জিগগেস করল, বলুন তো এটা কাদের ছবি?

আমার ভালোলাগা শাড়ি পরনে আর তেমনি মনোরম-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে এর পরে আর মন খারাপ করে থাকা যায় না। এই যুগল ছবিটা কাদের বুঝেছিলাম তবু গম্ভীরসে নেড়ে চেড়ে দেখলাম যেন সত্যই বুদ্ধি খরচ করছি। একসময় বলে ফেললাম, ডালিয়াদের।

আশ্চর্য ঠিক ধরেছেন তো? আমি ভেবেছিলাম, পারবেন না। আপনি ওদের তো দেখেন নি? হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, ডালিয়া খুব সুন্দর তাই না।

আস্তে করে জবাব দিই, হ্যাঁ কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি নয়, নিশ্চয়ই।

স্নিগ্ধ হেসে রত্না বলল, আমাকে আপনি তোয়াজ করছেন। দেখেছেন ডালিয়া কেমন সেজেছে। কত দামী দামী অর্নামেন্ট। অলঙ্কার আমিও ভালোবাসি। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগে বেলী ফুলের মালা।

তাই নাকি? আমি বললাম, বেশ ভালো। তোমার বৈদগ্ধ্য ও রুচি বোধের প্রশংসা করি।

রত্না দাঁড়িয়ে তখন মিটিমিটি হাসছে। রহস্যের স্বরে বলল, বুঝতে পারছি আপনি আমার কাছে কি চান!

কি চাই? নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলাম আমি, যদিও সত্যই ওর কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারছিলাম না।

বাহ রে সব কথা কি মুখ ফুটে বলতে আছে। যাওয়ার আগে আমার কাঁধে একটা ছোট কিল মেরে রত্না বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টু হয়ে গেছেন। গুড নাইট!

তখনো আকাশ ভরা মেঘ ছিল এবং মাঝে মাঝে গম্ভীর বজ্রধ্বনি ; কিন্তু বৃষ্টি নামবার আগেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাসায় এসে পৌঁছেছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না, ভাবছিলাম রত্না কি আমাকে ভুল বুঝেছে, না ওর ইঙ্গিতটাই আসল সত্য।

এখন তো ভরপুর বর্ষাকাল, তাও আষাঢ় মাস। যদিও চোখে পড়েনি, বেলী ফুলের মালা উঠেছে হয়তোবা, অন্তত নিউমার্কেটের গেটের কাছে। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম। একটা কিছু উপহার দিলে কেমন হয়। কিন্তু কি দিতে পারি? রত্না নিজেই তার সমাধান দিল।

কিন্তু কেন আমি অগ্রসর হতে চাই? তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? যুক্তিবাদী আমি, আগপাছ সব ভেবেই কাজ করা উচিত। এমনিভাবে ইচ্ছা অনিচ্ছার দোলায় যখন দুলছিলাম, নেমে এল সেই রাত যখন একটা প্রচণ্ড আলোড়নে সব সীমা ভেঙে গেল। ভাবলে শিউরি উঠি, তবু এই তো আমার জীবনের সবচেয়ে মধুময় স্মৃতি। পরম সম্পদ, যা রত্নের মতো জ্বলবে, চিরদিন আমার অস্তিত্বকে ধন্য করে।

সন্ধ্যার সময় থেকেই দুর্যোগের আলামত দেখেও ডিউটি করতে গিয়েছিলাম। দশটার দিকে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে ক্ষিপ্র হাওয়ার ঝাপটা। আমি আটকা পড়ে গেলাম। ওদের পড়াবার ঘরে একপাশে একটি চৌকি। পল্লীগ্রাম থেকে আত্মীয়—স্বজন কি অন্য কোন মেহমান এলে, ব্যবহার করা হয়। তোষক লাগানোই ছিল, মোবারক এসে একটা শাদা চাদর বিছিয়ে ধিল। মশারিও খাটালো। কাছে থেকে রত্না তদারক করছিল, কেবল যাই-যাই—দেখলেন কেমন বন্দী করলাম আজকে?

বন্দী আবার কি, ইচ্ছে করলে এখনো বেরিয়ে যেতে পারি। আমি বললাম, কিন্তু আমি যাবো না। একটা রাত তোমার কাছাকাছি থাকবো, একি কম বড় সৌভাগ্য?

হয়েছে ; খুব কথা শিখেছেন? যাওয়ার সময় রত্না বলল, সাবধান, খাটের মধ্যে কিন্তু লালফৌজ আছে।

পরোয়া করি না। আমি বললাম, তাছাড়া এমন রাত্রে কে বিছানায় শোয়, যখন বাইরে এমন বারিধারা—।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। এবটানা ; অবিরাম। ঝরঝর ; ঝমঝম। মাঝে মাঝে মেঘের গুরুগম্ভীর ডাক। বিজলিও চমকাচ্ছিল। অনন্ত শব্দের মধ্যে আঁধারে আলোকে গাছের ডালপালার আলোড়নে চিররহস্যের বিচিত্র দরোজা যেন খুলে গেল। আমি স্থির। স্তব্ধ হয়ে আমি। চকিতে মনে হল, আমাদের কাঁচা বাড়িঘর ভেসে যাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে সবাই হাঁটু পানিতে—অঝোর বর্ষণের তলে কাছাকাছি দালান-কোঠার দিকে যাচ্ছে আশ্রয়ের জন্যে। আমি থাকলেও একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে যেতাম। কিন্তু না, এ আমার ভাবনা মাত্র। বরং এখানে এই পাষাণপুরীতে আমি প্লাবিত হয়ে যাচ্ছি, অন্য জোয়ারে। ভাবছি সমাজ সংসার মিছে সব মিছে জগতের কলরব। আমরা দু'জনে মুখোমুখি হতে পারি না? কপাট ঠেলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ ; হাত বাড়িয়ে উর্বর বৃষ্টিকে স্পর্শ করলাম। পরে ভিতরে টেবিলের সামনে বসলাম। আমি কি লিখবো এখন? এককালে লিখতাম ; যদিও ছাইপাশ। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার উপস্থিত অনুভব ; মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। বেরিয়ে এল একটি শব্দ, রত্না!

মধু মৃদু হাসছিল ; বলল, আপনি ডেকেছেন ক্যান!

অবাক হওয়ার মতো, কিন্তু আমি মিথ্যাকেও গ্রহণ করলাম ; বললাম, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হল!

আবার চুল ছেড়ে দিয়েছে, নাইটিপরা রত্না, আমার বুকের ভিতরটা ধুকধুক করছিল।

আমার গা ঘেঁষে রত্না টেবিলে ঝুঁকল, একখণ্ড কাগজ আমার সামনে ধরে বলল, দেখেছেন ডালিয়ার কাণ্ড! ওর বরের চিঠি আমাকে পড়তে দিয়েছে!

টেনে নিলাম কাগজটা ; পড়তে পড়তে আমার কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। আমি চোখে ঝাপসা দেখতে থাকি। চরম অশ্লীল শব্দাবলী। ফাঁকে ফাঁকে কিলবিল করছে।

তাকাতে পারছিলাম না ; তবু কোন মতে উঠে দাঁড়ালে—সামনে রত্না, ঠোঁট জোড়া ফ্যাকাশে ওর ; স্বপ্নিল চাউনি মেলে আছে। আমি স্তব্ধ ; হতবাক। হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে

ফিসফিস করে বলল রত্না, আমি আর পারছি না—!

অনেক কষ্টে ঢোক গিলে আমার গলার কাছ থেকে ওর মুখটা তুলে বললাম, রত্না—তুমি চলে যাও। কেউ দেখলে—

না—! আমি যাবো না। কান্না-কান্না স্বরে ও বলল, আমার ভালো লাগছে না!

আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে এলাম ওকে বুকে আগলে ধরে, অঝোর বর্ষণে পৃথিবীটা ডুবে যাচ্ছে।

সেই বর্ষণমুখর আশ্চর্য রাতে রত্না আমাকে যা দিয়েছে তার পরিমাপ করা যায় না। বাতি নিবিয়ে দরোজা বন্ধ করে এসে আরো অনেকক্ষণ ছিলো? আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন। রত্না আমার বুকে তার নবোদ্ভিন্ন কবোষ্ণ কোমল স্তনজোড়া চেপে আমার দু'হাতে গলা জাবড়ে ধরে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে রাখল, কতক্ষণ? সেকি অনন্তকাল? আমার কোলে গভীর আলিঙ্গনে বন্ধ করে, ওর কালোচুল আমার চোখে মুখে জড়িয়ে সাগর দোলায় দুলছিল। সব আমার স্মৃতিতে স্রোতের মতো বিচিত্র প্রবাহে ভেসে যায়, কাজের মাঝেও চকিতে কখনো নিরালায়।

রত্নার পছন্দ বেলী ফুলের মালা নিয়ে যাচ্ছি, তাতে ওর হৃদয় কি নতুন আবেগে আন্দোলিত হবে না?

আমার সময় নেই, রিকশা থেকে নেমেই দৌড়ে উঠে গেলাম। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ড্রয়িং রুমের কাছেই ওদের পড়ার ঘর।

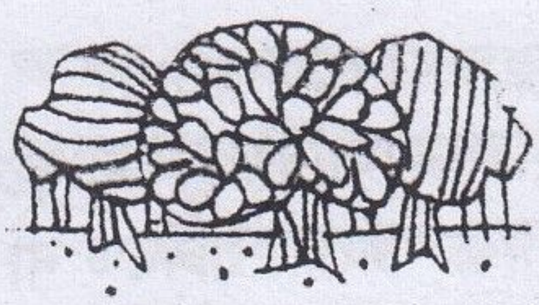
উঁকি মেরে দেখি অভিনব দৃশ্য। যে ছেলেটা টেবিলের কাছে মুখ ফুলিয়ে ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে নিশ্চয়ই হবে রানা; অনুমানে বুঝতে কষ্ট হলো না। বুঝলাম বোজাপড়ার মুহূর্ত। রত্না ওর হাতটা জড়িযে নিমতির সুরে বলছে, তুমি বিশ্বাস কর ওই ছেলেটা আমাদের গৃহশিক্ষক ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কেউ বাজে কথা লাগিয়েছে। তবে বাড়িতে আসে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবা ।? এজন্য আমাকে ভুল বুঝবে নাকি" আমরা কুকুরের দিকেও তো হাড্ডি ছুঁড়ে দিই!

বুঝেছি, বুঝেছি। রানা ওর হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করলে রত্না আরো চেপে ধরে, এবং ঠিক এ সময়েই কুঁৎ কুঁৎ করে রত্নার পা'য়ে মুখ ঘষছিল সম্ভবত ক্ষুধার্ত টেগরা। বারবার অনেকবার। হঠাৎ ক্ষেপে গেল রত্না, মেঝে থেকে কাঠের ভারি খড়মটা তুলে গায়ের সমস্ত জোরে মারলো ওর মাথায়।

আমি তখন, বেলীফুলের মালাগুলো জানালার কাছে রেখে বাইরে গেটের কাছে চলে এসেছি। ফেরার সময় কেয়ারীর ধারে গোলাপ গাছে পা লাগল, একটুখানি কেটে গেল। রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, আমি পায়জামা একটু তুলে দাঁড়ালাম।

টেগরা কাতরধ্বনি করতে করতে আমার কাছে এল যেন সান্ত্বনার আশায়। তার মাথার আঘাত থেকেও ঝরছে রক্ত। আমি দেখলাম, আমাদের দু'জনের রক্তের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুই-ই তাজা টকটকে লাল।

জুলাই, ১৯৮১।



জীবন জমিন

এই উত্তরে ঝিলবিল খামার গাছগাছড়া পাখপাখালিভরা জনাকীর্ণ ভূখন্ড, ওই দক্ষিণে থইথই আদিগন্ত বঙ্গোপসাগর।

এখানে একটি নদীর মোহনা আছে, যার নাম হরিণমুখী ; জোয়ারে জোয়ারে ফুলে ফুলে ওঠে, প্লাবিত করে তীরবর্তী জনপদ। ভাটার সময়ে কোমল মসৃণ।

কিন্তু অনবরত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের দারুণ আঘাত, হাজার ক্ষতচিহ্ন তার গতরেও লেগে আছে, নানা জায়গায়, বিলোড়িত ভাঙা-ভাঙা পাড়ে পাড়ে। এই ভাঙনের কঠিন খেলায় কত গেরস্তের ঘরবাড়ি জমিজমা ধ্বংসের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, সেই কাহিনী জেলাদপ্তরের কোন কাগজে লিপিবদ্ধ হয় না। কেবল তহশিলদারের জমা খাতায় তার হাজিরা। ভাঙন দাগা দেয়, কিন্তু আশাও বয়ে আনে অনেক কুতকুতে কোঁচকানো চোখের পুতুলিতে, হ্যাঁ ভাঙন মানেই নতুন ভূমিরও জন্ম। এই পৃথিবীতে আসলে কোন জিনিশই একেবারে হারিয়ে যায় না। বছর পাঁচেক আগে মোহনার থেকে তিন মাইল দূরে যে চর জেগে উঠেছিলো, তাতে আবার এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মাটি ভাঙা পলি, পলি থেকে ডাঙা ; কুটিল স্রোতের গোপন প্রক্রিয়া কাউকে কাউকে প্যাঁচে ফেলে ডুবিয়ে মারে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে উপহারও দেয় ধব্‌ধবে, আনকোরা জলপদ্ম।

এই উপমাটা আসলে লুকিয়ে আছে হানিফ শেখের রগের ভিতরে লাল-লাল রক্তকণার মতো। কাউকে বলতো না। আরো আঠারো-উনিশ ঘর কৃষকের জমিজমা নেকড়ের থাবা দিয়ে কেড়ে নিয়েছিল ঢেউ তুফান ; তিরিশ বছর দরে যারা বেঁচেছিলো এবং তাদের আওলাদ সবাই অপেক্ষা করেছে? মনের কোণে এবং কব্জিতে জমা রেখেছে বাড়তি শক্তি, নতুন চর দখল করার জন্য। কিন্তু তারা, বলেছে ফিস্‌ফিস্ করে এ সম্পর্কে, বলতো, নয়াচর।

হ্যাঁ, চুপ হয়ে থাকতো খারাপ বখিলের মতো হানিফ শেখ, কেবল দক্ষিণের জমির বেশিটুকুও চলে গেলে বৌকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলেছিলো, কান্দিস না আমিনা। একটু সবুর কর—সবুরে মেওয়া ফলে। আমি তর খোঁপাৎ একটা সোন্দর পদ্মফুল পরাইয়া দিমু বুঝলি?

কিছু বুঝবার ইচ্ছাও ছিলো না আমিনার, কেমন করে বেঁচে থাকবে, সামনে কেবল ধোঁয়া দেখছিলো।

হানিফ একটু অন্যরকম। এই যে, এখনো রাত দুপুরে মশাল হাতে একলা দাঁড়িয়ে আছে, এও তার পছন্দের রূপায়ণ। অমাবস্যা চারদিকে ঘোর অন্ধকার। বাতাসের অবিরাম হাহাধ্বনি, দরিয়ার একটানা গর্জন। অক্লান্ত তরঙ্গ দূর থেকে কাছে আসতে আসতে সর্‌সর্ করে চরের কনারে এসে ভেঙে পড়ছে। আর নিচে গড়িয়ে গড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে রাশ রাশ ফেনা মিটিমিটি অনেক তারার ঝালর ঝুঁকে আছে বিশাল তাঁবুর গোল ছাউনির মতো আসমানটা ; বহুদূরে সাগরের বুকে যেন জোনাকি জ্বলছে।

এই কল্লোলিত নির্জনতার মধ্যে কি যেন একটা জাদু আছে যার টান ছাড়াতে পারে না। রাতের বেলায় অন্যদের ঘুমোতে দিয়ে নিজে কেন বেছে নিয়েছে পাহারার কাজ এখানেই তার কিছু রহস্য। ঝক্‌ঝকে চোখা বল্লমটা ডানহাতের মুঠোতে, বাঁ হাতে মশাল উঁচিয়ে

হাঁটে, কথা বলে একা একা : আপন মনে খল্‌খল্‌ করে হেসেও ওঠে, কখনো কখনো।

হাহা সমুন্ধিরা মোচে খুউব তাও দিতাছ—ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় হানিফ, ওই দূরে জনপদের দিকে, বিড়বিড় করে, কিন্তু ঘি খাইবার পারবি না। হানিফ্যা বাঁচিয়া থাকিতে না। ওই সরহুর মিঞা লাডিয়াল পাডাইছিলো না? আবার খায়েস। ক্যা? বাহাদার কুতুইব্যা, কই গেলো—লেঙুর উছচাইয়া পলাইছিলো না? আরে তুমি নেতা হইতে চাও ভালা কথা—কিন্তুক জিব্বাডা অমন দশ আত লম্বা ক্যা? খালি খাই-খাই? ইনসাফ দেখবা না? মাইনষের দুঃখ বুঝবা না?—আমরার জমিন ভাইঙা চর পড়ছে, এ তো আমাগো জমিন সম্পত্তি। তুমি দলিল কইরা নিওনের ক্যাডা? তুমি ক্যানে বন্দোবস্ত নিবা, হ্যা?

মোটা রঙিন সুতায় সেলাই করা কাঁথার মতো তালি দেওয়া এটা ভারি ফতুয়া গায়ে, হাঁটু অবধি লুঙি, লাল-সবুজ গামছাটা আঁট করে বেঁধেছে কোমরে। ঘাড়ভরা কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো বাবরি চুল, গলায় তামার তাবিজ। দু'দিকে কিছুটা ভেঙে গিয়ে চোয়াল বেরিয়েছে, কোটরে নিহিত ঝাপসা চোখ ; কিন্তু রেগে গেলে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে। বুকভরা লোম, পাথরে খোদাই মূর্তির মতো পেশল পাঁয়ের গোছা, উরু বেশ শক্ত, মুগুরের মতো হাত—মশারের নির্জীব আলোতে তাকে দেখাচ্ছে যেন আদিবাসী অরণ্যমানব। দুঃখের স্মৃতির প্রবাহ জাগলে শির্‌শির্‌ করে গতরটা এবং শেষে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। তখন ক্রমে আত্মহারা, তার দৃষ্টি যেন বন্ধ হয়ে আসে, মাথার ভিতরটা করে ঝিম্‌ঝিম্‌। সবচেয়ে খারাপ, তখন আমিনার কথা তার মনে থাকে না। আমিনাকে ভুলে যায়।

হঠাৎ কি মনে হলো নরম মাটিতে মশালের ডাণ্ডাটা কুপে দাঁড় করালো, তারপর একদিকে সরে আসে লম্বা লম্বা পায়ে, এদিকে যেখানে অন্ধকার। বিকট কালো অন্ধকার আরো কিছু দূরে—কিন্তু পার্থক্যটা ভেদ করা যায় না : মনে হয়, সর্বত্র অন্ধকার, কেবল মশালটা গাঁজার কলকের মত জ্বলছে।

এই পঁয়তাল্লিশ বছরে কিঞ্চিৎ চুপসে গেছে মাত্র, কিন্তু আগের মতোই আছে তাগড়া; তার ছ'ফুট লম্বা শরীরটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ধানক্ষেতের কোণে নামলো।

হ্যাঁ শানদার আপনি তমিজউদ্দিন সরকার।' এই অন্ধকারেও তমিজউদ্দিন সরকারকে দেখতে পাচ্ছে বিচিত্র পোশাকে ; কখনও পায়জামা-শোরোয়ানী, কখনও সাহেবী স্যুট। কখনও প্যান্ট, বুশশার্ট। গোলগাল চেহারাটা, নাকের নিচে প্রজাপতির গোঁফ। ডান কলের উপরের পাটিতে একটি সোনার বাঁধানো দাঁত।

হানিফ জানে দূরে থেকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক সামনে দেখলে হানিফকে ভয় পায় তমিজউদ্দিন সরকার। খাতিরের ভাব দেখায়, মিষ্টি স্বরে কথা বলে। তাঁর লাঠিয়াল সর্দারের চাকরি দিতেও প্রস্তাব পাঠিয়েছিল।

তাতে রাজী না হওয়ায় গোমোস্তাকে, হানিফ শুনেছে, আফ্‌সোস করে বলেচিলো, বৌ তো মহৈ, তাতে কি। কিন্তুক হানিফ্যার মাথ্যাডা ক্যান জানি বিগড়াইয়া গেল। আমি ভালা মাইনষের মতন কইলাম, মিয়া জমিন তো তোমারই, চাষবাস কর, রেকর্ডে আমার নামডা খালি থাকবো, আর আমিন সাহেব তো কাগজে নাম লেইখ্যাই ফালাইছে চর তমিজউদ্দিন। এইড্যা আর তেমন কিছু কি। কিন্তুক না, হানিফ্যা তেলেবেগুনে জ্বইল্যা উঠল। মরণ্যে ঘোড়া মাডি কামরায় দেখখ্যোই চর তমিজউদ্দিনে গড়াগড়ি খাইবো হানিফ্যার কল্লা। হানিফ্যাই বেবাকরে জমা কইরা দল পাকাইয়া চর দখল কইরা রাখছে।

আবার মুঠি বাগিয়ে অন্ধকারে স্বগতোক্তি করে হানিফ শেখ, দল করুম না তো কি করুম? বইয়া বইয়া ভেরেণ্ডা বাজুমরে হারামজাদা, তুই আমার কিয়ের সরকার? আমরা

আসল সরকারের কাছে দরখাস্ত পাডাইমু, দেহি তুই কি করস। দ্যাশ আমরা স্বাধীন করছি, বুহের রক্ত দিছি আমরা, আমরা স্বাধীন দ্যাশের নাগরিক।

এইসব শব্দ জানা ছিলো না, কিন্তু জনসভায় বক্তৃতা শুনতে শুনতে এখন স্মৃতির স্তরে জমা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে। তবে স্বাধীনতা শব্দটা নিজের অভিজ্ঞতা। নয়টা মাস এরই প্রেরণায়, দৌড়াতে দৌড়াতে খাড়া হয়েছে। মোমবাতির মতো জ্বলছে সারা চেতনায়। একটু আগে কি উচ্চারণ করলো আস্তে আস্তে শীতল বাতাসের চোঁয়ার মতো শরীরটা জুড়িয়ে যায়, আর তখনই যে বিস্মৃতির অতল থেকে স্নিগ্ধ সূর্যমুখীর মতো জেগে ওঠে আমিনার মুখ—ওই নাকফুলটা, চিক্‌চিক্ করছে। বাপজান রুহুমত শেখ সারা পরিবারে যাওয়া-আসা ছিল। ঈদের সময় বেড়াতো।

পুঁথির বীরপুরুষ মোহাম্মদ হানিফার ভক্ত ছিলেন ; শুনেছে সেই নাম থেকেই নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন।

আর আমিনা তো, যখন সে ছোট ছিল, তখন থেকেই কে পুত্রবধূ করেছিলেন। হাসতে হাসতে বলতেন, আমি বয়াতী আমার একটা গোপন চোখ আছে। দেইখ্যো খুবসুরত কইন্যাই অইবো।

হুঁকোর ছিদ্র থেকে মুখ তুলে পানা একবার উত্তর দিয়েছিলেন, বেশি আশা কইরেন না দুছ, হ্যাশে বেজার অওন লাগবো। কান্দন লাগবো।

কিন্তু একে একে সব আশাই পূর্ণ হয়েছিল সে এক কুদরত। জোয়ানকালে সাত সাতটি বন্দুক ফাটিয়ে ছয় বেহারার পাল্কিতে করে নিয়ে এসেছিলো। পরে-হাড়ে হাড়েই বুঝেছে সমস্তই ছিলো খুব একটা বড় আঘাতের পূর্ব-আয়োজন।

প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময়েই আমিনা মারা গেল। রেখে গেল তার চিহ্ন একটি পুত্রসন্তান। জীবন জমিনটা হঠাৎ করে এমন নষ্ট, রিক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে তা কখনো ভাবতে পারেনি—মনে হলে এখনও প্রায় পাগল হয়ে যায় হানিফ শেখ। যখন আদর করছিলো, আমিনা এক রাতে বলেছিলো, অহনতো ইমুন কর, আমি মরলে তিনদিনও যাইবো না, আর একটা শাদি করবা।

ইমুন কথা কইওনা, খুদার কসম। তখন হানিফের চোখজোড়া ধ্বক্‌ধ্বক্ করে জ্বলছিলো, বলেছিলো, তোমারে ছাড়া আমি বাঁচুম না।

কিন্তু হানিফ তবু বেঁচে আছে, মাঝে মাঝে তাজ্জব হয়ে ভাবে হানিফ। হানিফ বুঝতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে যেন কি এক রহস্য আছে মাথা কুটে মরলেও তার সবটা জানা যায় না। খেয়ালী নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে খুবই নিষ্ঠুর। বিনামেঘে বজ্রপাত করতেও দ্বিধা করে না।

নিজের কথা মনে ছিলো, হানিফ চায়নি তবু বাচ্চার জন্য তাকে নিকা করতে হয়েছিলো।

কিন্তু পাগলী স্বভাবের শরবতী মাস চর পাঁচে টিকেছিল। তারপর পালিয়ে যায় এক রাতে।

একটা জোরালো হাওয়া থইথই দরিয়ার বুক থেকে উঠে এসে ধানক্ষেতগুলোকে নাড়া দিয়ে গেলো। ঝন্‌ঝন্ করে বাজে ধানছড়া আসমানে আবার মেঘ জমছে না তো? সটান দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখে, না তারা এখনও ঝিক্‌ঝিক্ করছে, আদিগন্ত পরিষ্কার। থপ্‌থপ্ পা ফেলে হেঁটে আসে মশালের কাছে, তার তেজ কমছে এবং আর বেশিক্ষণ যেন জ্বলবে না? ওদিকে কিসের শব্দ? না ঠিকই আছে। ঢেউ ভাঙার সর্‌সর্ আওয়াজের মধ্যে

নিজের নিঃশ্বাসকে চেনা মুশকিল, কিন্তু জনপদ থেকে, আক্রমণ করতে যদি দলে দলে ডিঙি আসে তা ধাওয়াতে কঠিন হবে না। শোনা যাচ্ছে লাঠিয়ালরা আসবে, যে-কোনদিন। তবে সকলের আন্দাজ, শেষরাতটা তাদের উপযুক্ত সময়। তাদের আঞ্জাম বেশি সরঞ্জামও প্রচুর কিন্তু সাহস কম। সেই ঘূর্ণিঝড়ের পর, যারা বেঁচেছিলো, কুড়িপঁচিশ জন এসে আবার আস্তা গেড়েছে। তারা রাতে শোয় ঠিকই ঘুমোবার জন্য ; তবে খুব একটা ঘুমোয়না, লাঠিসোটা রাখে হাতের কাছে।

এতক্ষণে তলপেটটা টন্‌টন্ করছিলো, হানিফ শেখ নিবুনিবু মশালের কাছে এসে লুঙি উদাম করে প্রস্রাব করতে লাগল। একটা বালুর ঢিবি, প্রস্রাবের চোটে তাতে গর্ত হয়ে যায়। মশালের সরঞ্জাম ঝিল্‌মিল্ আলোছায়ায় সেই গর্তটাকে মনে হয়—না, কিছু ভেবে দেখবার আগেই মগজের ভেতর চিন্‌চিন্ করে ছড়াতে থাকে রক্তধারা। একটা গোখরা সাপ যেন, নিচের থেকে ফণা তুলে উঠছে, হঠাৎ শিউরে উঠে সরে দাঁড়ালো। এক বিচ্ছিরি অবস্থা। এই অবস্থায় ইবলিস এসে কাঁধে বর করে, কানে কানে বলে ওদিকে যে ঘরগুলো ঝিম ধরে আছে তার যে-কোনো একটাতে ঢুঁ মেরে ঢুকে পড়তে ; অবিরাম ঢিব্‌ঢিব করতে থাকে হৃৎপিণ্ড। এমন কত যন্ত্রণা গেছে তার লেখাজোখা নেই। চাঁদনীরাতে, একা-একা, বালুর উপরে গড়াগড়ি দিয়েছে! ছট্‌ফট্ করেছে। সেবারে তুফান আর জলোচ্ছ্বাস তো একমাত্র ছেলে রুস্তমকে তুলে নিয়ে গেলো, সে আর ফিরলো না কিন্তু ছেলে-বৌ তুফানীকে নিতে পারেনি, নিজেই ওকে ধরে রেখেছিলো জাপটে কুটিরের কাছে, আমূল পোঁতা গুঁড়িটাতে নিজেদের আটকেত রেখে। তুফানীও সাগরগর্ভে তলিয়ে গেলে ভালো ছিলো। অপয়া ছেমড়ী। বিয়ের একমাসের মধ্যে মরদটাকে খেয়েছে।

কিন্তু ওসব চিন্তা করার সময় ছিলো না। বাঁচার ধান্দা বড় ধান্দা। একটা কেয়ামতের পরে যেন দুনিয়ার নয়াপত্তন, তাকিয়ে দেখছিলো এখনও তুফানীই একমাত্র ভরসা। ভাগ্যিস একটা এতিম মেয়েকে এনেছিলো নইলে বাপ-মা থাকলে নিশ্চয়ই একদিন এসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতো।

হাউমাউ করে কাঁদতে থাকলে তুফানী চোখের পানি মুছিয়ে দিয়েছিলো, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলো, বাজান কাইন্দেন না। আপনের পোলাতো মরে নাই, দেখবেন একদিন ফিরা আইবো। অন্য কোন দ্বীপে গিয়া উঠছে—নিশ্চয় ফিইরা আইবো, আমার মন কয়।

অন্য কোনো দ্বীপ! কিছু একটা ঘটলেই অন্য কোন দ্বীপের কথা, অন্য কোন দ্বীপের সংকেত। হাসি পায়। অন্ধবিশ্বাস, তবে তাও ভালো। দুঃখযন্ত্রণাকে ভুলে থাকার একটা উপায়। দু'দুটো খরা মৌসুম চলে গেলো, কিন্তু যারা হারিয়ে গেছে, কেউতো ফিরে এলো না। আসলে যে যায় সে আর কখনো আসে না, অনন্তের অতলে মিলিয়ে যায়, কেবল প্রিয়জনদের স্মৃতিতে থাকে তাদের ছায়ামূর্তি।

চরের উত্তরদিকে ছিলো, নিবতে-থাকাও মশালটা হাতে ধরে দক্ষিণমুখো হওয়ামাত্র কিছুদূরে উঁচু ধানগাছের মাঝে সরু আলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেলো সত্যই ছায়ামূর্তি একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন মেয়েমানুষ! তার মাথা দেখা যাচ্ছে আর লম্বাচুল পেছনটা আর কাঁধের দু'পাশ দিয়ে পিঠে ছাড়িয়ে পড়েছে। ঘুরলে আবছায়াতে আঁকা হয়ে যায় তার অবয়ব। কে সে? এ,ন নিশুতি রাতে এমন নির্জনতায়? সে কি পরী না পেত্নী? অস্ফুট একটা উচ্চারণ বেরিয়ে আসে ঠোঁটের ফাঁকে কিন্তু কথা বলতে পারে না, ডাক দিতে পারে না। জিহ্বা যেন লেপটে গেছে, আটকে আছে। সেকি বোবা হয়ে গেছে? কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থ মেরে থাকে হানিফ শেখ, কিন্তু বেশিক্ষণ নয় বুকের ভেতরটা ঢিব্‌ঢিব্ করতে

থাকলেও প্রখর দৃষ্টি মেলে এগুতে থাকে এক পা দু'পা করে। মশাল নিবুনিবু কিন্তু একটু আগুন লেগে আছে তার পুটুলিতে। সেইটুকু দেখে মেয়েটাও পিছোতে থাকে। নাহ্, চলছে যখন নিশ্চয়ই জীবন্ত। সাগরের কাছাকাছি এই চরের মধ্যে তিনচার পাড়া মিলিয়ে যে-কজন মেয়েমানুষ আছে, তাদের আঙুলে গোনা যায় সতেরো আঠারোজন, বেশি হবে না। তাদের মধ্যে সাত আটজন জোয়ান। সবাই বিবাহিত। পুরুষ বেশি, মেয়েমানুষ এত কম, যৌবনে পৌঁছার আগেই মেহেদী লেগে যায় তাদের হাতে। কিন্তু কে? কে এই মেয়েমানুষটি জব্বারে বৌ সবসময় হাসিঠাট্টা করে ; পান খাওয়ায়। গতরভরা জোয়ানকী, তারই মতো উঁচা লম্বা। একটা যেন সবুজ নারকেল গাছ, এক জোড়া তরতাজা ডাব ঝুলে আছে। একান্ত মুহূর্তে তামাক টানতে টানতে নিবিড় ভেবেছে কখনো কখনো, কোন দুর্যোগের রাতে জব্বরকে খুন করে জয়নাবকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। জয়নাবটা যে অনেকটা আমিনার মতো কিন্তু চেতন হলে নিজের গালে নিজেই চড় মেরেছে। এমন কুচিন্তা তার সাজে না।

এগুচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে হানিফ, দৃঢ় পদক্ষেপে মেয়েটা পিছিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে সাগরের ঢেউ একটানা সর্‌সর্ করে এসে ভেঙে পড়ছে পারের উপরে। হানিফ অনুভব করে তার শরীরের প্রচুর শক্তি সঞ্চারিত হয়ে গেছে, পট্‌পট্ করছে হাত পা, লোমভরা বুকটা এখন ভরাট পাথরের মতো। মিইয়ে পড়া মশালটা ছুঁড়ে ফেললো। জোয়ারের বেগে অন্ধকার এসে ছেয়ে যায়। উত্তেজিত একটা জোয়ান মোষের মতো রোখ করে দৌড় তে দৌড় তে একবার জিগগেস করলো, ক্যাডা তুমি? একটু খাড়াও—

কিন্তু থামলো না সেই অজানা ছায়ামূর্তি এবং কিছুক্ষণে ধানক্ষেতের সনাৎ সনাৎ আওয়াজ শেষ হলে বুঝতে পারে সাগরের বালুতটে এসে পড়েছে।

এই তো দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। বহুদিনের ক্ষুধার্ত, অসহিষ্ণু হানিফ এক লাফে কাছে গিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরে। হ্যাঁ হ্যাঁ কি কুদরত। পরী নয় পেত্নী নয়—একটা জলজ্যান্ত মাংস আওরত। মাথা ভরা লম্বা চুল পুরু নরম ঠোঁট। কিছুক্ষণ বুকে প্রবলভাবে চেপে রাখার পর পাগলের মতো সব কাপড় খুলে পেলতে থাকে, কিছু ছিঁড়েও ফেলে। ছট্‌ফট্ করছিলো, ছাড়াতে চায় ; কিন্তু একটা সজোর ঝাঁকুনি দিয়ে চিতিয়ে ফেললো বালুর উপরে। বাঘের মতো ক্ষিপ্রতায় জড়িয়ে কাবু করে ফেলে।—তারপর দরিয়ার ঢেউয়ের মতো সেকি উথালিপাথালি, নিদারুণ মত্ততা।

অনেকক্ষণ ধরে চলে। অবিশ্রাম সাগর-গর্জন, ঢেউয়ের ফেনিল উচ্ছলতা, বাতাসের দাপাদাপি তাদের আবৃত করে অন্ধকারের পরতে পরতে, যখন তারা নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ছেঁকে তুলছে বালুর ঘ্রাণ, মাটির গন্ধ শ্যাওলার সজীবতা।

একঝাঁক সাগরপাখি কলকাকলিতে মেতে উঠে পড়ে গেলো, রাত শেষ হয়ে এসেছি কি? অসম্ভব নয়। তিনবার উঠেছে, এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত, যেন বা বিধ্বস্ত। কেউ কারোর নাম জিগগেস করলো না। একটা হাত ধরেছিলো আলতোভাবে, অনুভব করে, মেয়েটা উঠে বসলো, কাছাকাছি, কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে গেলো।

একি স্বপ্ন না রূপকথার মায়াপুরীর সাময়িক কোন ভোজবাজি? বালুর মধ্যে কপালের কিছুটা এবং কনুই ডুবিয়ে পড়ে থাকে হানিফ। মনে হয়, যেন ঘুমুচ্ছে, কানে তবু বাজে তরঙ্গ-করতালি, সমগ্র বিশ্ব চরাচর ধ্বনিপ্রতিধ্বনিময়। শীতল হাওয়া বয়ে যায় বারে বারে ঝাপটা দিয়ে। কতো কথা যেন বলা যায়। কখনো হা হা করে ওঠে, যেন মসকরা করে। একবার মনে হয়, যেন নরম মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে তার জবরদস্ত দেহটা, শেষে একেবারে তলিয়ে যাবে, ঘূর্ণিস্রোতে পাতাল পর্যন্ত যেখান থেকে কেউ আর উঠতে পারে না।

বড়জোর দিতে পারে বোবা চিৎকার। আরেকবার মনে হয়, এক্ষুণি মৃত্যু হয়ে যাবে তার, আজরাইল যেন অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে তার দবজ খস্‌খসে হাতটা পিঠজুড়ে রেখেছে জান কবজ করার আগে একটু সান্ত্বনার মতো। এখন মরে গেলে মন্দ হয় না। তার সিনার ভিতরে নষ্ট ঘড়ির মত থেমে যাবে হৃদযন্ত্র, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। চারা চরের লোকেরা পরদিন সকালে আবিষ্কার করবে তার লাশ। বলাবলি করবে ভূতে মেরেছে। হ্যাঁ নিকষ কালো অন্ধকারে ভূতের আছরই তো হয়েছিলো। ভূতের আছর আর কিছুনা, আর কিছুনা।

আরো কিছুক্ষণ পড়ে থাকে ; একসময় এক ঝাঁক পাহাড়ী হাঁসের পাখা ঝাপটানি বাজতে থাকে, যেন কানের কাছেই। গতরটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসে, চোখে কচলা দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো মুখটা মোছে খসখসে হাতের তালুতে। ফর্সা হয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে, প্রায় টলতে টলতে ; দরিয়ার কাছে গেলো। সব খুলে রেখে পুরো ন্যাংটা হয়ে নেমে যায় পানির মধ্যে। গোড়ায় হযরত আদমও বোধ হয় এমনই করতেন। হানিফ সাঁতার কাটে, ডুব দেয়। গোসল করার পর গামছায় গা-গতর মুছে কাপড় পরে পুবমুখো হয়ে দাঁড়ালে দেখতে পেলো, লাল সুরুজ উঠছে।

বাঁশের আস্তানা একটি দোতলা ঘর। শক্ত করেই বেঁধেছে। বেশ উঁচু করে বানিয়েছে ভিটি, যাতে সহজে উঠতে না পারে জোয়ারের পানি। বাইরের বেড়ায় বল্লম ও মশালের বাঁট ঠেকিয়ে রেখে ঘরে ঢুকলে দেখলো কাঁথার উপরে অকাতরে ঘুমুচ্ছে এখনো তুফানী। তুফানী বরাবর ঘুমকাতুরে। তুফানীর সঙ্গে থাকার জন্য খাতুন-বেওয়াকে রাজি করিয়েছিলো একটা শাড়িকাপড় দেয়ার করার করে ; সে পাকালের কাছে বসে বিড়ুবিড়ু করছে। হানিফ শেখ ফিরেছে দেখে উঠলো এবং অনেক ধাক্কা দিয়ে তোলে তুফানীকে। তুফানী আবার কাত হয়ে পড়ে, তন্দ্রাজড়িত গলায় বলল, আর একটু ঘুমাই বুবু—

খাতুন-বেওয়া বলল, ঘরৎ পুরুষালোক নাই, রাইতের বেলায় ঘুমাইবে ক্যামনে। ডর লাগেনা? ঠিক আছে, আরো ঘুমা—

খুব ভুখ লেগেছিলো, হানিফ এক সানকি পান্তাভাত এবং নুন ও পোড়ামরিচ নিয়ে বসে যায় একটা পিঁড়ি টেনে। জাল দেওয়া ইছা মাছ ছিলো, পাতিল থেকে তুলে নেয় এক খাবলা। বড় বড় লোকমা তুলে গোগ্রাসে খেতে থাকে একলা-একলা।

একলা একলা সারাদিন টুক্‌টাক্ কাজ করেও তার সারামন পড়ে থাকে রাতের জন্য। কখন রাত নামবে, কখন? এই রাতকে একটা হেঁচকা টানে সাগরের বুক থেকে কালো জালের মতো তুলে এনে ছড়িয়ে দেয়া যায় না? এপাড়া ওপাড়া গিয়েছে ; কথাবার্তা বলেছে, বিশেষ করে ফসল কাটার আগ পর্যন্ত আরো সাবধানতা গ্রহণ সম্পর্কে। কিন্তু সব ভাসা-ভাসা, হানিফ যেন এখন অন্য জগতের কোন জীব-সবকিছু দেখেও দেখে না, শুনেও শুনছে না। দুপুর গড়িয়ে গেলে ভাত বেড়ে দেয় তুফানী, ওর হাত এবং পা শুধু, খেয়ালে এলো। পাড়াপড়শি কিছু বুঝবে না—কেবল তুফানীকেই যতো ভয়? তুফানী কিছু টের পেলে সর্বনাশ। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই তৈরি, আজ অল্প কেরোসিন লাগিয়েছে মশালের পুঁটলিতে, যাতে বেশিক্ষণ না জ্বলে। নিজের মোটা ময়লা কাঁথাটাও নিয়েছে, কাহিল হলে পেতে বসবে বলে। সব নিয়ে চললো। অন্ধকার ঘোর হয়ে আসতে থাকলে রক্তে যেন আগুন ধরে যায় ; হাত পায়ের রগগুলো ফুলতে থাকে, তাকিয়ে দেখে এদিক ওদিক, বহুদূর পর্যন্ত। সে যেই হোক, তাকে সব উজাড় করে দিয়েছে।

কিন্তু সময় এগিয়ে চলে, পারের উপরে সাগরের ঢেউ ভেঙে পড়ার সর্‌সর্ ধ্বনি একটানা, অবিশ্রান্ত।

আসমানে ছেঁড়াখোড়া মেঘ, তেমনি রাতের অন্ধকার। দুপুররাত পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন এলো না, তখন হানিফের মাথায় রক্ত উজিয়ে তাকে উন্মত্ত করে তোলে। মনে হয়, প্রান্তর বিদীর্ণ করে সে চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর জ্বলন্ত মশালটা হাতে নিয়ে ছুটছে। সব ধানক্ষেত মাড়িয়ে দেবে, পায়ের তলায় সবশস্য গুঁড়িয়ে দেবে। ওই যে কুটির শ্রেণী পরম শান্তিতে কালো কালির পোঁচের মতো স্থির তাদের পুড়তে দেবে আগুন লাগিয়ে। দানবের মতো একটা প্রচণ্ড ঠেলা মেরে নয়া-চারটাকে ডুবিয়ে দেবে সাগরতলে, একটানে দরিয়ার পানি গিলে ফেলবে। হানিফ ছুটতে ছুটতে সেই বাড়ির কাছে এসে পড়লো যেখানে সেইজন থাকে আন্দাজ করেছে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে। জয়নাবের কি অসুবিধা। জব্বর ওকে ধরে আছে? বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে শালার ব্যাটারে গলা টিপে ধরলেই সব জারিজুরি খতম।

তাজ্জব সে রাতে এলোই না। তার পরের রাতেও না। কি বোকামিই না করেছে, আফসোসে মিইয়ে পড়ে, যখন ধরা দিয়েছিলো তাকে নিয়ে একটা নৌকো করে পালিয়ে গেলেই পারতো।

তারপর আরো আশা, আরো প্রতীক্ষা। এবং আরো দু'রাত পরে যখন ঠিক করে ফেললো সব নিঝ্‌ঝুম হয়ে এলে যে-কোন একটা ঘরে বেড়া কেটে ঢুকে পড়বে, তখন আবার সুসময়। মুখ উঁচিয়ে দেখে সে আসছে, সেই ছায়ামূর্তি। ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর কিন্তু আজ কিছু অভিমানও জেগেছে। এই ক'রাত ধরে কেন এমন কষ্ট দিলো। নিরিবিলি একটা ক্ষেতের কোণে কাঁথাটা বিছিয়ে বিছানার মতো করেছিল-সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু ও যখন আরো কাছে এল হঠাৎ আবেগের বান ছুটে যায়, ত্বরিৎ এগিয়ে গিয়ে আবার জাপটে ধরে বুকের মধ্যে। অনুচ্চ ফিস্‌ফিস করে বলতে থাকে কানের কাছে, ক্যারে আইলা না তুমি ক্যারে আইলা না?

আইছি তো। মেয়েটি বলে আরো নিম্নস্বরে, আপনে পাগল-পাগল অইছেন ক্যারে। কি লাভ। দুনিয়াৎ যা চাই সব পাওয়া যায় না।

আমি তরে চাই, নাইলে বাঁচুম না। তুই ক্যাডা? মুখটা দেহি? আমার জেবে ম্যাচবাত্তি আছে।

না, না। দেইখ্যেন না, তাইলে আমারে পাইবেন না। তার গতরে হাতের পাতায় আদর করতে করতে বললো, আমি মইরা যামু গা।

ঠিক আছে। হানিফ আবার ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তয় কথা দাও তুফানীরে কিছু কইবা না। তুফানী আমারে বিশ্বাস করে, সরমান করে।

এরপরে কেউ আর কথা বলে না। কাপড় কম, নষ্ট করলে চলে না, হানিফ ন্যাংটা হলো ওটাকেও ন্যাংটা করে ফেলে। কোলে নিয়ে বসলো। কিন্তু রাত যে শেষ হয়ে আসবে, এখন যত আঁধারই থাক্ ক্রমে আলো ফুটবে—চর জুড়ে জাগবে মানুষ, পাখপাখালি। চুলের রাশ মুখে জড়িয়ে তার বুকের উপরে বুক চেপে আবার জিগগেস করে, তুমি জয়নাব? দেহি তোমারে একবার দেহি?

এ কথার উত্তর দেয় না। মেয়েটি দু'হাতে গলা জড়িয়ে তেমনি অনুচ্চ ফিস্‌ফিস্ করে বললো, চলেন আমরা পালাইয়া যাইগা, নাইলে খারাপ অইবো।

দু'জনে আন্দোলিত হয়, গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। সাগরের অশান্ত গর্জন-আহা, অনন্তকাল যদি থাকত এই অন্ধকার রাত।

অমাবস্যার জের থাকতেই সব ঠিক করে ফেলে। ডিঙিটা বেশি বড় নয়, কিন্তু বেশ শক্ত কাঠের তৈরি, সমুদ্রের ঢেউ উঠলে ভাসে মোচার খোলের মতো, ডুবে যায় না। ক্ষেত

পাহারা দেবার নাম করেই এসেছে, তবে জিনিশপত্তর একটু বেশি। দু'তিন দিনে একটা দুটো করে জিনিশ এনেছে, লুকিয়েছে পাটাতনের তলায়। কয়েকদিন চলার আন্দাজ চালডাল, কেরোসিনের চুলা। পুরানো হারিকেনটা, কয়েকটি হাঁড়িপাতিল। চোরের মতো ব্যবহার, কিন্তু তুফানী কি কিছু টের পেয়েছে? না, মনে হয় না। সে তেমনি শান্ত, নির্বিকার, যদিও আড় চাউনিতে দেখেছে দু'একবার। হায় তুফানী। তোর কপালে আরো কত বিরমন—একলা-একলা কতদিন আর এমন করে থাকবে তুমি এই নির্জন চরে, কে তোমাকে দেখাশোনা করবে, ইজ্জত বাঁচাবে।

মায়া হয়, কিন্তু উপায় নেই। তুফানীকে ফেলে যেতেই হবে।

তারপর একদিন দুপুর রাতের পর আঁধার থাকতেই নৌকো সাজিয়ে গলুইয়ের কাছে বসে আছে হানিফ শেখ দুরুদুরু করছে তার হৃৎপিণ্ড। আসবে তো? আরো কিছুক্ষণ কাটে—হ্যাঁ এইতো এসে গেছে! দেশলাইটা জেবের ভিতরে ধরা ছিল, উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে সরিয়ে ফেলে এর মুখের কাপড়টা তারপর কাঠি জ্বালালো, সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদের মতো বেরিয়ে আসে একটি শব্দ, তুফানী!

তুফানী স্থির হয়ে আছে, কিছু বললো না। ঘরের ভিতরে কুঁকড়ে থাকে, বাইরে চলে মৃদুমন্দ কিন্তু এখন পুরো মূর্তিমান সুঠাম শরীর টইটম্বুর এক পূর্ণবিকশিত নারী। বড় বড় চোখে গভীর চাউনি। সে দৃষ্টি নামিয়ে বলল, চলেন!

কই যাইয়াম আমি, জাহান্নাম ছাড়া আর কই জাগা আছে আমার। খালি হাবিয়া দোজখ আছে। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলতে বলতে হঠাৎ শক্ত হয়ে যায় হানিফ, বৈঠাটা ছোঁ মেরে টেনে আনলো নৌকোর গলুই থেকে তারপর দাঁত খিচিয়ে উচ্চারণ করে, হারামজাদী মাগী আমার লগে বেইমানী করছস্। আমি তরে মাইলা ফালামু তরে মাইরা দরিয়াৎ ভাসাইয়া দিমু।

সঙ্গে সঙ্গে ওকে টান মারে। চুলের মুঠি ধরে ওকে মারতে থাকে উন্মত্তের মতো। তুফানী একটা কাতরধ্বনিও করে না। মারতে মারতে ক্লান্ত, বৈঠাটা ছুঁড়ে ফেলে এখনো কাঁপছে থর্থর্ করে। কাঁপছে ক্রোধে জিঘাংসায়। কালো সাঁড়াশির মতো থাবা তাক করে তেড়ে আসছে গলা চেপে ধরার জন্য।

বালুতে ভর করে তুফানী উঠলো, মুখের উপর থেকে একরাশ চুল সরিয়ে বললো, আমারে মারেন আপনে তাড়াতাড়ি মারেন। মাইরা ফালাইয়া দ্যান্। কিন্তুক, কিন্তুক। আমার প্যাডে আপনের—আপনের পোলো আছে—আপনের পোলা ফিইরা আইতাছে—

ভোর হয়ে এলো ; ওপর দিয়ে ধুপ্ধুপ্ দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে দলে দলে উড়ে যাচ্ছে সাগরপাখিরা, যখন একটি ছোট, নৌকো অবিশ্রাম দাঁড়ের টানে ছপ্ছপ্ পানি কেটে এগিয়ে চলছে পূর্বদিকে। কেউ জানবে না ওরা কোথায় চলে গেছে। ওরা নিজেরাও জানে না। হতে পারে সে অচেনা লোকালয়, নতুন কোন দ্বীপ, যেখানে এখনো কোন নরনারীর পায়ের ছাপ পড়েনি, সার বেঁধে কিংবা পাশাপাশি, কেবল জেগে রয়েছে নরম-পেলব পলিমাটি।

জানুয়ারি, ১৯৮২।



আমাকে একটি ফুল দাও

এগিয়ে চলেছে সে দ্রুত পা'য়ে ফুটপাথের ওপর দিয়ে, কখনো গাছের ছায়ায় একটু থেমে, কখনো কোনাকুনি রাস্তা পার হয়ে। প্রথম বৈশাখের ঠাঠা দুপুর। প্রখর রৌদ্রতাপে সমস্ত সবুজ ম্রিয়মাণ, কিন্তু, কৃষ্ণচূড়ার সারি রক্তিম পুষ্পসম্ভারে হালকা হাওয়ায় হেলছে দুলছে। আশেপাশে সামনে পিছনে চলাফেরা করছে ব্যস্ত সমস্ত লোকজন, পথচারী। গাড়ির গোলমাল, রিকশার ক্রিং ক্রিং। দু'একবার ছোট হোঁচটও খেয়েছে ; কিন্তু কোনোদিকে যেন খেয়াল নেই। দেখতে প্রায় অদ্ভুত। ঘন বাবরী চুল ঘাড় ইস্তক নেমেছে। প্রশস্ত ললাট, খাড়া নাক। গোঁফ দাড়িতে ভরা মুখমণ্ডল, অল্পসল্প খালি জায়গার মধ্যে চামড়াতে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে। ঘামে ভিজে লেপটে আছে পিঠে ডোরাকাটা শার্টের পিছনটা। পরনে চেক লুঙি এবং পা'য়ে ময়লা ক্যাম্বিসের জুতো, যার ওপরে শক্ত লোমশ গোছা, মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, অবিরাম চলার ছন্দে।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ফেলে খাকী কাপড়ে তৈরি ঝোলার প্রান্তটা মুঠো করে ধরেছে বুকের কাছে।

কিছু দূর থেকে দেখলে বোঝা যায়, ঠিক কুঁজো সে নয়, কিন্তু বাঁ কাঁধের দিকটা স্পষ্টতই বাঁকা হয়ে ঝুঁকে আছে, এবং টাল সামলে চলার সচেতন চেষ্টা থাকায় মনে হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই যাচ্ছে।

হঠাৎ পিছনে ফট করে একটা আওয়াজ হতেই থমকে দাঁড়াল, কিন্তু তাকিয়ে দেখে একটা রিকশার টায়ার ফেটে গেছে। মরদ হাতির মতো বিশালকায় প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে হ্যান্ডেল ধরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ধারে। তালপাতার সেপাই চ্যাংড়া রিকশাওয়ালা। ভাব, দোষটা ওরই। এমন একটা জিনিশকে সে তার দুর্বল ত্রিচক্রযানে তুলে নিয়েছিলো, সেটাই ছিলো ভুল। ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে। কাংস্যস্বরে বক্‌বক করছেন ভদ্রলোক, আরেকটা ধরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডানধারে তলপেটের কাছে হাতটা নিয়েছিল, হ্যাঁ এখনো ঠিকই আছে তার ছোট অস্ত্রটা। কালো চকচকে ধাতব গড়ন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কি মারাত্মক! ঠিকমতো তাক করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কাত। এখন এক বছর সাড়ে তিন মাস, স্বাধীনতার ; অস্ত্র জমা দিয়েছে অনেকেই কিন্তু অস্ত্রের খেলা বন্ধ হয়নি—না রাজধানীতে না দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তারও একটা অস্ত্র আছে, এটা সান্ত্বনা। হয়তো ব্যবহারও করতে হবে, হয়তো সে রক্ত ঝরাবে আবার, হয়তো। যেন ভুঁরুর নিচে তার কালো চোখের পুতুলি ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠল।

আজব এক এবড়ো-খেবড়ো গতিতে চলেছে জীবনটা, একটু তলিয়ে দেখলেই, বুঝতে পারে। সবচেয়ে, হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাওযার প্রবণতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ হয় না, এটাও অদ্ভুত। একেবারে শিশু অবস্থার মাস আষ্টেক বয়েসের সময়ে শুরু। শীতকাল ছিল। ওকে কোলে নিয়ে বসে আগুন তাপাতে তাপাতে নানী বিপদে পড়েছিলেন। চোখে কম দেখতেন। কখন তার কাপড়ের কোণটা আলিয়ার ভিতরে গিয়ে পড়েছিল, খেয়াল করেননি। ক্রমে বড় হয়ে যায় আগুন। এবং ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াবার সময় কয়েকটা গনগনে জ্বলন্ত আংরা পেটে এসে পড়েছিল। নিদারুণ চিৎকার। জলদি করে, ঝেড়ে ফেলবার আগেই এক ছোবলে গোলাকার ছাপ মেরে দিয়েছিল দুরন্ত আগুন, সেসব দাগ এখনো পেটের ডান পাশে রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হল, ইস্পাহানী কলোনীর গেট পেরিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ এখন সাবধান হওয়া দরকার। ভালোই ছদ্মবেশ, কিন্তু তবু যদি, কেউ চিনে ফেলে? দুনিয়াতে চালাক লোকের সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে।

চলার গতি মন্থর করে মগবাজার চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক।

গাড়িঘোড়া, লোকজন, দারুণ ব্যস্ততা। মাত্র একনজর সেদিকে তাকিয়ে পাশ ফিরল, এবং পরক্ষণেই উপস্থিত কারুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে মাতা গুঁজে ঢুকে পড়ল পূর্ব কোণের টিনশেড রেস্তোরাঁটার ভিতরে। ঘরের মাঝামাঝি বেড়াতে লটকানো একটি আয়না ছিল। নিজের চেহারাটা দেখে, দাঁড়িয়ে। না, ভয়ের কোন কারণ নেই। সে অচেনা হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ অচেনা। পরিচয় না দিলে কেউ তাকে চিনবে না, পরিচয় দিলে সন্দেহের চোখে তাকাবে। এই তো যথেষ্ট। আজ সে যে আত্মপরীক্ষার সম্মুখীন ছদ্মবেশই তার আসল পরিচ্ছদ। সামনের দিকে উঁচু চৌকিতে গদী, তার ওপরে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে আছেন ম্যানেজার। অসহযোগের সময় এখানে নিত্য যাওয়া-আসা ছিল, এমনকি রাত বারোটা পর্যন্ত থাকেন এবং কাউকে খাটান না। এত পরিচয় ছিল অথচ এখন তিনি একবার দেখলেন মাত্র হয়তো ভাবলেন, নতুন একজন কাস্টমার। এই তো বয়, হোসেনটা টেবিলে গেলাস ঠুকছে এবং চেঁচিয়ে অর্ডার পৌঁছে দিচ্ছে ওধারে কিচেনে। সে সিনেমায় নামতে চায় কত ঠাট্টা-তামাশা করতো। কিন্তু সেও, এখন শুধু কাছে এল এবং জিগগেস করল, চা না সরবত, স্যার? গরম-গরম লাঞ্চও আছে।

থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বেঞ্চিতে রাখল ওমর, দেখে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে হোসেনের, নাকের নিচে উঠি-উঠি গোঁপের রেখা। সে বলল, একাপ চা দে আগে।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে চাপড়, আবার হাঁক-একটা চা, গরম চা। মালাই বাহায়ে দেবে, স্যাব?

না, না। শুধু লিকার। ওমর বলল, দুধ চিনিও লাগবে না।

এবার সে মনোযোগ দিল, চেহারায় বনমানুষ এবং কাপড় চোপড়ে উলাঝুলা হলেও। হয়তো কোনে সম্মানিত বুদ্ধিজীবী। শুধু সাহেব নয়, কিঞ্চিৎ তারও ওপরে। হোসেন হেসে ফেলল এবং বলল, বুঝেছি স্যার—লেমনটি! আমাদের লেমনটি ভেরী গুড!

আস্তে ধীরে, চিনক চুমুকে লেবুর চা খাওয়া শেষ করার পর পিছনের খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বেশ ক্লান্ত, তবু ভিতরের আলোড়ন কমছে না। এখান থেকে বেশি দূরে নয় তাদের বাড়িটা ; চৌরাস্তার ওপারে ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে এগুতে থাকলে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগে না, বড়জোর দশ মিনিট। কৈশোর-যৌবনের লীলাক্ষেত্র এখানকার সব জায়গা। মুহূর্তে ভিড় করে আসে মনে কত ছবি, কত রং। কত স্মৃতি। নিজের চোখেই দেখেছে ঝোপঝাপ গাছগাছড়া ধূলিমাটি থেকে আড়মোড়া ভেঙে কেমন করে গড়ে উঠছে শহরটা, এখানেও প্রতিদিনই তার ঢেউ লাগত। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে অতি অল্প টাকায় বাবা কিনেছিলেন দুটো টিনের ঘর সমেত আধ বিঘা জমি—আর এখন তা কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি, যদিও দালান তুলতে পারেনি এখনো। কোনক্রমে পিছনের বড় ঘরটা দেয়াল দিয়েছেন। সামনের ঘরটা ভেঙে বাংলোপ্যাটার্নের করা হয়েছিল টব বারান্দা দিয়ে ও ভিটির চারদিকটা পাকা করে। এ ঘরটাতেই সে থাকত। গেটের কাছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা হয়তো তেমনি আছে এবং এখন ফুলে ফুলময়। বাড়ির পিছনে কাঁচা দেয়াল, আর তিনদিকে মেহেদীর বেড়া, যার মধ্যে পেঁচিয়ে থাকে অনেক স্বর্ণলতা। কিছু দূরে-দূরে লাগানো, এক সারি নিমগাছও আছে। ভিতরের দিকে একটি পেয়ারা গাছ। ডোমরা ঝোপে টুনটুনির বাসা।

হয়তো আছে এখনো। থাকবে না কেন? সে আর কতোদিনের ব্যাপার। পঁচিশে মার্চের রাতেই শেষবারের মতো ফিরেছিলো ; আর আজকে তিয়াত্তরের সতেরোই এপ্রিল। গোনাগুনতি দু'বছর বাইশ দিন। এখনো বাড়িতে গিয়ে উঠলে, পরিচয় দিলে প্রথমে হয়তো হৈচৈ গোলমালই হবে, কিন্তু সব ঠিকঠাক হতেও বেশি সময় লাগবে না। কালের প্রলেপে সব জখমই শুকায়ে যায়। কিন্তু না, ওভাবে যাবে না ; সে যেতে পারে না। সোজা হয়ে বসল, আঙুলে টোকা মেরে ছাই ফেলল। কেমন একটা অদ্ভুত বিষণ্নতা তাকে তন্ময় করে রেখেছে।

হু, ঘা খেয়ে খেয়ে কিছুটা মনে হয়, বদলেছে হায়দার ; কিন্তু ওর চরিত্রের মহৎ গুণটি, মানে অতিরঞ্জনপ্রিয়তা, পুরো শুধরে গেছে বলা যায় না। মাঝে মাঝে মিথ্যেও বলত, হয়তো মুহূর্তের দুর্বরতায়। ইউনিভারসিটি জীবনে এইসবের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত জমা আছে। তেমনি একটা এইতো। প্রতিষ্ঠিত চিরকুমার অধ্যাপক রায়হান সাহেব গ্রাম থেকে ছুকরী বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন, সেবার গ্রীষ্মের ছুটির পরে ক্লাসে এমন কথাও প্রচার করেছিলো। বেশ জোর দাবি বাজিও ধরে, খবর ঠিক না হলে, তিনজনকে চায়নিজ। বাঘা আদমী! কটু মন্তব্য ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ জিভে লেগেই আছে, যার জন্যে ছাত্ররা পারতপক্ষে তাঁর ছায়া মাড়ায় না। তবু গেল ওরা তিনজন, টিউটরিয়্যালের জটিল সমস্যা আলোচনার আছিলা ধরে এবং সর্বনাশ! সত্যিই তো! সিঁড়ি মাড়িয়ে ওপরে উঠতেই দেখল লাল পাড় এবং সবুজের ওপরে ডোরা-কাটা শাড়ি পরা ডাগর-ডোগর একটি মেয়ে কাপড় মেলছে রেলিংয়ের রোদে! গায়ের রং দুধে আলতা এবং ভোমরা কালো চোখের তারা! কানে ইয়ারিং এবং গলায় সোনার হার। তিনজনের চোখই ছানাবড়া—ভ্যাবাচেকা খেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু পাশে ড্রয়িংরুমে গুড় র গুড় র আওয়াজের পরে পরিচিত গলা খাকারি শুনতেই সাবধান। এ বছরেই অবসর গ্রহণ করবেন এবং বলতে গেলে, গোরের দিকে পা বাড়িয়েই আছেন, অথচ এ সময়েও এমন একটা খাসা মাল জোগাড় করে ফেলেছেন। বাহাদুর বটে। না, গ্রামবাংলা এখনো রত্ন-প্রসবিনী, সেই জন্য? কিংবা হতে পারে, সারাজীবন নারীসঙ্গ বর্জনের অন্তিম পুরস্কার? মুখ চূণ, কিছুক্ষণ অনেক জল্পনা-কল্পনা ওদের মাথায় জেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসভঙ্গ। জানতে পারে অধ্যাপক সাহেবের আপন ভাগ্নী তাঁর বাসায় বেড়াতে এসেছে।

তবু এটা তো সামান্য, ম্লান মুখে আরো কত গুল ছাড়ত হায়দার, ওকে বিশ্বাস করা ছিল কঠিন। এবারেও, এমন সংকট মুহূর্তে যা সে বলেছে সে কি সত্য না মিথ্যা?

মনে পড়ে, ফেরবার সময় বিশেষ কোন বাধা পায়নি, বরং পেয়েছে সীমান্তরক্ষীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা! তবে বাস থেকে নামার পরও অনেক দূর হেঁটে আসতে বেশ কষ্ট লাগছিল। কিন্তু আশ্চর্য, বর্ডারের সীমারেখা পেরিয়ে দেশের মাটিতে পা দিতেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল ; সে বুক ভরে শ্বাস টানল। আহ কি আরাম, শান্তি! সে বেঁচে আছে এবং স্বাধীনতার উজ্জ্বল রৌদ্রে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে এ তো পরম সৌভাগ্য। একমুঠো মাটি তুলে ঝরঝর করে ফেলল নিচে, তারপর মাটিমাখা াতের পাতাটা গলার কাছে ঘষে দিল। হয়তো ছেলেমানুষী, কিংবা পাগলামী। কিন্তু ভালো লাগে। মুহূর্তে কি একটা শক্তি যেন সঞ্চারিত হয়ে গেল দেহের মধ্যে, তার রক্তধারায়, সব দুর্বলতা কেটে গেল। হাত তুলে সীমান্তরক্ষীদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে লম্বা লম্বা পা'য়ে এগিয়ে গিয়েছিল ঃ হ্যা পরিবর্তনটা রীতিমত বৈপ্লবিক। অল্প সময়ের মধ্যে কত ওলটপালট হয়ে গেল সেইজন্য মনের ভিতরে এত ভাবাবেগ, এত ব্যাকুলতা।

স্বপ্না আর সোনিয়া তো আপন সত্তা, সারাক্ষণ জেগে থাকত স্মৃতিলোকে। কিন্তু, ওপারের পাহাড়ী অঞ্চলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফেরার কথা ভাবতেই প্রথম যার

কথা মনে হয়েছিল সে আজমল আলি হায়দার। তার কারণও ছিল। সে সহপাঠী, উপরন্তু সংগ্রামেরও সাথী। পঁচিশের রাতে ইকবাল হলে সংগ্রামে দু'জনে পাশাপাশি থেকে বন্দুক ছুঁড়েছে ; প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে পিছুও হটে এসেছে একই সঙ্গে। আগুন এবং গোলাগুলীর মধ্যে কোনরকম গা বাঁচিয়ে বাসায় এসে পৌঁছেছিল কয়েক মিনিটের জন্য, বিদায় নিতে ; তখনও সে সঙ্গে ছিল। তারপর দীর্ঘ রাত, দীর্ঘ পথযাত্রা। শ্রান্ত ক্লান্ত, সীমান্ত পেরিয়ে প্রথমে গিয়ে উঠেছিল আগরতলা এবং কিছুদিন পরে গেরিলা ট্রেনিংয়ে যোগ দিয়েছে বাসে চড়ে গিয়ে একটা নতুন শিবিরে। বাঁশের ঘর, তরজার বেড়া। বাঁশের মাচানে দু'জন শুয়েছে পাশাপাশি।

কিন্তু এসবও নয়, সবচেয়ে বড় কথা, সে তার গ্রুপেই ছিল সহকারী কমান্ডার হিসেবে। জুলাইয়ের সে রাতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল। সীমান্তের কাছাকাছি তৎাদের প্রথম লড়াইয়ের কাঁধের মধ্যে এক ঝাঁক গুলী খেয়ে জঙ্গলের ধারে পড়ে গেলে, মনে হয়, সেই দ্রুত এসে ধাক্কা দিয়ে দেখেছিল। তখন জ্ঞান ছিলো না; এবং শত্রুরাও ছিল আশে পাশে, নিশ্চয়ই। সঙ্গীরা যে ফেলে চলে গেল, পরে স্থির মাথায় ভেবে দেখেছে, তাতে বিশেষ দোষ ছিল না। অতর্কিত আক্রমণ, এবং শক্তিক্ষয় হতে থাকলে, ক্ষিপ্র পশ্চাদপসরণও গেরিলাযুদ্ধের অন্যতম রণকৌশল। অনেকটা উড়োখবর হলেও, ওর ভাঙাদলটি কিছুকাল পরে দেশের ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল।

মনে পড়ে, প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পরে নতুন বন্ধুত্বের অবস্থায় কুমিল্লায় হায়দারদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল গ্রীষ্মের ছুটিতে। তিনদিকে সুপারি গাছের সারি। ওদের বাসাটা কান্দির পাড়ে কাঁচা রাস্তার ওপরে।

এমন জানের জান ছিল। তবু প্রথমে চিনতে পারবে না. জানত। কিন্তু অচেনা হলেও, যে কারুর প্রতি এমন অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে, তা প্রত্যাশিত ছিল না। গেটের কাছে, পিছন থেকে একটু ডাক দিতেই সে ঘুরে দাঁড়াল এবং বিরক্তিভরা মুখটা তুলে তেতোস্বরে বলল, দেখুন আমাকে মাফ করবেন। আমি কিছু শুনতে পারবো না।

তখন সে নিশ্চয় ভেবেছে অভাবী লোক, সাহায্য চাইতে এসেছে। মেজাজটা হঠাৎ ভীষণ চড়ে গেল। ওমর বজ্রধ্বনির মতো উচ্চারণ করল, স্টপ, হায়দার।

হতচকিত হায়দার। বিভ্রান্ত, স্তম্ভিত। পিঠে বর্শার ঘা যেন লাগল, সে দাঁড়িয়ে পড়ল। খুব চেনা কণ্ঠস্বর। সে প্রায় কাঁপতে লাগল এবং কোনক্রমে উচ্চারণ করল, তুই তুই—

হ্যাঁ আমি ওমর।

অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না। মাত্র এক পা এগিয়ে হায়দার বলল, মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক শহীদ হয়ে গেছে। সে পেয়েছে মরণোত্তর খেতাব বীর প্রতীক। তার পরিবারে নির্ধারিত সাহায্য পৌঁছে—

থাম হায়দার, আর লাগবে না। ওমর যেন নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে, হাতটা বাড়িয়ে দিল, বলল, একটু ধর আমাকে। এই দ্যাখ আমি বেঁচে আছি।

এই পর্যন্ত মন্দ ছিল না। কিছু রহস্য, কিছু উত্তেজনা। অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনে, উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনের সময় দু'জনেরই চোখের কোণে চিকচিক অশ্রুরেখাও দেখা দিল।

কিন্তু কি একটা তখনো ছিল অপ্রকাশিত যার ছায়া পড়ছিল মাঝে মাঝে, বন্ধুর বিবর্ণ চেহারায়।

পরিচয় পাওয়ার পরে যন্ত্রচালিতের মতো সে কাজ করে গেছে, বেশ দ্রুত এবং কখনো কখনো অন্যমনস্ক ; তোষক বিছাতে গিয়েছিল, বাধা দিলে কাঠের চৌকিতে কাঁথার বিছানা পেতেছে, একটা পালা মুর্গি জবাই করে পোলাও-কোরমা খাওয়াবারও ব্যবস্থা করেছে।

কথাবার্তা ছিল প্রায়ই অসংলগ্ন ; এবং মাঝে মাঝে উচ্চহাস্যও যে করে উঠেছে তাও কোন একটা সাংঘাতিক ব্যাপারকেই গোপন করার চেষ্টাও হতে পারে। ভিতরে ভিতরে প্রমাদ গুণছিল। ধূমপান করতে করতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে স্থির দৃষ্টিতে, সঠিক আন্দাজের চেষ্টা করেছে। ওর বাবা মা, হয়তো ওরই পরামর্শে, কুশল জিজ্ঞাসা করে গেলেন। সন্ধ্যার পরে সাজ-গোজ করিয়ে নিয়ে এল নবপরিণীতা বধূ কাজলকে, যার সঙ্গে ভালোবাসার কথা ও সবসময় বলতো নিচু গলায়। ওদের পাড়ারই উপেন মাস্টারের মেজো কন্যা। এই পরিবারের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি জীবনাচরণ সর্বজনবিদিত, তবু মিলনটা সহজ ছিলো না। এবং বিয়েটা তো ছিল অসম্ভব, যদি না দেশ স্বাধীন হোত। বৌকে নিয়ে আসার আগে সে ওসব গল্প করছিল। সংগ্রামের সময় আগরতলা হয়ে ওরা কলকাতায় যায়, যেখানে বড় দা ব্যবসা করতেন। তিনি ওকে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠিত একজন পাত্রও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু বোনটা বেশ একগুঁয়েমী করল, যার জন্য কথাবার্তা পাকা করতে পারেননি। ওর ফাইনাল পরীক্ষা সত্যই বাকী। ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ত, ভালো ছাত্রী হিসেবে নাম ছিল।

কান পেতে সব শুনছিল ওমর, কিন্তু তার হৃদয় জুড়ে তখন স্বপ্না—বেনারসী ঘেরা ঘোমটার নিচে গভীর চাউনি কাজলকে ছাপিয়ে জাগছিল বার বার। দুই সম্প্রদায়, বন্ধুর রোমান্সের মধ্যে বিপত্তির অর্থ বোঝা যায় ; কিন্তু আপন মামাতো বোনের সঙ্গে তার ভাব করাটা যে ছিল আরো কঠিন, তাই আশ্চর্য। বেদৌরা বিনতে আজিজ, নামটা বিদঘুটে বৈকি ; কিন্তু যৌবনে সে দিল নিজের নাম স্বপ্না, যেন কবিতার একটি শব্দ। কেউ জানতো না, কেবল নিজেই ডাকত ওই নাম ধরে—গোপন চিঠিতে, চিরকুটে লিখত। প্রেমের খাতিরে, বাংলা অনার্সের ইয়ার কাইয়ুমের কাছ থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর একটা পুরান বই জোগাড় করেছিল ; কিন্তু বেশি ব্যবহার করত রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্তবক। বিশেষত, যেগুলোতে হৃদয়ের আওয়াজ বেশি। সেসব তীক্ষ্ম কাঁটার মত, বিঁধলে নীরবে রক্ত ঝরবে ; নায়িকা ব্যথা পাবে কিন্তু ভেঙে পড়বে না। আর নজরুলের যে গানটি ছিল সবচেয়ে প্রিয় তা হোল, গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায় কে যেন আমারে ডাকে সেকি তুমি, সেকি তুমি—

এখন, কাজল বিদায় নিয়ে চলে গেলে, কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে ওমর, ঘন ঘন সিগারেট টানে ; তারপর হঠাৎ খাট থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল এবং হায়দারের ডান হাত ধরে দ্রুত জিগগেস করল, কি লুকোচ্ছিস তুই বল—আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।

নিজেকে ছাড়ালো না হায়দার, বরং ওর বাঁ হাতটা আলগোছে তার কাঁধে রাখল, জড়ানো স্বরে বলল, কি আর লুকাবো আমি—

না, না। তোকে বলতে হবে, সব বলতে হবে। চোখ জুড়ে অগ্নিদৃষ্টি, ওমর বলল, মনে রাখিস তুই আমার কমান্ডে ছিলি। আমি অর্ডার করছি।

বেশ, যদি অর্ডারই তবে আমি মানতে বাধ্য। কিন্তু হঠাৎ আবার হায়দার যেন বিচলিত, থেমে থেমে বলল, আমি জানি তুই সশস্ত্র ওমর। আমি যা বলবো, তা শুনলে গুলী করবি। গুলী করবি তুই আমাকে, তাতে আপত্তি ছিলো না। আমি যে পাপ করেছি। পাপের শাস্তি আমি চাই। কিন্তু ভাবছি শুধু একজনের কথা, সে অনেক স্বপ্ন দেখেছে। আশা-ভরসা করেছে। তবু, তবু তুই আমাকে মার-চল যাই দু'জনে ওই দূরে, সড়কের ওধারে—

ওর গলা বন্ধ হয়ে গেল হাউমাউ কান্নার দমকে, দমকে দু'হাতের তালুতে মুখ লুকিয়ে হুহু শব্দ করতে লাগল।

এরপর নীরবতা। অনেকক্ষণে সে সুস্থির হয় এবং দু'জনে এসে বসে চৌকির ধারে,

পাশাপাশি। কথাবার্তাও বলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ছোকরাটাকে দিয়ে খাবার পাঠাল কাজল এবং শেষে, নিজে পরিবেশনা করতে এল। খিদে ছিল, খাওয়ার মুড মোটেই ছিলো না।

কিন্তু বন্ধুপত্নীর সৌজন্য অনেক মূল্যবান, কোনক্রমেই তার অবহেলা চলে না। সাময়িকভাবে ভুলে গেল দুঃখ-শোক। দীর্ঘকাল পরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভুঁড়িভোজন করল।

এবং তখন অনেক রাত। বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে যে যার ঘরে, কিন্তু ঘুমায়নি হয়তো। দুই বন্ধু একান্ত এখন। খিল এঁটে দিল। এবং বাতিটা অফ করে দিয়ে বালিশে কাত হলো, দু'জনের আঙুলের ফাঁকেই জ্বলন্ত সিগারেট।

ঝড় এসেছিল। চলে গেছে। এখন যেন প্রশান্ত চাউনিতে প্রকৃতিকে চেয়ে দেখার সময়। ওমরের ডান হাতের আঙুলগুলো ধরে রেখেছে, আস্তে আস্তে বলল হায়দার, তুই বিশ্বাস কর, আমি বুঝতে পারিনি। কাছে গিয়েও পালস দেখেছিলাম। কিন্তু মনে হয়েছিল, খতম। তুই মরে গেছিস। অবশ্য আমাদের, বিশেষ করে আমার কর্তব্য ছিল তোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া, জীবিতই হোক, মৃতই হোক। কিন্তু পারলাম না। কাছেই ছিল দুশমনের এলেমজির মুখ। আমরা হন্ত-দন্ত, জান নিয়ে পালিয়ে এলাম। এটা আমাদের বিশেষ করে আমার ঘৃণ্য অপরাধ।

ওমর বলল, কি আর অপরাধ! যুদ্ধের সময়ে অমন ঘটেই থাকে, সেজন্য আমি বাবি না।

তুই যাই বলিস কিন্তু যখন, আমার সব মনে পড়ে'-একটু থেমে হায়দার বলল, নিজেকে ধিক্কার না দিয়ে পারি না।

ওমর বলল, আমি যে বেঁচে গেছি তা নেহাৎ অস্বাভাবিক। তুই তো জানিস অমন বহুবার ঘটেছে আমার জীবনে, অল্পের জন্য মরিনি। আমার নানা পীর ছিলেন, মা বলেন তাঁর দোয়া আছে। তখনো, ঘটনাচক্রে আমি গড়িয়ে গিয়েছিলাম লতা-পাতার আড়ালে, আমি সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। শেষ রাতের দিকে, মনে হল, কাছে জীপের আওয়াজ। কারা যেন আমাকে ধরাধরি করে ওঠালো, তারপর নিয়ে গেল। কাঁধের জখমটা আমার মারাত্মকই ছিল—

হায়দার বলল, লিবারেশনের পরে অনেকবারই আমাকে ঢাকা যেতে হয়েছে। যত বার গেছি, একমাত্র একবার ছাড়া, প্রত্যেকবারই গেছি তোদের বাসায়। সবাইকে দেখে এসেছি। আমাকে দেখলেই কান্নাকাটি করত। তবু যেতাম।—আমার কথাতেই—ও'রা তোর—মৃত্যুর খবর-বিশ্বাস করেছিলেন। নইলে হয়তো,—এমন কাণ্ডটি ঘটতো না—।

তুই কি বলতে চাস? মুহূর্তে আঘাত খাওয়া গোখরো সাপের মতো ফুঁসে উঠল ওমর, কাঁধে ধরে শক্ত ঝাঁকানি দিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, কি? কি?—

হায়দার তবু শান্ত। সে বলল, বিয়ে হয়ে গেছে—স্বপ্নার—।

ও, না-না। একটা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে নিচে গিয়ে পড়ল ওমর, ডান হাতটা শূন্যে নিক্ষেপ করতে করতে বলতে থাকে, আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না। তুই মিথ্যে বলছিলস, হায়দার। মিথ্যে বলছিস। মিথ্যে বলায় তুই সুখ পাস, আমি জানি।

সমবেদনায় হতবাক, হায়দার ওকে ধরে আদর করে সান্ত্বনা দিতে চায়, কিন্তু সেও কি সম্ভব? ক্রমে রাত নিঝঝুম, সে উঠে ভিতর বাড়িতে চলে গেল।

স্বপ্নার বিয়ে হয়ে গেছে, এই শব্দগুলো চারদিকে, ওর কানের কাছেও ভন্‌ভন্ করে ফিরছিল মাছির মতো, এবং একসময় কুঁকড়ে গিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে দেখল ওরা একটা ঝলমলে আগুনের চাকা হয়ে বন্‌বন্ ঘুরছে। এমন যন্ত্রণা। অসহ্য ঠেকে কিছুক্ষণেই। মাথা

ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। বিজয়ের আগ পর্যন্ত কোন খবর ছিলো না, এবং বিজয়ের পরে গোনাগুনতি সাড়ে সাত মাসের বেশি অপেক্ষা করতে পারলো না? জানে, চার মাসেরই নিয়ম, কিন্তু অনেকে তো বছরের পর বছর, এমনকি সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেয়। এমনই ঠুনকো ছিল ওদের ভালোবাসা? ভাবতে ভাবতে চোখ ছাপিয়ে পানি এল, এক সময় বিছানার উপরে উপুড় হয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বালিশ, চাদর ভিজিয়ে দিল। মাথার ভেতরটা ঘোরপাক খাচ্ছিল। তবু সব শুনেছে সে, সব শুনেছে। ঘরেই রেখেছে ওকে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে। ছোটো ভাই ফয়সল, সে-ই বর। ভাবীর চাইতে সে স্পষ্ট দু'বছরের ছোটো, তবু নাজায়েজ নয়। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ ছিলো না। গভীর পানির মাছ শ্বশুর সাহেব, সে যুগের লীগ নেতা, শেষ দিকে ঘন-ঘন ঢাকা-পিন্ডি কতেন, তিনি এবারেও বেঁকে দাঁড়ালেন। আগেই আপন ভাগ্নের কাছে মেয়ে দেবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। আপন পছন্দ মতো ঠিকই করেছিলেন উচ্চ সম্বন্ধ, কিন্তু ওমরের দলবলকে এঁটে উঠতে পারেন নি, বিশেষ করে যখন বেদৌরা নিজে গিয়ে ওদের কাছে ধরা দিল। মুসলিম হলের ইমাম নিকা পড়িয়েছিলেন। বেশ অপদস্ত হয়েছিলেন, বলা যায়। ভাগ্নে হলে কি, সমুচিত শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দিতেন মামলা দায়ের করে। কিন্তু আপন রক্ত, মা'য়ের পেটের বোনটির কান্নাকাটি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তবু ক্ষোভটা ছিল। পারতপক্ষে, আসতেন না। মেয়েও সুবিধা বুঝে যেত ধানমণ্ডির বাপের বাড়িতে। সেই দুষ্ট ভাগ্নেটার করুণ পরিণতিতে মোটেই দুঃখিত হননি তিনি, বরং যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, যদিচ ওর বরাত দিয়েই নিজেও বেঁচেছেন।

হায়দার যদি এমন কিছু বলে থাকে যা অতিরঞ্জিত কিংবা মিথ্যা, তাকে এবার ক্ষমা করবে না। কিন্তু এখন ঢাকা, শুধু ঢাকা। ঢাকায় না গিয়ে শান্তি পাবে না। ঢাকা এখন টানছে, চুম্বকের মতো। একফোঁটা ঘুমও আসেনি চোখে, শেষ রাতের দিকে উঠে পড়ল।

বাতি জ্বাললো না, হাতড়ে হাতড়ে থলেটা খুঁজে নিয়ে কপাট খুলে বেরিয়ে পড়েছিল রেলওয়ে স্টেশনের দিকে।

অনেক ভেবেচিন্তেই ঠিক করেছে, আত্মপ্রকাশ করবে না, এবং রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া বেশ দেরিতে খেয়ে, ম্যানেজারের অনুমতিক্রমে পিছনে একপাশের বেঞ্চিটায় বিশ্রাম নেয়ার সময়েও সে সংকল্পে স্থির। অবাক লাগছে, নিজের কাছেই। শাদামাটা একজন যুবক বই তো ছিলো না, গোঁয়ার প্রকৃতিরও বলা যায়—সে নিশেন উড়িয়ে হৈ-চৈ করতে করতে গিয়ে বাসায় উঠবে এটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু এখন? এ যেন অন্য কেউ। কিংবা নিজে হলেও, তার সম্পুর্ণ অচেনা অস্তিত্ব। শামুকের মতো সে বোলটে আছে, কঠিন এক আচ্ছাদনে, কিন্তু একটানা ঢিবঢিব করে চলেছে হৃৎপিণ্ড, একটা স্পন্দনকে উপলব্ধি করছে।

না-না সে আর চিৎকার করবে না, মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুঁড়বে না। এখন, প্রতারক এই জীবনে মনোরম প্রসাধন, সমস্ত সাজ পোশাক দেখবার জন্য সে প্রস্তুত।

বেড়ায় হেলান দিয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে থাকতে থাকতে ফোয়ারার মত স্বতঃ উৎসারিত ভাবনার এই পর্যন্ত সহজেই চলে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই একটা বিস্ফোরণ। একটা নৃশংস, জিঘাংসার হাতছানি। প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র বুনো জন্তুর মতো সে ফুঁসছে, ছুটছে প্রচণ্ড টুঁশ মেরে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিকারের উপরে, রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন করছে।

কিন্তু এও অদ্ভুত, বেলা পড়ে এলে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালে তার বুকের ভিতরটা আশা-নিরাশায় দুলতে লাগল। যদি সত্যই মিথ্যা হয় যা শুনেছে তার সমস্তটা? যদি-যদি-যা-

হ্যাঁ, এখানে কৃষ্ণচূড়া গাছটা এখন অজস্র ফুলে ফুলময়, তাদের যেন অনেক বেশি গাঢ় রং। ওমর মুখ উঁচিয়ে একনজর মাত্র দেখল।

ওইতো, নাতিপ্রশস্ত লনের পরে তাদের বাংলো ঘরটা, যার একপাশে কামরায় স্মৃতিময় রাত কাটিয়েছে, এখনো দাঁড়িয়ে আছে আগে মতোই।

এর মধ্যেই ওদের বাসর হয়েছিল, যদিও উৎসবমুখর নয়। ঘরের অর্ধেকটা বৈঠকখানা, ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিত, স্বপ্না চা বিস্কুটের ট্রে বাড়িয়ে দিত ঝাপের ওধার থেকে। কক্ষে একটা পুরাতন পালঙ্ক আছে। নতুন-নতুন সেটাতে শুয়ে পুটুর পুটুর আলাপ করত রাতভর। জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে বেরুত প্রাঙ্গণে। ওই যে শিউলিগাছটা-শীতের সকালে উঠে মাটির উপরে মেদুর আস্তরণ হয়ে পড়ে থাকা তার ফুল কুড়িয়ে এনে টেবিলে ছোট্ট স্তূপ করে রাখত স্বপ্না যার মিঠে গন্ধে আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙত। আসরে স্বপ্না ছিলো ফুলের পাগল, খোঁপায় ফুল পরা ওর অভ্যাস ছিল। সুযোগ পেলেই সে ফুল আনত এবং ওর হাতে তুলে দিত।

ওই তো, বাবা বেরিয়ে আসছেন, সমবায় ব্যাঙ্কের রিটায়ার্ড অডিটর মোহাম্মদ ওসমান গণি। ধবধবে শাদা দাড়িগোঁফ, মাথায় গোলটুপি। কপালের বলিরেখা আরো ঘন হয়েছে, বাঁকা লাঠিটায় ভর দিয়ে আরো ঝুঁকে হাঁটছেন। তাঁর পিছনে কে? হ্যাঁ, মা-ই তো। সোনিয়াকে কোলে নিয়ে, পিছু নিয়েছেন। সোনিয়া, আরেকটু বড় হয়েছে। সে চেঁচিয়ে হাত ছুঁড়ছে, বলছে— দাদু! আমি বাবাল কাতে দাবো। বাবাল কাতে দাবো।

উনি বরাবরই তিরিক্কি মেজাজের, বিরক্তিতে ভুঁরু কোঁচকালেন। পেছন ফিরে বললেন, থাম্ ছেঁড়ি। আমি মসজিদে যাচ্ছি।

পিছনে-পিছনে মা তবু আসছেন, ওর কান্না থামাতে পারছেন না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওমর, তার চোখজোড়া পানিতে ভরে গেল। ইচ্ছে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু পারলো না।

গেটের আঙটা খুলে বাবা বার হয়ে যাওয়ার সময় ওকে দেখে একটু থামলেন, চশমার আড়ালে ছানিপড়া চোখ তুলে তাকালেন, জিগগেস করলেন, আপনি কে? এখানে কি চান?

ওমর বলল, আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি আপনার ছেলের কাছে এসেছি।

হ্যাঁ, ফয়সলের ফেরার সময় হয়েছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। বলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে তুড়তুড় হেঁটে চলে গেলেন।

ইতোমধ্যে, কাছাকাছি এসে মা লক্ষ্য করছিলেন, তিনি দেখে ফেলেছেন কান্না। আরো কাছে এসে আর্দ্রস্বরে শুধালেন, কাঁদছো ক্যান বাবা? তোমার কি দুঃখ?

হাতের তালুতে চোখ মুছে ওমর বলল, আপনাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে।

আহা বেচারী! কেঁদোনা বাবা কেঁদোনা। মা শরিফা খাতুন বললেন, জীবন মানেই তো দুঃখ। আমার দুঃখও কি কম? আমার আরেকটা ছেলে ছিল, তোমার বয়সীই হবে, মুক্তিযুদ্ধে গেল আর ফিরলো না।

জ্বি হ্যাঁ, আমি শুনেছি। ওমর বলল, কিন্তু বীর প্রতীক। উনি তো বেঁচেই আছেন।

হ্যাঁ? বেঁচে আছেন? কি বলছো তুমি বাবা, কোথায় সে? কোথায়?

ওমর ম্লান হেসে বলল, না মা। বলছিলাম, জাতির হৃদয়ে উনি বেঁচে আছেন।

ও, তাই বলো মুখ তুলে বললেন, জাতির হৃদয়ে বেঁচে আছে, তাতে আমার কি? আমার দুঃখ তাতে কমল কিছু? আমি রোজ কাঁদি ওর জন্য। না কেঁদে পারি না। চোখে আমারও ছানি পড়ছে। যদি জলদি অন্ধ হয়ে যেতাম! তাহলে পৃথিবীর মুখ আর দেখতাম না।ঃ

না, মা, না। এত বেশি হতাশ হওয়া আপনার সাজে না। দৃঢ়কণ্ঠে বলতে থাকে ওমর,

দেশের আরো হাজার হাজার ছেলে প্রাণ দিয়েছে। এবং যারা বেঁচে আছে, তারাও আপনার সন্তান।

হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ। ঠিক বলছো তুমি। চোখের দরদর পানিতে দুই গাল ভেসে গেল, ভাঙা-ভাঙা করে বললেন, যারা মরে গেছে যারা বেঁচে আছে সবাই আমার সন্তান। সবাই আমার ছেলে, আমার ওমর ফারুক। আমি আর কাঁদবো না। মাথা উঁচু করে থাকবো। এই তো আমার উপযুক্ত কাজ।

স্তব্ধ হয় ওমর ফারুক। ভিতরে চলে এসেছিল। কাছেই গেট, সেখানে শব্দ, সেদিকে তাকালো। হ্যাঁ, ফিরে এসেছে ফয়সল, অফিসের সমস্ত কাজ সেরে। রিকশা থেকে নেমে দ্রুত হেঁটে এসে ঢুকছে, হাতে একতোড়া মরশুমী ফুল। প্যান্ট শার্ট পরা, কোমরে বেল্ট, হাতঘড়ির রুপালি ব্যান্ড শীর্ণ কব্জির কাছে লেগে আছে। টিকোল নাকের উপরে সোনালি ফ্রেমের চশমা, হালকা পাতলা গড়নে একটা দৃঢ়তা আছে, যা একনজরেই বোঝা যায়। কাছে এলে মা বললেন, বাবা ফয়সল এই দুঃখী বেচারা তোর জন্য অপেক্ষা করছে—

হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি, যদি কোনো একটা—

বুঝেছি। ফয়সল মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, আপনার একটা কাজের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ব্রাঞ্চের সব ভেকেন্সি পূরণ হয়ে গেছে।—ঠিক আছে—আপনি কাল আমার ওখানে আসুন। আমি টেলিফোন করে দেখবো অন্য কোথাও—

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ওমর বলল, এখন যেমন-তেমন একটাতে জয়েন করতে পারলেই হোত—

তিনদিন ধরে বেচারা পথে পথে ঘুরছে। শরিপার স্বরে আর্দ্রতা, তিনি বললেন, কিছু সাহায্য করতে পারিস না?

ও হ্যাঁ। হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করল ফয়সল, একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, কাল অবশ্যই আসবেন আপনি। আমি অপেক্ষা করবো। এই নিন আমার কার্ড।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, বাড়ির পিছন থেকে প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে এক ঝলক ম্লান রাঙা আলো, কাছাকাছি গাছ-গাছালিতে শোনা যাচ্ছে পাখিদের কিচির মিচির। এরই মধ্যে ধীরে হেঁটে কাছে এসেছে স্বপ্না, তার কোলে এখন, সোনিয়া। অনবরত জ্বলছে নিভছে ওমরের চোখজোড়া। স্বপ্না একি বাস্তব? ভালো দেখা যায়, স্বপ্না পূর্ণ গর্ভবতী। আঁচলের নিচে টইটম্বুর বক্ষোভার, পেটের দিকটা স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি সুডৌল। মনে ঝলক মেরে যায়, সোনিয়ার সময়েও, এমনি হয়েছিলো। ছেলে হবে, ভেবেছিলো ওরা। প্রথম সন্তানের আগমন সম্ভাবনায় চাপা আনন্দে ভরপুর ছিল দু'জনেই, কিন্তু ভয়ও পাচ্ছিল। সেজন্য পয়সা জোগাড় করে, শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে ভর্তি করিয়েছিলো হোলী ফ্যামিলীতে। বেশ কষ্ট হয়, তবু ফাঁড়া কেটে যায়। এখনো চোখের কোণে কালি এবং ঠোঁটে ক্লিষ্ট বিষণ্নতা নারীত্বের পরম গৌরবের একটা গভীর প্রলেপও রয়েছে চেহারায়। কথা বলছিল না, মাঝে মাঝে কেবল চেয়ে দেখছিল। পরিচয়ের কোনো আভাস কি পেয়েছে কোথাও? না, না সে অসম্ভব। তাছাড়া অনেকের সঙ্গে তো মিলও থাকে, যা একটু ঢেউ তুলতে পারে বিস্মৃতির সরোবরে—আর কিছু নয়। অচেনা আদমী, সে এমন একটা পারিবারিক পরিবেশ থেকে চলে যাচ্ছে না, তা নিজের কাছেও বিসদৃশ ঠেকল। হঠাৎ করে নড়তেও পারছে না।

কিন্তু যেন টের পাচ্ছে, ওর আবেগ-অনুভূতির সূক্ষ্ম কোমল তন্তুগুলো ক্রমে জমে

পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক নয়, অজ্ঞান হয়ে গড়ে গেলে কেলেঙ্কারী।

সোনিয়ার দাপাদাপিতে অস্থির তবু মাথার কাপড়টা ঠিক রেখেছে স্বপ্না, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে উনি যে-ই হোন, বেগানা পুরুষ। দু'হাত বাড়িয়ে কচিকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে সোনিয়া, আমি বাবাল কাতে দাবো। বাবাল কাতে দাবো।

এক গাল হেসে ফয়সল আরো দু'পা এগিয়ে গেল, ফুলের তোড়াটা বৌকে দিয়ে মেয়েকে দু'হাতে বুকের কাছে নিল আদরের সঙ্গে।

ডান পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বার করল, ওর সামনে ধরে বলল, এই যে তোমার মিমি!

চকলেটের মোড়কটা ছোট হাতে ধরে ও বলতে লাগল, আমি ফুল নেবো।

ফয়সাল হেসে বলল, ওটাতো আমার।

না, না। আমি ফুল নেবো। গাল ফুলিয়ে বলল সোনিয়া, নইলে আমি মিমি খাবো না।

এবার একটু হাসে স্বপ্না, স্নিগ্ধ ক্লান্ত, কাছে এসে ফুলের তোড়াটা মেয়ের ছোট হাতের মুঠিতে ধরিয়ে দিল। বলল হয়েছে?

ড়র্ভবতী স্ত্রী পাশে সন্তানকে ধরে আছে পরম আদরে, বাঁ হাতের উপরে বসিয়ে তরুণ ফয়সলকে দেখাচ্ছে সফলকাম স্বামী গর্বিত পিতার মতো।

এখনো সামনে দাঁড়িয়ে ওমর কি স্তম্ভিত, না আলোড়িত? কিছুই উপলব্ধি করতে পারলো না। কেবল কিসের খেয়ালে এক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে বলল, আমাকে একটি ফুল দাও মা—আমাকে একটি ফুল দাও।

এই দেখে, থমকে থাকে সোনিয়া এবং কিছুটা ওরা তিনজনেও। কিন্তু পরক্ষণেই হাল্কা হয়ে বলল ফয়সল দাও না মা একটা ফুল। উনিও তোমার আঙ্কল।

এবার সোনিয়া যেন বুঝতে পারলো এবং সহজ হয়ে গেল। এবং একটা নয়, গোটা ফুলের তোড়াটাই বাড়িয়ে দিল। সেটা হাতে তুলে নেয় ওমর এবং ধরে রাখে কিছুক্ষণ।

তারপর হঠাৎ স্বপ্নার মুখোমুখি হল, ফুলের তোড়াটা তার হাতে দিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না, একটু খেলা করলাম। ওর মতো আমারও একটা মেয়ে আছে। আর-আর ওর মা'ও কতকটা আপনারই মতো দেখতে—

গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল স্বপ্না, লোকটার কণ্ঠস্বরে যেন একটা চেনা-চেনা রেশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু আর কিছু ভাবলো না। আস্তে বলল, একটা ফুল চেয়েছিলেন—নিয়ে যান না। মেয়েটাকে দেবেন।

ওমর বলল, ওরা যে এখন অনেক দূরে।—ঠিক আছে, আমাকেই দিন্।

তোড়া থেকে খুলে স্বপ্না ডাঁটাসহ একটি মরশুমী গোলাপ তার হাতে দিলে, আর দেরি করলো না।

একটু এগিয়ে গিয়ে মেয়ের গালটা একবার সস্নেহে টিপে দিল, এবং নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ওদেরকে সালাম জানিয়ে, দ্রুত গেটটা পেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সন্ধ্যার ঘরফিরতি জনবহুল রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মার্চ, ১৯৮২।